# ভুল-ভাঙ্গা

( সামাজিক উপন্যাস )

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত।

আশ্বিন—১৩৩০ সাল।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক
কলিকাতা
১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ
অমর-লাইব্রেরী
হইতে প্রকাশিত।

অমর সিরিজ—১ নং

প্রিণ্টার—আব্দুল গোফুর
২৪২।১, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস হইতে
মুদ্রিত।

ভূমিতে—লতিকা সম লুটায়ে পড়িয়ে লিখিলাম এই

# ভূমিকা

একখানি "ভুল-ভাঙ্গা" কিনিলেন? বেশ করিলেন, ধন্যবাদ। ও মহাশয়, ধন্যবাদ। কিন্তু একটি কথা—বহিখানি কিনিয়া, এই পুস্তকালয় হইতেই বরাবর বাড়ী ফিরিবেন না। নিকটস্থ কোনও সাইকেলের দোকান হইতে খানিকটা পাতলা রবার্ ও একশিশি রবার্-সলিউসন্ কিনিয়া লইয়া তবে বাড়ীতে যাইবেন এবং এই বহিখানি পড়িবার পূর্ব্বে উক্ত জিনিস দুইটি খুব কাছে রাখিয়া, তারপর পড়িতে আরম্ভ করিবেন। আমার এই গ্র্যাটিস্-য়্যাড্ভাইসের কারণ এই যে, বহিখানি পড়িতে, পড়িতে যখন আপনি মনের সাধে ইহার রস-সাগরে সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হইবেন তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপনি হাসিবেন—এত হাসিবেন যে, হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িবেন। শুধু গড়াইয়া পড়িলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না—বড় জোর গায়ে একটু ধূলা লাগিবে। কিন্তু হাসিতে, হাসিতে যদি আপনার পেট ফাটিয়া যায় তাহা হইলে বড়ই মুস্কিল। আপনি প্রতিদিন যাহা খাইবেন তাহা কাটা-পেট দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, আপনি রোগা হইয়া যাইবেন, আপনার চেহারা খারাপ হইয়া যাইবে—পাঁচজনে আর আপনাকে পছন্দ করিবে না। এই জন্যই রবার্ ও রবার্-সলিউসন কিনিতে বলা। যদি পেট ফাটিয়া যায় তাহা হইলে অমনি তখনই খানিকটা সলিউসন মাখাইয়া এক টুকরা রবার্ লইয়া সেই কাটা-যায়গায় তাপ্পী মারিয়া দিবেন। হাঁ আর এক কথা—যদি পেট না ফাটে; কিন্তু ইহার রস-সাগরে পাড়ি দিবার সময় হাসিতে, হাসিতে যদি পেটের ভিতরকার নাড়ী ভুঁড়ী ছিঁড়িয়া যায় তাহা হইলে আধগজ ন্যাকড়া আর ছটাক-খানেক রেড়ীর তেল চট করিয়া খাইয়া ফেলিবেন আর টপ্ করিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়া, চাকার মতন করিয়া খানিকটা গড়াগড়ি দিবেন।

"পুরাতন-নিয়ম-ব্যতিক্রমে বাধা দিবার জন্য" এই বহিখানি জন্মগ্রহণ

করিলেও—বর্ত্তমানে দেশের আবহাওয়ার এমনি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, এই বহিখানি স্বয়ংই পুরাতন-নিয়ম-ব্যতিক্রম করিয়া জন্মাইল। পুরাতন নিয়মানুসারে ঈদৃশ আকারের বহির, মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভ হইতে জন্ম লইতে দুই মাস সময় লাগে। সংসর্গে-সমধর্ম্মপ্রাপ্তি-নীতি অনুসারে যদি এই বহিখানি, মানুষের সংসর্গে থাকিয়া মানবধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলেও ইহার দশমাস দশ দিনে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান আবহাওয়ার গুণে (যেন পুরাতন-নিয়ম-ব্যতিক্রম করিবার জন্যই) ইহা সে সব নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া প্রায় এক বৎসর সময় লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। গালভরা-বড়-কথা প্রে-রে-রে রে-ম, প্র-র-ব-র-ণয় ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং হাস্য-রহস্যপূর্ণ গল্পের মধ্য দিয়া বড় প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা বলিলাম; অনুগ্রহ করিয়া মনের একটি কোনে স্থান দিলে—চরণে বাধা থাকিব। ইহা পড়িতে, পড়িতে যতই ভিতর দিকে অগ্রসর হইবেন মন ততই গল্পে আকৃষ্ট হইবে, প্রাণ ততই বিভোর হইবে, আর হাসিতে, হাসিতে মন, প্রাণ উভয়েই নাচিয়া উঠিবে। নিকটে অবস্থিত বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান প্রভৃতি সমজদার ভদ্রমহোদয়গণ—সে নাচ দেখিয়া অতীব প্রীত হইয়া "একসেলেণ্ট-একসেলেণ্ট" বলিতে, বলিতে জোর ক্ল্যাপ দিবে আর সেই আনন্দে আপনার মন আরও নাচিয়া উঠিবে। তখন আমরা ধন্য হইব, আমাদের রচনা সার্থক হইবে। আর দয়াময় বাবা শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিব যে—"হাসুক, হাসুক, বাঙ্গালী হাসুক; আরও, আরও, আরও হাসুক—আর তাহার হাসি দেখিয়া মহানন্দে সমগ্র জগৎ হাসুক।"

এই পুস্তকখানি বহুদিন পূর্ব্বে রচিত হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমানে আমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত গীতায় ঈশ্বরবাদ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ব্রহ্মবিদ্যা সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস, বেদান্তরত্ন মহোদয়ের উৎসাহে ও সহায়তায় ইহা মুদ্রিত হইল। তাঁহার সহায়তা না পাইলে আমি ইহা বর্ত্তমানে ছাপাইতে পারিতাম না এজন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥

# উৎসর্গ

পরম পূজনীয় গুরুদেব—

**শ্রীমৎ বালানন্দ স্বামীজী**

শ্রীচরণ-সরোজেষু :

**তপোবন**—বৈদ্যনাথধাম।

গুরুশব্দ শ্রীমৎ পরব্রহ্মস্বরূপ—সেই শ্রীমৎ পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুশব্দ উচ্চারণ করিয়া, শ্রীমৎ পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেবকে ভজনা করিয়া, শ্রীমৎ পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেবকে চিন্তা করিয়া, শ্রীমৎ পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মহাপবিত্র শ্রীচরণযুগল সরোজে—শ্রীভগবান কর্ত্তৃক আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আমার দ্বারা রচিত এই "ভুল ভাঙ্গা" পরম ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম। প্রভু, গুরুদেব দয়া করিয়া—দীন, হীন ভক্ত শিষ্যের এই অকিঞ্চিৎকর পূজা-উপহার গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য করুন, আমার জীবন সফল করুন, আমার জন্ম সার্থক করুন।

শ্রীচরণে নিবেদনমিতি—

শারদীয়া মহাষ্টমী
আশ্বিন ১৩৩০ সাল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উপহার

যে ঐরূপ ভাবে ছোট-বড় করিয়া চুল ছাঁটিলে এবং ঐ রকম স্ত্রীলোক-দের মতন কপাল ঢাকিয়া, পাতা কাটিয়া সিঁথা কাটিলে তাহাকে অতি সুন্দর দেখায়। এক্ষণে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে, তাহার অমন সুন্দর (?) চুলগুলি আমূল কাটিয়া ফেলিতে হইবে," এই চিন্তায় সে মহা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার পিতৃবিয়োগের পরদিন হইতে ঐ চিন্তায় সে অনেক বিনিদ্র-রজনী উষ্ণ মস্তিষ্কে—কক্ষতলে পাদচারণা করিতে করিতে যাপন করিয়াছে।

প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ স্নেহময় পিতার মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র যে তিলমাত্রও দুঃখিত হয় নাই, এ কথা আমরা হলফ্ করিয়া বলিতে পারি; কিন্তু তাহার পাড়ার লোকেরা আমাদের এ কথা সমর্থন করেন না। শরৎ-চন্দ্রের প্রতিবাসী কয়েকজন ভদ্রলোক বলেন যে—"আমরা শরৎচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হবার দিনকয়েক পরে—সমবেদনা প্রকাশ করবার জন্যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই; তার বাড়ীতে গিয়ে শুনলুম যে, সে তখনও শয্যাত্যাগ করেনি। আমরা তার জন্যে অপেক্ষা ক'রতে লাগলুম এবং তার চাকর দীনুকে দিয়ে, আমাদের আগমন সংবাদ তার কাছে পাঠালুম। কিছুক্ষণ পরে দীনু চাকরের সঙ্গে শরৎচন্দ্র আমাদের কাছে উপস্থিত হ'ল। আমরা তাকে দেখে চক্ষের জল সম্বরণ ক'রতে পারলুম না; কারণ—শরৎচন্দ্রের তখনকার মূর্তি বড়ই বিষাদমাখা, বড়ই দুঃখময় ছিল। আর—তাকে দেখে বেশ স্পষ্টই বোধ হ'ল যে সে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায়নি এবং ক্রমাগত ক্রন্দন ক'রেছে। আহা—হা, পিতার মৃত্যুতে বেচারা বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছে।"

পাড়ার ভদ্রলোকদের এইরূপ মন্তব্য শ্রবণ করিয়া দীনু চাকর কিন্তু

মুখ টিপিয়া হাসিত। দীনুকে এইরূপ ভাবে হাস্য করিতে দেখিয়া আমরা একদিন বহু সাধ্য সাধনা করিয়া তাহার এইরূপ-হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া, অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল—"সাধে কি আর হাসি? এইসকল পাড়ার ভদ্রলোকদের কথা শুনে আমার ভারী হাসি পায়। আমার মনিব শরৎবাবু, কাল সমস্ত রাতটা প্রায়, নিজের চুলের জন্যে কাঁদলে, আর ঐ সব, পাড়ার ভদ্রলোকেরা এসে ঠায়ে বলে গেল যে, 'শরৎবাবু কাল সমস্ত রাত্তির বাপের শোকে কেঁদেচে।' একথা শুনে মরা মানুষও হেসে ওঠে তা আমি তো একটা জলজ্যান্ত মনিষ্যি।"

দীনু চাকরের এইকথা শুনিয়া আমরা সবিস্ময়ে তাহাকে বলিলাম—"সে কি ব'লছ হে দীনু! ব্যাপারটাতো কিছুই বুঝতে পারিছি না! তোমার বাবু তাঁর চুলের জন্যে কাঁদলে কি বকম? না!"

আমাদের কথা শুনিয়া দীনু বলিল যে—"সে কথা আমি কি বলব! নেহাৎই যদি ব'লতে হয়, তাহলে সব কথা বলি শুনুন। শরৎবাবু যখন জন্মায়নি তখন থেকে আমি এই বাড়ীতে চাকরী করি। তারপর তেনার জন্মাবার পর আমি তাঁর খাস চাকর হই। সেই সময় থেকে আমি শরৎবাবুকে কোলে, পিঠে ক'রে মানুষ করেছি। তাঁর ছেলে বেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত আমি খাওয়া-দাওয়ার সময় তাঁর কাছে থাকি, শোবার সময় তাঁরই শোবার ঘরের মেঝেতে একটা বিছানা পেতে তাঁকে আগলে শুই। শরৎবাবু এখন বড় হয়েছেন, কলেজে পড়ছেন, একটা হোমরা চোমরা বাবু হয়েছেন তবুও কিন্তু এখনও তাঁকে আগলে আমায় শুতে হয়। কারণ তাঁর বড়ই ভূতের ভয়। সেই ছেলেবেলা থেকে আমায়

করে এই এখন-পর্য্যন্ত তিনি ভূতের ভয়ে কাঁপেন। ভূতের ভয়ে রেতে, একলা শুতে বা অন্ধকারে শুতে পারেন না। একলা কোথাও যেতে পারেন না।—তারপর কর্ত্তাবাবু মারা যাবার দিন তিন-চার বাদে একদিন রাত্তিরে শরৎবাবু তাঁর শোবার ঘরে খাটের ওপর শুয়ে আছেন আর আমি মেঝেতে বিছানা করে শুয়ে আছি; আমার সবে মাত্র একটু তন্দ্রা আসছে, এমন সময় শরৎবাবু হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে প'ড়ে আমায় ডাকলেন—"দীনে!" আমি তাড়াতাড়ি উঠে বল্লুম—"আজ্ঞে।" তখন শরৎবাবু বল্লেন যে—"ওরে দীনেরে, আমার দশা কি হবেরে? আমার এমন সুন্দর চেহারা—বাবার শ্রাদ্ধের সময় যখন আমায় মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে হবে, তখন যে আমায় অতি বিশ্রী দেখাবেরে। আমি সেই বিশ্রী চেহারা নিয়ে লোকজনদের কাছে কি ক'রে মুখ দেখাবরে? ভাল ক'রে চুল গজাতে অন্ততঃ পক্ষে ছ'মাস লাগবেরে, সেই ছ'মাস আমি কি ক'রে কাটাবরে?" এই সব কথা ব'লে, শরৎবাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আর সেই থেকে প্রায়ই এই রকম ক'রে, চুলের জন্যে শোক করেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দীনু নীরব হইল। আমরা তাহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলাম যে,—"তুমি তারপর কি ক'রলে হে দীনু?"

আমাদের কথার উত্তরে, দীনু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"শরৎবাবু মনিব, আমি চাকর; আমি তাঁর আর কি ক'রতে পারি বলুন? তবে তাঁর ঐ কথা শুনে আমার মনে হ'ল যে, তাঁর ঘাড় ধরে টেনে নামিয়ে তাঁকে আমার বিছানায় শুইয়ে দিই আর আমি নিজে তাঁর বিছানায় উঠে গিয়ে শুই। আমি ছোটলোক, নীচজাত,

মুখ্যু, আর শরৎবাবু ভদ্রলোক, লেখাপড়া-জানা ; কিন্তু ভদ্দর আর লেখাপড়া-জানা লোকের মনের যা পরিচয় পেলুম তাতে মনে হ'ল যে, ঐ রকম ভদ্দর আর বাবু লোকেরা সব নীচে নেমে আসুক আর মুখ্যু, নীচ, ছোটলোকরা সব ওপরে উঠে যাক। কারণ—আসলে তো ঐ মুখ্যু, ছোটলোকরাই সব ওপরে রয়েছে। তারা জন্মদাতা, প্রত্যক্ষ দেবতা বাপ মরে গেলে শোক করে ; 'কিসে বাপের আত্মার তৃপ্তি হবে, উদ্ধার হবে' এই ভাবনা ভাবে। ঐ রকম ভদ্দর ( ? ) আর লেখাপড়া-জানা (?) লোকদের মতন—নিজের চেহারা খারাপ দেখাবে ব'লে চুলের শোকে কাঁদেনা ; হবিষ্যি করবার ভয়ে পেটের অসুখের ছলনা করে না, জুতো পরবার জন্যে হা—হা ক'রে বেড়ায় না ; সাবান মাখবার জন্যে—গায়ের মশার কামড়ের দাগকে, খোস পাঁচড়া হয়েছে বলে মিছে পাপ বাড়ায় না।"

বাঁদুর মুখে আমরা এসম্বন্ধে যতদূর অবগত হইয়াছিলাম তাহা জানাইলাম। এক্ষণে চলুন, পূর্ব্ববর্ণিত স্থানে কি ব্যাপার হয় দেখিতে চলুন।

আজ একমাস কাল যাবৎ যে চুলের ভাবী-বিরহে "বুড়ো মিন্সে" শরৎচন্দ্র কাঁদিয়াছে পর্য্যন্ত, সেই চুল রক্ষা পাইবে শুনিয়া সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। পাত্রস্থিত এক তাল মাখমের উপর সজোরে একটি পদাঘাত করিলে সেই মাখমের তালটি যেরূপ "ছোরকুটে" যায়, শরৎচন্দ্রও আনন্দ ও আপ্যায়িতের আবেগে তাহার মুখটি সেইরূপ "ছোরকুটে", দুই পংক্তি পানের "ছ্যাৎলা"-পড়া-দন্ত বিকাশ-পূর্ব্বক বলিল—"য়্যাঁ ! আপনি যদি ব্যবস্থা দেন, তাহ'লে আমায় চুল কামাতে হবে না ? য়্যাঁ বলেন কি ?"

পুরোহিত মস্তক নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"আমি কি আর আপনাকে মিথ্যা বল্‌ছি বাবু।"

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিল—"তাহ'লে দিন, আমায় ব্যবস্থা দিন।"

পুরোহিত ঠাকুর অতীব গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ব্যবস্থা তো শুধু শুধু দেওয়া যায় না বাবু; এরূপ ব্যবস্থা নিতে হ'লে মূল্য দিতে হয়।"

শরৎচন্দ্র এই কথা শুনিয়াই, তাহার পকেটের ভিতর হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া, তাহা পুরোহিত মহাশয়ের দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল—"মূল্য? মূল্য? এই নিন, পাঁচ টাকা মূল্য নিন।"

পুরোহিত মহাশয় টাকা পাঁচটি লইলেন না। তিনি প্রথমটা হোঃ, হোঃ করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া উঠিলেন ও পরে অতীব তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন—"পাঁচ টাকা! পাঁচ টাকা! আমার অনুমতি দানের মূল্য পাঁচ টাকা? আমি এত বড়, মস্ত, দিগ্‌গজ পণ্ডিত; আমার উপাধি—পদ্মপুরাণাচার্য্য, পাতালখণ্ডতীর্থ; আমি অতি শীঘ্রই ভূটান ও সীমান্ত প্রদেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক "সর্ব্ব-শাস্ত্র-কুজ্রিরাজ" উপাধি ভূষণে ভূষিত হব—সেই আমি কিনা পঞ্চ মুদ্রা মূল্য গ্রহণ ক'রে ব্যবস্থা দান করব! হ্যাঁ!! আরে এ দান কি একটা যা-তা দান! ব্যবস্থা দান হচ্ছে মহাদান; কোটি মূলতানী গাই দানের চেয়ে ব্যবস্থা দানে অধিক পুণ্য সঞ্চয় হয়; আমি সেই মহাদান কিনা পাঁচ টাকা মূল্যে ক'রব?"

পুরোহিত মহাশয় সহসা এইরূপ বাগাড়ম্বর করাতে শরৎ একটু

মুসড়াইয়া পড়িল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিল,
—"আজ্ঞে তাহলে কি দিতে হবে—কি দিলে আপনি——"

পুরোহিত মহাশয় নানা ভাবভঙ্গী সহকারে, মস্তক হেলাইয়া-দোলাইয়া বলিলেন—"কি দিতে হবে? এই ভীষণ, ভয়াবহ পাপ কথা আপনি আমায় জিজ্ঞাসা ক'রছেন; আর আমাকেও তাই, আমার পবিত্র ও খোল্-পরিশূন্য কর্ণে শুনতে হচ্চে। ওহো ধিক আমাকে, ধিক ব্রাহ্মণকে; কলিতে, তার কিছু শক্তি নেই—নইলে, অতি ক্ষুদ্র শূদ্র কিনা অতি রুদ্র ব্রাহ্মণকে বলে যে, "কি দিতে হবে?" ওঃ কি অপমান, কি ঘৃণা। এক একবার ইচ্ছে করে যে কপিলের তেজে জ্বলে উঠে এই শূদ্রগুলোকে একেবারে ভস্ম ক'রে দি; কিন্তু তখনই বশিষ্ঠের ক্ষমা গুণের কথা মনে পড়ে যায় তাই পাষণ্ডেরা সব রেহাই পেয়ে যায়। "কি দিতে হবে?"—ওরে মূর্খ শূদ্র, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা অনুযায়ী, ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্রত্ব—( আহা—হা, কি ব'লতে কি বলছি ছাই ) ব্রাহ্মণের রুদ্রত্ব অনুযায়ী দিতে হবে। এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারলি না রে মূর্খস্য-মূর্খ, অপোগণ্ডস্য-অপোগণ্ড ,বর্ব্বর-প্রচণ্ডস্য বর্ব্বর প্রচণ্ড।"

আমাদের বর্ণিত এই পুরোহিত মহাশয়, তাঁহার পিতৃদেবের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন যে, যজমানদের নিকট খুব বাগাড়ম্বর করিতে হয়, কথা বলিবার সময় অধিক পরিমাণে হাত-মুখ নাড়িতে হয়, প্রত্যেক কথা বলিবার সময় অন্ততঃ পক্ষে দুইবার করিয়া টিকি দোলাইতে হয়, মধ্যে মধ্যে কপট ক্রোধ দেখাইতে হয় এবং যজমানদের সদা সর্ব্বদাই ধাঁধায় রাখিতে হয়। এই সকল নিয়মগুলি ঠিক মত পালন করিয়া যাইতে পারিলে—যজমানের ভক্তি আকর্ষণ করা যায় এবং সেই সঙ্গে

অধিক পরিমাণে মুদ্রাও আদায় হয়। বহু চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও পুত্রকে যখন উত্তমরূপে শাস্ত্র শিখাইতে সক্ষম হইলেন না তখন আমাদের পুরোহিতের পিতাঠাকুর মহাশয় পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাহাকে উপরোক্ত উপদেশগুলি দিয়াছিলেন। আমাদের এই পুরোহিত মহাশয় এই কারণেই এখানে নানারূপ চালবাজী করিতেছেন। অন্য সময় হইলে শরৎচন্দ্র, তাঁহার চালবাজীতে ভুলিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে—কেবলমাত্র তাহার বড় সাধের চুলগুলি রক্ষা পাইবে—এই আনন্দে শরৎ বিভোর হইয়া গিয়াছিল এবং এ জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেও সে প্রস্তুত ছিল। এই সকল কারণে সে আর বেশী কথা না বাড়াইয়া সবিনয়ে বলিল—"পুরোহিত মহাশয় আমার অপরাধ হয়েছে; আমায় মাপ ক'রবেন; আমি——"

পুরোহিত মহাশয় মহা গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আচ্ছা আমি মাপ করলুম। কারণ, আপনার এতে বিশেষ কোনও দোষ নেই। দোষ কালের। শাস্ত্র কখনও মিথ্যে হয় না। শ্রীযুৎ শাস্ত্র বলেছেন যে, কলিতে ব্রাহ্মণের সম্মান নেই। এর প্রমাণ তো হাতে হাতে পেলেন? আপনি আমার মতন 'প্রবল-প্রতাপশালী' 'প্রচণ্ড-সংস্কৃতবিদ', 'দুর্দ্দান্ত-শাস্ত্রবিদ', 'মহামহিম-মনীষি', 'ব্রহ্মাণ্ড-খ্যাতি-প্রকাণ্ড' ব্রাহ্মণকে অম্লান-বদনে বললেন কিনা যে, 'কি দিতে হ'বে?' তা থাক্—আপনি যখন মাপ চেয়েছেন তখন ও সকল কথা যাক্; আমি অনুগ্রহ ক'রে আপনাকে মাপ করেছি; তা ছাড়া আপনাকে আমি ভারও একটু বাসি ভাই রক্ষে, নচেৎ—অপর লোক কেউ এ কথা বললে আমি অভিশাপ দিয়ে তাকে সবংশে ধ্বংস করে ফেলতুম।"

পুরোহিত ঠাকুরের ঈদৃশ বাগাড়ম্বরে শরৎ মনে মনে বিরক্ত হইলেও—কোনও রকমে কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইবার জন্য—সে প্রকাশ্যে কোনও প্রকার বিরুদ্ধ ভাব প্রদর্শন করে নাই। সে এতক্ষণ বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে ঐ 'সবংশে ধ্বংস করার' কথা শুনিয়া সে আর নীরব থাকিতে পারিল না—ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

তাহাকে হাস্য করিতে দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না এবং তাঁহার সব চাল-বাজীই সে বিশ্বাসের একান্ত অযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছে; সুতরাং—যাহাতে শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস জন্মে এবং সে ধাঁধায় পড়ে—এরূপ কথা বলা এ ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে উচিত। এতক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—"বাবু, আমার কথায় অবিশ্বাস ক'রছেন তাই হাস্য ক'রছেন বটে কিন্তু এ কথা অবিশ্বাস করবার মত কথা নয়। 'অভিসম্পাৎ দিয়ে, আমি যে, কোনও লোককে সবংশে ধ্বংস করেছি' এ কথাটা মিথ্যা নয়—সত্য, অতি সত্য, ঐতিহাসিক সত্যও এতে নিহিত আছে। আমার এঁকটি মূঢ় যজমান—আমার মর্য্যাদার গূঢ় রহস্য বুঝতে না পেরে আমার অমর্য্যাদা করাতে আমি ক্রোধান্বিত হ'য়ে রূঢ়কণ্ঠে তাকে অভিসম্পাৎ দিই যে, 'তুই সবংশে ধ্বংস হ'বি।' আমার ঐ অভিসম্পাৎ দেওয়ার পর যথার্থই সে ব্যক্তি সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'ল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তার বংশের ভিন্ন ভিন্ন লোক বাস ক'র্'ছিল কিন্তু আমার এমনই শক্তি যে আমার সেই ক্রোধাগ্নি একই সময়ে সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ লোককে ধ্বংশ ক'রে ফেললে। যাকে অভিশাপ দি তারা চার ভাই

এবং চারজনেই চারিটি স্বতন্ত্র স্থানে বাস ক'রত, আমার অভিশাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাই মরে গেল মথুরায়, মেজভাই মরে গেল চাঁইবাসায়, সেজভাই মরে গেল কলকাতায়, ছোটভাই মরে গেল আগ্রায়। তাদের বংশে একটা ছোট মেয়ে ছিল; সেটাও ঘাগরায় আগুন লেগে মরে গেল। আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মগরায় তাদের একটা চালের আড়ৎ ছিল, সেই আড়ৎটাও ঠিক ঐ এক সময়েই আগুনে পুড়ে গেল। হাঁ। তবে এ সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে—একদল লোক বলে যে আমারই অভিশাপের আগুন ঠিক্‌রে গিয়ে ঐ চালের আড়ৎটায় প'ড়ে সেটা পুড়িয়ে ফেলেছে; আবার আর একদল বলে যে, ঐ মেয়েটার ঘাগরায় আগুন লাগাতে সে যন্ত্রণায় ছটফট্ ক'রতে করতে ঐ চালের আড়তের সামনে যখন দৌড়াদৌড়ি ক'রছিল সেই সময় তার ঘাগরার আগুন ছিটকে আড়তের উপর পড়ে; তাইতেই আড়ৎটা ভস্মীভূত হয়ে যায়।"

পুরোহিত মহাশয়কে ঘাঁটাইতে ইচ্ছা ছিল না বটে কিন্তু তাঁহার এই আজগুবী ও গাঁজাখুরী ঐতিহাসিক সত্য-নিহিত গল্প শুনিয়া শরৎচন্দ্র, সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও একেবারে নির্ব্বাক থাকিতে পারিল না। সে কপট-কৌতূহল প্রকাশ করিয়া বলিল—"আচ্ছা মশাই, তারা সবাই যদি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ম'রে গেল তা'হলে আপনি সে খবর জানতে পেলেন কোথা থেকে? তারা যখন সবংশে ধ্বংস হ'ল তখন তো আর খবর দেওয়ার জন্যেও কেউ বেঁচে ছিল না।

পুরোহিত মহাশয় এইরূপ জেরায় পড়িয়া, এইবার একটু গোলমালে পড়িলেন। তাঁহার মতন বাগাড়ম্বরকারী ব্যক্তিকেও কিছুক্ষণ নীরব

থাকিতে হইল। কিন্তু তাঁহার উর্ব্বর ও ধাপ্পা-প্রসূ মস্তিষ্কের কৃপায়—কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পরই তিনি বলিলেন—"বাবু, যথার্থই তারা সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'য়েছিল এবং যথার্থই তাদের মধ্যে কেউই সংবাদটি দেবার জন্য পর্য্যন্ত জীবিত ছিল না কিন্তু তবুও আমি এ খবর জানতে পেরেছি কিসে তা জানেন? এই খবর সংস্কৃতের কৃপায় জানতে পেরেছি অর্থাৎ কিনা পদ্ম-পরাণের কৃপায় এবং পাতাল খণ্ডের মহিমায় এই সমস্ত ব্যাপার আমার নখ-দর্পণে উপস্থিত হ'য়েছিল। অর্থাৎ কিনা—আমি আমার দক্ষিণ হস্তস্থ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর সজোরে একবার বদনস্থ উষ্ণ বাষ্প 'হাঃ হাঃ' ক'রে প্রদান করলুম, তৎপরে শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সেই নখরটি মুছে নিয়ে তার ওপর চেয়ে দেখতেই দেখলুম যে ঐ সমস্ত যাবতীয় ব্যাপার তথায় দর্পণবৎ প্রতিবিম্বিত হয়েছে।"

পুরোহিত ঠাকুরের কথাগুলি অবাক্ হইয়া শ্রবণ করিয়া শরৎচন্দ্র মনে মনে ভাবিল যে, 'উঃ! লোকটা কি ধাপ্পাবাজ! তার ওপর ওর এতদূর আস্পর্দ্ধা যে আমাকে এমন ন্যাকা ঠাওরালে যে ঐ সব ধাপ্পাগুলো আমাকে অম্লানবদনে দিলে! কি বলব! আমায় কোনও রকমে ভূতের হাত থেকে রেহাইও পেতে হবে আবার আমার মাথার চুলগুলোও বাঁচাতে হবে তাই আজ ও রক্ষে পেয়ে গেল—নয়ত' ওটাকে আজ গঙ্গায় ফেলে, টুঁটী টিপে ধরে সাতাশ বার নাকানী-চোবানী খাওয়াতুম।'

শরৎচন্দ্রও এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন পুরোহিত মহাশয়ও আত্ম-চিন্তায় বিভোর। পুরোহিত মহাশয় ভাবিতেছিলেন যে, 'এই সময়, এই একটা দাঁওয়ের সময়,—এই সময় পাঁচ টাকাও মিলিতে পারে আবার

পঞ্চাশ টাকাও পাওয়া যেতে পারে। এই পাষণ্ড ব্যাটারা যেরূপ ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে তাতে যে, ক্রিয়া কলাপ করে আমাদের কিছু দেবে এ তো বোধ হয়না। সুতরাং এই রকম প্যাঁচে যখন এরা পড়ে তখনই কায়দা ক'রে এদের কাছ থেকে যতটা বেশী পারা যায় ততটা আদায় ক'রে নিতে হয়। কিন্তু কি কায়দা করি? —যে সব ধাপ্পা এতক্ষণ ধরে দিলুম, তাতে বিশেষ ফল হবে বলে তো বোধ হয়না, আমার অতটা অধিক মাত্রায় বলাটা ভাল হয়নি দেখছি।—তাইত! কি ফিকির করা যায়!—ওহো-হোঃ! ঠিক,হয়েছে, ঠিক হয়েছে—সেই কথা বললেই ঠিক কার্য্যসিদ্ধি হবে; ওঃ! কথাটা বড্ড মনে প'ড়ে গেছে।" এইরূপ চিন্তা করিতে, করিতে পুরোহিত মহাশয় সহসা আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেলেন। অতি কষ্টে আনন্দের বেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন—বাবু, আমি সব কথা ছেড়ে দিয়ে, একটি শেষ কথা বলি শুনুন। দেখুন—আপনি যদি আমার মর্য্যাদার উপযুক্ত মূল্য দিতে কষ্ট বোধ করেন, তাহলে না হয় তা নাই দেবেন, কিন্তু আপনার নিজের চেহারার মর্য্যাদার উপযুক্ত মূল্য দেবেনত।"

শরৎ বলিল—"আপনি কি বলেছেন তা ভাল বুঝতে পারছি না। সব খুলে বলুন।"

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—"দেখুন—আমার এই ব্যবস্থা দানের জন্য আপনাকে নগদ কর্‌করে পঞ্চাশটি মুদ্রা, দিতে হবে কারণ আপনার চেহারা অতীব সুন্দর। আমার কথা বোধ হয় ভাল ক'রে বুঝতে পাচ্ছেন না? আচ্ছা, পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলছি, শুনুন। দেখুন—আমি সাধারণ-চেহারার লোককে পঁচিশ টাকার রূপে এইরূপ

ব্যবস্থা দিইনা, আর যাদের চেহারা খুব ভাল হয় তাদের এইরূপ ব্যবস্থা দিতে হ'লে পঞ্চাশটি মুদ্রা গ্রহণ করি। তা দেখুন—আমি এ পর্য্যন্ত যত লোককে এইরূপ ব্যবস্থা দিয়েছি তাদের সকলকার অপেক্ষা আপনার চেহারা সুন্দর,—অতীব মনোহর,—অলৌকিক রূপময়। সুতরাং আমার কাছ থেকে এইরূপ ব্যবস্থা নিতে হ'লে আপনি পঞ্চাশটি মুদ্রা আমায় দিতে বাধ্য।" এই কথা বলিয়া পুরোহিত মহাশয় মৎস্য-প্রদানোদ্যত মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপকারী মার্জ্জারের ন্যায়, লুব্ধনেত্রে শরতের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

পুরোহিত মহাশয় অত ধাপ্পা দেওয়ার পরও শরৎকে সহসা কেন এই সকল কথা বলিলেন, সে মজার রহস্য জানিতে হইলে একটু পূর্ব্ব-কথা শ্রবণ করা আবশ্যক। পর পরিচ্ছেদে সে রহস্য বর্ণিত হইল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে শরৎচন্দ্রকে রূপবান্ বলিয়া এবং যাহার চেহারা অতীব সুন্দর, অতীব মনোহর প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিয়া পুরোহিত মহাশয় শত মুখে সুখ্যাতি করিলেন, সে শরৎচন্দ্র রূপবান্ তো নয়ই—বরং তাহাকে কুৎসিত বলিলেও কিছু অত্যুক্তি হয় না। শরৎচন্দ্রের অঙ্গের বর্ণ কালো এবং তাহার মুখশ্রীও ভাল নয়। তাহার নাসিকাটি একটু চ্যাপ্টা, দন্তের উপর পাটি উচ্চ, ওষ্ঠাধর স্থূল, বক্ষ ক্ষীণ ও অপ্রশস্ত, চক্ষু দুটি ছোট ছোট এবং চক্ষের কোল স্বভাবতই ভিতর দিকে বসা। মোটের উপর তাহাকে কুৎসিত ভিন্ন রূপবান্ কিছুতেই বলা যায় না। তথাপি তাহাকে পুরোহিত মহাশয় অতীব রূপবান্ প্রভৃতি বলিলেন কেন—তাহা শ্রবণ করুন।

কুৎসিত আকৃতি সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের ধারণা—দৃঢ় ধারণা—যে, সে অতীব সুন্দর, তাহার চেহারা বা আকৃতি অতি মনোরম। শরৎচন্দ্র ধনী পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান সুতরাং বড়ই আদরের। তাহার পিতা-মাতা তাহাকে বড়ই আদর ও যত্ন করিতেন এবং তাহার সমস্ত কামনা চাহিবামাত্রই পূরণ করিতেন। দাস, দাসী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গ সততই তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে ও তাহার আজ্ঞা-পালন করিতে ব্যস্ত থাকিত। বাল্যকাল হইতে সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে পাইয়া সে 'নিজেকে একজন বিশিষ্ট ও অসাধারণ ব্যক্তি' মনে করিত। পুরবাসীগণের মুখ-নিঃসৃত—'ধন আমার', 'চাঁদ আমার' প্রভৃতি প্রিয়

সম্বোধন পরিণত বয়স পর্য্যন্ত তাহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত—'শরৎ আমাদের আকাশের চাঁদ', 'আমাদের বুক জুড়োতে আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছে' ইত্যাদি প্রিয় ও মধুর বাক্য-গুলি—পিতামাতা ও অন্যান্য পুরবাসী-জনের মুখ হইতে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত শুনিতে শুনিতে তাহার ধারণা হইয়াছিল যে, যথার্থই তাহার চাঁদের মত চেহারা। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতার প্রতি তাহার আসক্তিও বাড়িতেছিল। শরৎচন্দ্র আয়নাতে মুখ দেখিত, সিঁথা কাটিত, পাউডার, হেজলিন স্নো প্রভৃতি মাখিত ও নানা প্রকার উত্তম উত্তম বেশ-ভূষা পরিধান করিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবিত যে, সে বড়ই সুপুরুষ। তাহার বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, এইদিকে তাহার আসক্তিও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে দিবসের অধিকাংশ সময়ই নিজের দৈহিক-শোভা বৃদ্ধি-সাধনে ব্যস্ত থাকিত এবং নিজের রূপে নিজেই মোহিত হইয়া থাকিত।

এ জগতে শ্রীভগবানের এই একটি বিশেষ আশীর্ব্বাদ আছে যে, মানুষ নিজেকে নিজে বড়ই সুন্দর আকৃতি-বিশিষ্ট মনে করে। এ জগতে এমন সংসারী লোক বোধ হয় কেহই নাই—যে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে না মনে করিয়াছে যে, তাহার চেহারাটি সুন্দর—তা সে সত্যই সুন্দরই হউক অথবা অতীব কুৎসিতই হউক। শরৎচন্দ্রও নিজেকে খুব রূপবান্ মনে করিত এবং প্রার্থী, প্রত্যাশী ও অধীনস্থ-গণের মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে, তাহার মনে এই সংস্কার দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। একটি বিষয়ে কিন্তু তাহার বিশেষ একটু ক্ষোভ ছিল। তাহার অঙ্গের বর্ণ যে কৃষ্ণ একথা সে

বুঝিতে পারিত। তাহার অঙ্গের বর্ণ যথার্থ যতটা পরিমাণে কৃষ্ণ, সে অবশ্য ততটা মনে করিত না বটে কিন্তু এটা তাহার মনে হইত যে—তাহার চেহারাটি সুন্দর, নিখুঁৎ সুন্দর; কিন্তু তাহার অঙ্গের বর্ণটি একটু কালো—বেশী নয়, সামান্য একটু কালো। যদিও তাহার দেহের কালো রং ও বিশ্রী মুখশ্রী সত্ত্বেও তাহার নিকট প্রার্থী ও অধীনস্থগণ, তাহাকে অতীব রূপবান্ বলিত, তবুও এই রংটার জন্য তাহার মনটা বড়ই খুঁৎ খুঁৎ করিত। এই জন্য—এই কালো রংকে ফর্সা করিবার জন্য সে প্রাণপণ যত্ন ও অদ্ভুত পরিশ্রম করিত। দিবা-রাত্রের মধ্যে যখন-তখন মুখে ও হাতে কনুই পর্য্যন্ত জোরে-জোরে সাবান ঘষিত এবং তাহার পর পাউডার, হেজলিন স্নো, প্রভৃতি দ্রব্য খুব পুরু করিয়া মাখিত ও এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে তাহার স্বাভাবিক কৃষ্ণ বর্ণকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। যদি কোনও ব্যক্তি কখন কোনও কারণে কিংবা ভ্রমক্রমে—'তাহার রং কালো'—এই কথা বলিত তাহা হইলে, সেই ব্যক্তির উপর ভয়ানক চটিয়া যাইত এবং যে কোনও ছলে হউক তাহাকে শা[illegible]রিত; যদি তাঁহার অধীনস্থ না হইত তাহা হইলে তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিত। যে ব্যক্তি তাহার কালো রংকে ফর্সা বলিত অথবা তাহার চেহারার সুখ্যাতি করিত সে, সেই ব্যক্তির উপর মহা সন্তুষ্ট হইত এবং সে ব্যক্তি যদি কোনও বিষয়ের প্রার্থী হইত তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রার্থনা পূরণ করিত। এ রহস্য ক্রমে সকলেই জানিয়া গিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের নিকট কোনও রূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হইলে তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ বা তাহার ইয়ারগণ, অগ্রে তাহার চেহারার প্রশংসা

করিত, তারপর আপন আপন প্রার্থনা জানাইত। পুরোহিত মহাশয় এ রহস্য অবগত ছিলেন। নানা গোলমালে এতক্ষণ তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন এক্ষণে সহসা তাহা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়—তিনি ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিলেন; সনাতন প্রথানুযায়ী তাহার লক্ষ্য যথাস্থানেই বিদ্ধ হইল। নিজের চেহারার সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া শরৎচন্দ্র আনন্দে গলিয়া পড়িল। এতক্ষণ অন্য যাহা কিছু তাহার মনে উদিত হইয়াছিল সে সমস্তই কর্পূরের মতন উড়িয়া গেল। শরৎচন্দ্র অতীব আনন্দ সহকারে পুরোহিত মহাশয়কে বলিল——"টাকার জন্যে কোনও চিন্তা নেই। পঞ্চাশ টাকা কেন—আমি আপনাকে পঞ্চান্ন টাকা দিচ্চি।" এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র নিজের ট্যাকে যে টাকা পাঁচটি ছিল তাহা পুরোহিত মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়া, তাহার পরিচারক দীনুকে বলিল—"ওরে দীনে, এখানে আসবার সময়—তোকে সরকারের কাছ থেকে যে একশো টাকা আনতে বলেছিলুম, তাই থেকে পঞ্চাশ টাকা পুরুত মশাইকে দে।"

শরতের পুরাতন ভৃত্য দীনু যখন শরতের কাপড়, উত্তরীয় প্রভৃতি লইয়া এখানে আনিবার নিমিত্ত, তাহাদের বাড়ীতে উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিল, সেই সময় শরৎচন্দ্র, স্বীয় প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্য এবং টাকা ও রেজকীতে মিলাইয়া মোটমাট একশত টাকা দীনুকে সঙ্গে লইয়া আসিতে আদেশ করিয়াছিল। বাটির সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত টাকা একটি ছোট থলিতে লইয়া এবং সেই থলির মুখটি কোমরে জড়াইয়া লইয়া দীনু এখানে আসিয়াছিল। মনিবের অনুমতি পাই সে ক্ষুণ্ণ মনে সেই ছোট তহবিলটি বাহির করিয়া, তাহা হইতে পঞ্চা

টাকা লইয়া পুরোহিত মহাশয়কে প্রদান করিল। পুরোহিত ঠাকুরের হস্তে টাকাগুলি দিবার সময়, সে একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। পুরোহিত মহাশয় প্রসারিত ও অকম্পিত হস্তে টাকাগুলি গ্রহণ করিয়া অম্লান-বদনে ট্যাকস্থ করিলেন এবং ঈষৎ উচ্চস্বরে বলিলেন—"বাবু, আমি আপনাকে ব্যবস্থা দান ক'রছি যে আপনার মস্তক মুণ্ডন করতে হবে না; আমার আদেশে আপনি কেশ-যুক্ত মস্তকে শ্রাদ্ধ করবার অধিকারী হলেন।"

শ্রাদ্ধ মুণ্ডিত-মস্তকে করিতে হয়, কারণ—শ্রাদ্ধ করিবার এই-রূপ নিয়ম—এবং এসম্বন্ধে শাস্ত্রের বচন এইরূপ যে,শ্রাদ্ধে যে সকল তিল দেওয়া হয় তাহা উত্তম রূপে বাছিয়া দিতে হয়; তাহা হইলে যে ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা হয় সে ব্যক্তি, ঐ তিল সংখ্যার [illegible] তৎকাল স্বর্গবাসের অধিকারী হয়। কিন্তু ঐ সকল তিলে যদি একগাছিও চুল থাকিয়া যায় তাহা হইলে উক্ত ফল-লাভ হইবে না এবং শ্রাদ্ধ পণ্ড হইয়া যাইবে। এই কারণেই শ্রাদ্ধাধিকারীকে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়।

এই নিয়ম যদি সত্য হয়, এ রহস্য যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে কেশ-যুক্ত মস্তকে শ্রাদ্ধ করিয়া শরতের ফল লাভ হইবে, না [illegible] উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে?

এই সকল [illegible]-বিধান ও শাস্ত্র-বাক্য যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে ইহার সমস্ত বিধান যথাযথ-ভাবে পালন [illegible] আর যদি এই সকল বিধানকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলিয়া [illegible] [illegible] হইলে ইহা একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। এই যে [illegible]

গর্ত্তে নামিয়া চলিয়াছে। 'সমস্ত কার্য্যেই এইরূপ দু' চাল চালিয়া নিজেদের সমাজের ও জাতীয়তার সর্ব্বনাশ করিতেছি। ভক্তি, বিশ্বাস নাই; অথচ বাজারে নাম লইবার জন্য বাটিতে প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা করিলাম। পূজার ফললাভ করিবার জন্য নিজের নামে সঙ্কল্প করাইয়া পূজা করাইলাম; কিন্তু পূজার বিধি অনুসারে নিজে উপবাস করিলাম না—কারণ প্রথমতঃ আমার ভক্তি ও বিশ্বাস নাই; দ্বিতীয়তঃ, উপবাস করিলে আমার কষ্ট হইবে; তাই ৺পূজা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আমি পরিপাটিরূপে আহার করিলাম এবং আমার কোনও আত্মীয় বা আত্মীয়া আমার হইয়া উপবাস করিলেন। ননীর শরীরে ব্যথা লাগিবার ভয়ে যদি আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেহ উপবাস না করিলেন তাহা হইলে হয় আমার কোনও ভক্ত পরিবার কর্ম্মচারী, না হয় কোনও ব্রাহ্মণ মূল্য লইয়া আমার হইয়া উপবাস করিলেন। আমি অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের জন্য খুব বক্তৃতা করিতেছি; 'সকলে অসবর্ণ বিবাহ না দিয়া জাতীয় সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে' এই কথা বলিয়া সকলকে কতই ধিক্কার দিতেছি; কিন্তু নিজের পুত্র-কন্যার বিবাহ সবর্ণে দিতেছি। বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, আলাপে হিন্দু-ধর্ম্মের ঘোরতর নিন্দা করিতেছি, অপরকে হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য অযাচিত উপদেশ দিতেছি—এমন কি নিজে প্রকাশ্যে ও চুরি করিয়া খানা, গোস্ত পর্য্যন্ত খাইতেছি কিন্তু নিজে ঠিকভাবে হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছি না—দু'য়ের মাঝামাঝি থাকিতেছি; ভিন্ন-ধর্ম্মীর আচারে দৈনিক জীবনযাপন করিতেছি, কিন্তু পুত্র-কন্যার বিবাহ, পিতামাতার শ্রাদ্ধ, মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে [illegible]

করিতেছি এবং তাহার ভিতরও খিচুড়িভাব প্রবেশ করাইতেছি। ছিলাম বড়া-সাহেব, হঠাৎ—বড় আকারের হিন্দু না হইলেও—বড়ি আকারের হিন্দু বনিয়া যাইতেছি (অবশ্য অল্পদিনের জন্য)। মূর্ত্তি পূজার ঘোরতর নিন্দা করিতেছি; পুতুল পূজা করে বলিয়া কতই উপহাস করিতেছি; যে ধর্ম্মে মূর্ত্তি পূজা করিতে বলে সে ধর্ম্মের কোনও বিধান মানিতেছি না, হঠাৎ—নিজের ভদ্রাসনে মহা ধুমধাম করিয়া শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিলাম এবং তাঁহার নিত্য পূজা যাহাতে চিরদিন চলে সেই নিমিত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিলাম। আচারে, ব্যবহারে, লোক-লৌকিকতায় হিন্দু-ধর্ম্মের বিধানের ধার দিয়া চলি না, ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া গায়ত্রী জপ করি না, নিজের পুত্র যাহাতে 'গায়ত্রী-জপ-তপ' মহা কুসংস্কারের কার্য্য না করে তাহাকে সেইরূপ উপদেশ দিতেছি, সেই ভাবে শিক্ষিত করিতেছি, দুইদিন পরে তাহাকে বিলাত পাঠাইব, কিন্তু তবুও হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে তাহার উপনয়ন দিতেছি।

এই ভাবে, এই যে দু'মুখো সাপে সমাজের অঙ্গে দংশন করিতেছে ইহাতে সমাজের অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে। আমরা সর্ব্ব-বিষয়ে বৈশিষ্টহীন হইয়াছি—কোনও বিষয়ে আমাদের বিশিষ্টতা নাই। আজ-কাল আমাদের জাতীয় একটা বেশ পর্য্যন্ত নাই; আমাদের জাতীয় বেশেও একটা খিচুড়ি-ভাব ঢুকিয়াছে। ধর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে, আহারে, বিহারে, লোক-লৌকিকতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই খিচুড়ী-ভাব—কোনও কিছুতেই, 'জাতীয় বিশিষ্টতা' বলিয়া একটি যে মহা-জিনিস সে জিনিসটি নাই। একটিরই নাম কি

শিক্ষা? ইহারই নাম কি সভ্য হওয়া? জাতীয় শিল্প-রক্ষা যেমন প্রয়োজনীয়, 'জাতীয় পরিচয়ের' জন্য বিশিষ্টতাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। (অপরের সহিত বেশ-ভূষায় এক হইলেই প্রাণে-প্রাণে মিলন হয় না।) একটা বিশিষ্টতা সর্ব্ব-বিষয়ে রক্ষা করা চাই-ই চাই। নচেৎ আমাদের সমাজের চিহ্ন একেবারে লোপ পাইবে। যাহা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা জাতীয়-অবনতি আর কি হইবে? এমন যাহা হইবার নয়—একটা হও।

যদি শ্রাদ্ধ করিতে হয় তো শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে শ্রাদ্ধ কর—শরৎচন্দ্রের মতন বিধান ক্রয় করিও না। যদি বল যে, ঐ সকল শাস্ত্রীয় বিধানের কোনও গুরুত্ব নাই; ওসকল কেবল পয়সা উপার্জ্জনের ফন্দীতে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কৃত—বেশ, তাহা হইলে ঐ সকল বিধান একেবারে পরিত্যাগ কর; অন্য সময় যেভাবে দিনযাপন করিয়া থাক, পিতামাতার মৃত্যু হইলেও সেই ভাবে দিন যাপন কর—শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য বিধির এইরূপ বৃথা অভিনয় ও অপমান করিও না।

আর, যদি এই সব বিধান সত্য হয়—যথার্থই যদি ইহাতে পিতা-মাতার প্রেতত্ব মোচন ও স্বর্গবাস হয় এবং পুত্রের হাতে পিণ্ড পাইলে যথার্থই যদি তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি হয়—তাহা হইলে—তাঁহাদের আত্মার মুক্তি ও তৃপ্তি কামনায় শ্রাদ্ধাদির আয়োজন করিয়া, তাঁহাদের আবাহন করিয়া অবশেষে 'নিয়ম-ভঙ্গের' পূর্ব্বে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সেই কার্য্য পণ্ড করিলে তাঁহাদের কি ভয়ানক ক্লেশ, কি ভয়ানক পরিতাপ হইবে এটা কি ভাবিয়া দেখা উচিত নয়। ইহাতে কি সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে না? এরূপ করিলে পরকালে কি শাস্তি হই

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহা সর্ব্ব-জন-বিদিত যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার নূতন আলোক এ দেশে আসিয়া কেবল কলিকাতার প্রাচীরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলনা। তাহা এদেশের নানা প্রদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পুণ্য ক্ষেত্র সর্ব্বপ্রসিদ্ধ কাশীধামেও তাহা দুই-চারিজন ধনীর গৃহে প্রথমে অল্প-বিস্তর বিস্তার লাভ করে এবং ক্রমে, ক্রমে আরও অনেক পুরাতন ও নূতন ধনীকে স্ব-শ্রেণী ভুক্ত করিয়া লয়।

ভৈরব প্রসাদ পাঁড়ে ৺ কাশীধামের একজন ধনী অধিবাসী; কাশীধামে তিনি একজন ধনী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। সহরে তাঁহার তিন চারি খানি বাটী আছে—সে বাটীগুলি ভাড়া দেওয়া হয়, তাহা হইতে তাঁহার বেশ আয়ও আছে। ইহা ছাড়া নিকটবর্ত্তী দেহাতে বা গ্রামে তাঁহার জমিদারী আছে—তাহা হইতেও তাঁহার বেশ মোটা আয় আছে।

ভৈরব প্রসাদ সহরে থাকেন না—সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে তাঁহার একটি সুসজ্জিত ও সুন্দর বাগান-বাটি আছে—তিনি সেই বাগান-বাটিতে বাস করেন। ভৈরব প্রসাদের পুত্র-সন্তান নাই,কেবল মাত্র একটি কন্যা আছে। কিছুদিন হইল তিনি বিপত্নীক হইয়াছেন। এই সকল ভাড়াটিয়া-বাটি ও জমিদারীর উপস্বত্ব ছাড়া আরও তিন চারি সহস্র মুদ্রা তিনি ব্যবসা করিয়া প্রতি মাসে উপার্জ্জন করেন। তাঁহার ব্যবসায়ের

ক্ষেত্র কেবলমাত্র কাশীধামেই সীমাবদ্ধ ছিলনা—তিনি কলিকাতা হইতে মাল ক্রয় করিতেন এবং কাশীধাম ও পশ্চিমস্থ দুই চারিটি সহর ও অনেকগুলি গ্রামে তাহা বিক্রয় করিতেন। এই ক্রয় বিক্রয় কার্য্য করিবার জন্য কয়েক জন উপযুক্ত কর্ম্মচারী ছিল, তাহারা ভৈরব প্রসাদের প্রতিনিধি-রূপে নানা দেশে গমনাগমন করিয়া ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। ভৈরব প্রসাদ তাঁহার কাশীধামস্থ আবাসে অবস্থান করিয়াই, নানারূপ মাথা খেলাইয়া ও কর্ম্মচারিবর্গকে উপদেশ দিয়া সমস্ত ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতেন। যৌবন কালে—মাল ক্রয় করিবার সময় তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন বটে কিন্তু অন্য যে সকল সহর ও গ্রামে তাঁহার দোকান ছিল—সে সকল স্থানে তিনি কখনও যাইতেন না। অধুনা প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি আর কলিকাতায় পর্য্যন্ত যাইতেন না। কাশীতে বসিয়াই সকল কার্য্য পরিচালনা করিতেন।

ব্যবসায়-সূত্রে অনেক "খিচুড়ি-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী" ও সাহেব সংস্পর্শে আসিয়া ভৈরব প্রসাদও অনেকটা আধুনিক খিচুড়ি-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাস-বাটির ড্রয়িং-রুম সাহেবী ধরণে সজ্জিত করিয়াছিলেন কিন্তু সেই ঘরের মধ্যে তাকিয়া সমেত ঢালা বিছানা পাতা ছিল। ভৈরব প্রসাদ প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, আর সাহেবী-চালে চলিয়া চেয়ারে বসিতে পারিতেন না; তিনি তখন তাঁহার বিশাল উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে সেই ঢালা বিছানার উপর চিৎ-পটাঙ্ হইয়া শুইয়া পড়িতেন। ওরূপ সময়ে হাজার লোক আসিলেও তাহার সম্মানের জন্য,—এমন কি, কোনও সুসভ্যা মহিলা

আসিলেও—কাহার সম্মানের জন্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিতেন না। তিনি প্রতি দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় চা পান করিতেন কিন্তু সেই চা গঙ্গাজলে প্রস্তুত হইত এবং তাঁহার কেমন একটি বদ্ অভ্যাস ছিল যে তিনি কোনও পানীয় বস্তু 'লোটা' ভিন্ন পান করিতে পারিতেন না—এই জন্য তিনি উক্ত গঙ্গাজলে প্রস্তুত চা লোটা করিয়া পান করিতেন, কখনও cup (কাপ্) ব্যবহার করিতেন না। শিক্ষিত ও সভ্য বন্ধুগণের সম্মুখে, তাঁহাকে সভ্যতার খাতিরে সিগারেটের ধূমপান করিতে হইত কিন্তু এদিকে আবার ভরুরা তামাক ঘন ঘন না খাইলে তাঁহার ক্ষুধা হইত না, রাত্রে সুনিদ্রা হইত না, সকালে উদর সাফ হইত না—এইজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে বড়ই বিপদে পড়িয়া যাইতেন। তাঁহার সভ্য ও শিক্ষিত বন্ধুগণ যদি কখনও তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া নানারূপ সুসভ্য আলাপে অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন তাহা হইলে ভরুরা তামাকের ধূমপানের অভাবে ভৈরবপ্রসাদের বড়ই ক্লেশ হইত তাঁহার উদর এত অধিক স্ফীত হইতে আরম্ভ করিত যে কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মনে হইত যে, তিনি বুঝি বা বেলুনের মতন এখনই উড়িয়া যাইবেন। পাছে শরীর খারাপ হইবার ভয়ে তিনি, 'খুব বেশী বয়স না হইলে কন্যার বিবাহ দিবেন না' বলিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। 'যাহাকে লইয়া কন্যা আজীবন অতিবাহিত করিবে, তাহার সহিত যাহাতে বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার প্রেম হয়' এই জন্য তিনি অনেক অন্বেষণ করিয়া অযোধ্যা নাথ নামে একটি যুবককে কন্যার ভাবী-স্বামী নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন এবং কন্যার সহিত অবাধে মেলা-মেশা করিতে তাহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন—কিন্তু

তিনি স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, হিন্দুমতে কন্যার বিবাহ দিবেন। বলা বাহুল্য, অযোধ্যানাথও তাঁহার স্বজাতি ও স্ববর্ণ।

ভৈরব প্রসাদের কন্যার নাম লছমী। লছমী সুন্দরী। তাহার দেহের বর্ণ যেরূপ সুন্দর, তাহার মুখশ্রীও সেইরূপ মনোহর। সে অসামান্যা ও অপূর্ব্ব সুন্দরী নয় বটে কিন্তু সে সুন্দরী; তাহাকে যে কেহ দেখিলেই বলিবে যে, সে সুন্দরী। তাহার রূপ মুনিমনোহর নয় বটে, কিন্তু সে রূপ যে মানব-মনোহর এ কথা নিশ্চয়। এবং সে রূপ যে যুবা-জন-মনোহারা ও যুবা-জন-মনাকর্ষণকারী—একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। লছমীর বয়স এখন সপ্তদশ বর্ষ। এখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবন উথলিয়া পড়িতেছে। একে ঐ রূপ, তাহার উপর আবার ভরা যৌবন—ইহাকে ঠিক, 'ভাদ্রের ভরা নদীতে দুকূল-ব্যাপী প্লাবন' বলা যায়। বলিলেও তাহা যে অমৃত-পূর্ণ কলস, সম্পূর্ণ পাত্রে অবস্থিত, রসভরা টলটল-কায়, মুখরোচক রসগোল্লা—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

লছমীর বয়স যখন পনের বৎসর সেই সময় লছমীর মাতা পরলোকে গমন করেন। লছমীর মাতা, কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহার স্বামী ভৈরব প্রসাদকে তাঁহার পূর্ব্ব হইতে অনেক দিন যাবৎ পীড়াপীড়ী করিতেছিলেন কিন্তু ভৈরব প্রসাদ একেবারে গোঁ ধরিয়া বসিয়াছিলেন যে, 'অধিক বয়স না হইলে হিন্দুমতে কন্যার বিবাহ দিবেন না' এইজন্য লছমীর মাতা, স্বামীর সহিত অনেক বাদ-বিসম্বাদ ও ঝগড়া এবং কান্নাকাটি করিয়াও, তাঁহার জীবিতাবস্থায় কন্যার বিবাহ দেওয়াইতে পারেন নাই; তবে, কন্যা সম্বন্ধে ভৈরব প্রসাদের অন্যান্য যে সব অভিপ্রায় ছিল, সে সকলে তিনি প্রাণপণে বাধা দিতেন বলিয়া তাঁহার

জীবিতাবস্থায় ভৈরব প্রসাদও সে সকল বিষয়ে বড একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। লছমীর মাতার মৃত্যুর পর তিনি লছমীর ভাবী-স্বামীর অন্বেষণে বহু যত্ন ও অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী বিবাহ করিতে, তাঁহার স্বজাতির মধ্যে বড একটা কেহ সম্মত হইলেন না। সকলেই বলে যে, 'বিবাহ দিতে হয় তো এখনই বিবাহ দাও, ও রকম ভাবে বছর কতক 'এপ্রেন্টিস্' খেটে তারপরে বিবাহ করিতে আমরা রাজী নই।' ভৈরব প্রসাদ মহা বিপদে পড়িলেন—তাঁহার স্বজাতীয়দের মূঢ়তার ও অসভ্যতার জন্য তিনি মনে মনে ভয়ানক রাগিলেন,—এত ভয়ানক রাগিলেন যে, রাগের চোটে তাঁহার সমস্ত স্বজাতিকে তিনি এক ঘরে করিয়া দিলেন। তাঁহার সুসভ্য বন্ধুগণ উপদেশ দিলেন যে, "ভিন্নজাতে বিবাহ দাও"—তিনি কিন্তু এ উপদেশে সম্মত হইলেন না; এর বেলায় 'সমাজ সংস্কার, জাতীয় উন্নতি,' প্রভৃতি গালভরা, বড় বড় কথাগুলি সব ভুলিয়া গেলেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" অবশেষে, প্রায় দুই বৎসর পরে তিনি অযোধ্যানাথের সন্ধান পাইলেন।

অযোধ্যানাথ ঐ কাশীরই একজন ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির একমাত্র পুত্র কিন্তু বর্ত্তমানে সে একরূপ নিঃসম্বল। অযোধ্যানাথের পিতা যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাহার খুব সুখ, ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর পর সে একেবারে পথের ভিখারীর মত হইল। অযোধ্যার পিতার অনেক দেনা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সকল পাওনাদারে মিলিয়া একযোগে নালিশ ও ডিক্রী করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করিয়া লইল। এইরূপে সমস্ত পিতৃ ঋণ পরিশোধ হইল

ঘটে অযোধ্যা কিন্তু একেবারে কপর্দ্দক-হীন হইল; সুখের উচ্চস্তরে সুখে সঞ্চরণ করিতে,করিতে সে সহসা একেবারে দুঃখের'চারিদিক—অন্ধকারময় নিম্নতম-স্তরে' সবেগে নিপতিত হইল।

এইরূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে অযোধ্যা প্রথম দুই, চারিদিন একটু কাতর হইয়া পড়িলেও অতি শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইল। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য সে চাকুরীর অন্বেষণে বহির্গত হইল। চাকুরীর অন্বেষণে ঘুরিতে, ঘুরিতে সে ভৈরব প্রসাদের সহিত পরিচিত হইল। অযোধ্যা বি, এ, পাস করিয়াছিল; তাহাকে শিক্ষিত দেখিয়া এবং তাহার পিতৃ-পরিচয় পাইয়া তাহাকে সৎ ও সম্ভ্রান্তবংশ-সম্ভূত জানিয়া ভৈরব প্রসাদ মনে, মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, ইহাকেই লছমীর ভাবী-স্বামী নির্ব্বাচন করিলাম। ইহারই সহিত—প্রথমে প্রেম সঞ্চারের অবসর দিয়া—পরে লছমীর সহিত বিবাহ দেওয়াইব।

ভৈরব প্রসাদ প্রথমটায় তাঁহার মনের সঙ্কল্প মনে, মনেই রাখিয়া দিলেন। ভৈরব প্রসাদ, অযোধ্যাকে বলিলেন—"দেখ বাপু তুমি সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, তোমার বাপ একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব না থাকলেও পরিচয় ছিল; এখন দুর্ভাগ্য ক্রমে তোমার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হ'য়েছে ব'লে আমি তোমায় যা, তা একটা কাজে ঢোকাতে পারি না। আমি তোমাকে, আমার কন্যার গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত ক'রলুম। এই কার্য্যের জন্য তুমি উপস্থিত জলপানি স্বরূপ একশত টাকা মাসিক পাবে এবং আমার বাড়ীতে থাকতে ও খেতে পরতে পাবে।"

ভাগ্যহীন অযোধ্যানাথ এতটা আশা করে নাই। সে ভাবিয়াছিল যে, এখানে যদিও চাকুরী পাওয়া যায় তাহা হইলে বড় জোর পঞ্চাশ,

ষাট টাকা মাহিনার একটা গোমস্তাগিরী কি মুহুরীগিরী, চাকুরী হইবে এবং তাহাকে নানা দেশে ঘুরিয়া, ঘুরিয়া কাজ করিতে হইবে। এক্ষণে এই একেবারে অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া সে মহা আনন্দিত হইল। দীনের প্রতি দীননাথের এই দয়া দেখিয়া, নির্বান্ধবের প্রতি জগদ্বন্ধুর এই অযাচিত বন্ধুত্ব দেখিয়া, সে, সেই দয়াময়ের শ্রীচরণে মনে, মনে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিল। এবং সেই অব্যক্ত, অচিন্তনীয় দয়াময়ের বর্ণনাতীত, ভাবাতীত দয়ার কথা স্মরণ করিতে, করিতে বিভোর হইয়া গেল; কিছুক্ষণ আর কোনও কথা কহিতে সক্ষম হইল না।

সে নীরব, কিন্তু তাহার বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া ভৈরব প্রসাদ তাহার মনের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিতে ছিলেন এইজন্য তিনিও কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে অতীত হইবার পর তিনি বলিলেন—"দেখ, আমার অনেক দিন হতে সাধ যে, আমার কন্যাটি বেশ শিক্ষিতা হবে, ভাল ক'রে ইংরাজি পড়তে ও লিখ্‌তে পার্‌বে, স্বাধীন ভাবে স্বাধীন-চিন্তা কর্‌তে পার্‌বে, ভারত-সুলভ জড়সড় ভাব ত্যাগ ক'রে পাঁচজন শিক্ষিত, সজ্জনের সঙ্গে মিশতে পারবে। এই রকম অনেক সাধ আমার মনে আছে কিন্তু আমার পরিবারের অর্থাৎ লছমীরও মার জন্যে আমি এতদিন এ সাধ পূর্ণ করতে পারিনি। যদি বল—"কেন আপনার স্ত্রীতো মেয়েমানুষ এবং এখনও আমাদের দেশের এতটা উন্নতি হয়নি যে স্ত্রী, স্বামীর অপেক্ষা বয়েসে বড় হবে—সুতরাং সে মেয়ে মানুষ আবার আপনার অপেক্ষা বয়সে ছোট, অতএব আপনি কেন তার কথায় কর্ণপাত করতেন?" এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, আমার স্ত্রী মেয়েমানুষ হ'লেও এবং আমার অপেক্ষা বয়সে

ছোট হ'লেও আমি তাঁকে—আমি তাকে—অর্থাৎ কিনা আমি তাকে একটু ভয় করতুম। কারণ সে স্পষ্টই ব'লত যে. আমি লছমীকে কোনও মতেই পাঁচজন পুরুষের সামনে বেরুতে দোবনা কারণ এখন সে বড় হয়েচে। আর একটা ব্যাটাছেলের কাছে ব'সে যে ঐ বুড়ো-ধাড়ী মেয়ে লেখা-পড়া শিখবে সেটি আমি বেঁচে থাকতে হবেনা। মেয়ে আমার, দশবৎসর বয়েস অবধি পণ্ডিতের কাছে প'ড়েছে তাতে ওর যা বিদ্যে হয়েচে তাই যথেষ্ট। ও চিঠি-পত্র লিখতে, প'ড়তে ভাল রকম পারে, ভাল বই, টইও ভাল রকম প'ড়তে পারে। যখন পণ্ডিত ছাড়িয়ে দেওয়া হয় সে সময় তো মাষ্টার রাখবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছিলে কিন্তু আমি তা রাখতে দিইনি। তারপর এই দু' বৎসর চ'লে গেল—এতদিন ধ'রে ও তো নিজেই বেশ বই টই পড়চে, চিঠি লিখচে। এর বেশী লেখাপড়া শিখে ওর কি দরকার? এখন যা শেখবার দরকার তা আমার কাছে এই দু বৎসর ধরে শিখে ও সে-কাজে পাকা হয়ে গেছে। এখন ঘর-গেরস্থালীর কাজ শেখা দরকার, সেটা ভাল ক'রে শিখিয়ে পাকা করে দিয়েছি। ওকে নিরক্ষরা বা অশিক্ষিতা বলতে তো পারবেনা; আর লেখাপড়া শেখবার ওর কোনও দরকার নেই ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা ব'লে তার পরে ব'লত যে, 'দেখ, আমি যা, যা বললুম তার যদি একটু এদিক ওদিক হয় বা ঐ সব কথার যদি একটুও অন্যথা কর তাহলে আমি নিশ্চয়ই গলায় দড়ি দোব।" দেখ অযোধ্যা এই সব নানা কারণে আমি লছমীকে মনের মতন ক'রে তৈরী করতে পারিনি। তা এখন যখন আমার স্ত্রী ব্যাচারি স্বর্গে চলে গেল তখন আর কার খাতিরে মনের সাধ বিসর্জ্জন দোব বল? সেই জন্যে তোমায়

বিশেষ করে বলে দিচ্চি যে, তুমি লছমীকে বেশ ভাল করে ইংরাজী, ফরাসী নভেল টভেল পড়িয়ে পাক্কা রকম শিক্ষিতা করে দেবে। আমার স্ত্রী যে রকম ভাব শিক্ষিতার কথা বলত' সে রকম ভাবে মেয়েকে শিক্ষিতা করলে আমার মন তৃপ্তি হবে না! লছমীকে এমন ভাবে শিক্ষিতা করবে যাতে ওর মনের স্বাধীন প্রবৃত্তির দ্বারগুলি সব একেবারে খুলে যায়; খোলা জানালা দিয়ে মুক্ত আকাশ পানে চাইলে—আকাশে উড্ডীয়মান স্বাধীন ও অবাধ-গতি পাখীর মতন স্বাধীন ভাবে ওড়বার সাধ যাতে ওর মনে হয় এমনই ভাবে ওকে শিক্ষিতা করবে। মোট-কথা, ওর মনে যাতে কোনও রকম কুসংস্কার থাকতে না পারে এমনি ভাবে ওকে শিক্ষিতা করবে—বুঝলে?

অযোধ্যা এক রকম সুখেই, ভৈরব প্রসাদের আবাসে বসবাস করিতে লাগিল। সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে লছমীকে ইংরাজী পুস্তক পড়ায় এবং সন্ধ্যাকালের শকুন্তলা ও মেঘ-দূতের ব্যাখ্যা করিয়া শোনায় ও পড়ায়; এতদ্ব্যতীত তাহার আরও একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ছিল; মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ভৈরব প্রসাদ যখন তাঁহার বিশাল ভুঁড়ি উঁচু করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতেন সেই সময় অযোধ্যা ইংরাজী সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইত।

এইভাবে প্রায় ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। অযোধ্যা প্রথম হইতেই লছমীকে দেখিয়া একটু ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাকে অর্থাৎ—লছমীকে তাহার বড়ই পছন্দ হইত; সে লছমীকে দেখিতে ব্যস্ত হইত। লছমীর রূপরাশি, তাহার চক্ষে—অন্যান্য সকলের অপেক্ষা—অধিক মনোহর, অধিক সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইত; লছমীকে যখন, তখন

দেখিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইত, তাহার মনে হইত যে, লছমীর সহিত যদি তাহার বিবাহ হয় তাহা হইলে বড় ভাল হয় ইত্যাদি লক্ষণ-গুলিকে যদি ভালবাসার লক্ষণ বলেন তাহা হইলে সে, লছমীকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিল।

লছমীর মনও অযোধ্যার দিকে বেশ একটু চলিয়াছিল। লছমী যুবতী; স্বভাব-ধর্ম্মে এবং মাতার মৃত্যুর পর, পিতৃ-প্রদত্ত শিক্ষাতে ও আনু-ষঙ্গিক কর্ম্মে তাহার মনটা এখন খাঁ, খাঁ করিতেছিল; সে প্রাণের ভিতর একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করিতেছিল। এইরূপ সময়ে সুশ্রী, শিক্ষিত যুবক অযোধ্যাকে দেখিয়া ও তাহার সহিত মেলামেশা করিতে পাইয়া লছমীর মনে হইতেছিল যে—এখনই ছুটিয়া গিয়া উহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া প্রাণের শূন্য স্থান পূর্ণ করি। লছমী শান্ত শিষ্ট ও সুশীলা এবং অল্প দিন মাত্র স্বাধীনতার অল্প আস্বাদ পাইয়াছে তাই সে তাহার মনের দুর্জ্জয় বাসনা মনেই চাপিয়া রাখিল। এইরূপ ভাবে মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে প্রথমটায় তাহার বিশেষ কষ্ট হয় নাই, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল এই কষ্টের মাত্রাও তত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল কিন্তু তবুও সে মনের ভাব চাপিয়া রাখিত এবং অযোধ্যাকেও কোনও রূপে প্রশ্রয় দিত না।

শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে বেশ একটা মজার ব্যাপার চলিতেছিল। দুজনেই মনে, মনে দুজনকে চায়; উভয়ের অদর্শন উভয়েরই পক্ষে কষ্টকর; পরস্পরেই, পরস্পরকে পাইতে একান্ত লালায়িত; যুগলের মনের মধ্যে কথার সাগর বহিয়া যাইতেছে, একটা প্রকাণ্ড উপন্যাস তৈয়ারী হইয়া যাইতেছে কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া কাহাকেও এ সম্বন্ধে

কোনও কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছে না। অযোধ্যা, প্রতিদিনই লছমীকে দেখিতেছে, পড়াইতেছে, তাহার সহিত নির্জ্জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবস্থান করিতেছে, চুরি করিয়া লছমীর মুখের দিকে, অবসর পাইলেই অপলক নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে এবং চুরি ধরা পড়িয়া গেলেই দিব্য ভাল মানুষটির মতন আকাশ পানে এমন ভাবে চাহিয়া দেখিতেছে যাহাতে বেশ স্পষ্টই মনে হয় যে—এক জন গ্রহ-তারকা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও একাগ্রমনা জ্যোতির্ব্বিদ—কোনও নব গ্রহ আবিষ্কারের আশায় এক মনে আকাশ পানে চাহিয়া গ্রহগণের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছে।

লছমীর অবস্থাও ঐ রকম, তবে চুরি বিদ্যায় সে অযোধ্যার অপেক্ষা কিছু কম পারদর্শিণী এবং তাহার চুরি যখন ধরা পড়িয়া যায় তখন সে আকাশ পানে চাহেনা—টপ্ করিয়া তাহার নিজের পদ-যুগলে পরিহিত জুতা জোড়াটির পানে এমন ভাবে চাহিয়া থাকে যাহাতে মন হয় যে, সেই জুতা জোড়াটার ভিতর, সে এমন কিছু শোভা দেখিয়াছে, যাহা অপলক নেত্রে ও বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়াও তাহার মন তৃপ্ত হইতেছে না।

দূরে, দূরে থাকা এক রকম মন্দের ভাল। এ রকম কাছে থাকিয়া—যাহাকে বক্ষের উপর ধরিতে ইচ্ছা করে তাহাকে বক্ষে ধরিতে পাইব না, যাহাকে প্রাণের কপাট খুলিয়া প্রাণের গোপন-কথা বলিতে ইচ্ছা করে তাহাকে তাহা বলিতে পাইব না—বলি, বলি করিয়াও বলিতে পাইব না এটা বড়ই দুঃখময়, বড়ই হৃদয় ভেদী, প্রায় প্রাণ-ঘাতী ব্যাপার। এইরূপ সাংঘাতিক অবস্থায় প্রায় ছয় মাস অতীত হইয়া যাইবার পর, একদিন মধ্যাহ্নে ভৈরব প্রসাদ ইহাদের নিকট নিজের মনো-

ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে—"দেখ লছমী আমি মনে করছি যে অযোধ্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দোব—এসম্বন্ধে তোমার যদি কোনও আপত্তি থাকেতো আমায় বলো। আর অযোধ্যা তুমিও শোন—দেখ তুমি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তবংশীয় সুশ্রী যুবক, তোমাকে আমি লছমীর স্বামী নির্ব্বাচিত করলে, লছমীর প্রতি আমার কোনও অবিচার করা হবেনা বা তার প্রতি আমার কর্ত্তব্যের কিছু ক্রটীও হবেনা। আমি যে রকম ভাবে লছমীর বিবাহ দিয়ে আমার স্বজাতীর মধ্যে একটা সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেতে চাই সেই রকম ভাবে বিবাহ দেবার যোগ্য পাত্র তুমি। এই সকল নানা কারণে আমি ইচ্ছা করি যে, তোমার সঙ্গেই লছমীর বিবাহ দোব। আমার ধারণা যদি ভ্রান্ত না হয় তাহলে বোধ হয় তোমরা স্বীকার করবে যে—তোমাদের উভয়েরই উভয়ের প্রতি একটু ভালবাসার সঞ্চার হয়েছে। এটা যদি ঠিক হয় তাহলে তোমরা স্থির জেনো যে তোমাদের প্রণয় ব্যর্থ হবে না, তোমাদের দুজনের বিবাহ দিয়ে আমি তোমাদের দুটিকে এক ক'রে মিলিয়ে দোব। তবে কিঞ্চিৎ বিলম্বে; আরও কিছু দিন গত হোক, তোমাদের ভালবাসাটা আরও বর্দ্ধিত হোক, তার পর শুভমিলন হবে।"

ভৈরব প্রসাদের মুখে এই সকল মধুময় কথা শুনিতে শুনিতে অযোধ্যা ও লছমীর মনে হইতেছিল যে, তাহাদের কর্ণে যেন মধু বৃষ্টি হইতেছে। ভৈরব প্রসাদের কথা শেষ হইতেই লছমী আরক্ত-বদনে ও সলজ্জভাবে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ভৈরব প্রসাদ ভাবিলেন যে—কন্যার লজ্জা হইয়াছে তাই সরম ভরে পলায়ন করিল। অযোধ্যা ভাবিল যে—লছমীর বোধ হয় তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই তাই সে

বিরাগ ভরে পলায়ন করিল। লছমী সম্বন্ধে ভৈরব প্রসাদ ও অযোধ্যা উপরোক্ত যে ধারণা মনে, মনে পোষণ করিতেছিল তাহাতে উভয়েরই ভুল হইয়াছিল। আমাদের ধারণা যে—'লছমী সরম ভরে কিংবা বিরাগ ভরে সেই ঘর হইতে পলায়ন করে নাই। তাহার পিতা যখন তাহার বিবাহের কথা বলিতেছিলেন তখন তাহার কর্ণে মধু বর্ষিত হইতেছিল—পিতার সেই মধু-বর্ষী কথা অধিকক্ষণ ধরিয়া শুনিলে পাছে তাহার কাণে অধিক মধু জমিয়া গিয়া পিপীলিকা ধরিয়া যায় কিংবা মধুলোভে মত্ত অলিকুল আসিয়া কটাস্-কামড়ে কর্ণমূল ফুলাইয়া দেয়—এই ভয়ে সে,সেই ঘর হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

যেদিন মধ্যাহ্নে ভৈরব প্রসাদের নিকট হইতে তাহারা জানিতে পারিল যে, তাহাদের উভয়ের মিলন হইবে সেই দিন সন্ধ্যার পর লছমীর পড়িবার সময়, পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিতে, শিক্ষক ও ছাত্রী উভয়েরই একটু লজ্জা হইতেছিল। ঠিক সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় পাঠ আরম্ভ হইত, আজ সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছে কিন্তু পাঠ-গৃহ নির্জ্জন; তথায় শিক্ষক ও ছাত্রী কেহই নাই। তাহাদের দুজনেরই লজ্জা করিতেছিল বটে কিন্তু পাঠ-গৃহে যাইবার জন্যও প্রাণের ভিতর প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল। এই রকম "লজ্জা-লজ্জা করে আবার ইচ্ছে ইচ্ছেও করে" ভাবটা বেশীক্ষণ আর স্থায়ী হইল না। যখন আট ঘটিকা বাজিয়া গেল, তখন উভয়েরই মনে হইল যে—"আর বিলম্ব করা হবেনা—এইবার পড়ার ঘরে যেতেই হবে।"

অযোধ্যা অপরাহ্ন হইতেই উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিল, লছমী তাহার পিতার নিকট বসিয়া—পিতার, ও পিতার নিকট সমাগত পিতৃ-বন্ধুগণের

গল্পগুজব শ্রবণ করিতেছিল। আট ঘটিকা বাজিতেই, প্রণয়-দেবতার অদৃশ্য হস্তের রজ্জু আকর্ষণে উভয়েই, বিভিন্ন স্থান হইতে পাঠ-গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল।

লছমীর পাঠ-কক্ষ বাটির মধ্যস্থলে অবস্থিত। পাঠ-কক্ষের সম্মুখ দিয়া একটি দীর্ঘ পথ, বাটির দুই প্রান্তস্থিত বারান্দায় গিয়া মিলিয়াছে। সেই পথের এক দিক হইতে লছমী তাহার পাঠ-কক্ষাভিমুখে আসিতেছে। প্রাণে প্রবল ইচ্ছা—তবুও, কি একটা অজ্ঞাত লজ্জায় তাহার মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, প্রতিদিনই এই ঘরে সে প্রবেশ করে—তাহার পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য দাস, দাসী পর্য্যন্ত তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখে এবং সেজন্য তাহার কোনও প্রকার লজ্জা, কোনও দিনই হয় নাই। আজ কিন্তু—পাছে তাহাকে কেহ দেখিয়া ফেলে—এই কারণে তাহার বড়ই লজ্জা হইতেছিল। এই প্রকার লজ্জায়, সে পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া—কেহ আসিতেছে কি না—দেখিতে, দেখিতে, পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার পাঠ-কক্ষের দিকে অতি সন্তর্পণে চলিয়াছে। অযোধ্যার মনের ও আজ ঠিক ঐ অবস্থা, লছমীর মত সেও পিছু হাঁটিতে, হাঁটিতে পাঠ কক্ষের দিকে অতি সন্তর্পণে চলিয়াছে। এইরূপ ভাবে পিছু হাঁটিয়া চলিতে,চলিতে তাহারা দুইজনে পাঠ-কক্ষের সম্মুখে আসিবামাত্র দুইজনের দেহে, দেহে ঠেকিয়া গিয়া, দুইজনেই পশ্চাৎ দিক হইতে একটা ধাক্কা খাইল। ধাক্কার চোটে চমকিত হইয়া দুজনেই একযোগে চকিতে পশ্চাৎ-দিকে ফিরিল। পশ্চাৎ ফিরিয়াই উভয়ে উভয়কে দেখিতে পাইয়া প্রথমে বিস্মিত, চমকিত, পুলকিত হইয়া অবশেষে কিয়ৎক্ষণের জন্য উভয়েই বাহ্যজ্ঞান হারাইল। অল্পক্ষণ পরে যখন তাহাদের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া

আসিল তখন উভয়ে দেখিল যে, তাহারা দুইজনেই দুইজনের সবেগ-আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ এবং উভয়েরই ওষ্ঠাধর সুধা পানে নিযুক্ত।

ব্যস্—এইদিন হইতে লছমী, অযোধ্যার সহিত ভাল রকম মেলামেশা ও গল্প-গুজব করিতে আর ইতঃস্ততঃ করিত না। অযোধ্যাও আর, লছমীকে প্রাণের কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। এই দুই প্রণয়ী-যুগলের মধ্যে সদ্বংশ-সুলভ-নৈতিক-জ্ঞানজাত যে একটা সঙ্কোচ ছিল—যে সঙ্কোচ ইহাদের দুজনকেই, পরস্পরের সহিত প্রেমভাবে মেলামেশা করিতে ও প্রণয়-গুঞ্জনে মত্ত হইতে বিরত রাখিত—ভৈরব প্রসাদের মুখ হইতে বিবাহের আশা প্রাপ্ত হওয়াতে ইহাদের সেই সঙ্কোচ বিদূরিত হইল। সেইদিন হইতে—'কে, কাহাকে অধিক ভালবাসে'—'কাহার ভালবাসা অধিক গভীর'—'সর্ব্বাগ্রে কে ভালবাসিয়াছিল' প্রভৃতি চির-প্রচলিত ও চির-পুরাতন অথচ চির-নূতন মধুময় ব্যাক্যালাপে ইহাদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। এই মধুময় আলাপে মগ্ন হইয়া ক্রমাগত একাগ্র-অনুশীলন করিতে করিতে যখন ইহারা একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িত তখন মধ্যে মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের অধর-সুধা পান করিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিত; আবার দ্বিগুণ উৎসাহে আড়ে-হাতে লাগিয়া যাইত।

এইভাবে আরও ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। এখন প্রণয়ের কথায় ও মধ্যে মধ্যে মুখ-চুম্বনে আর ইহাদের মন উঠিতেছে না। বিবাহের জন্য উভয়েরই মন মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এ বিষয়ে একদিন দুজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক রকম পরামর্শ করিয়া অবশেষে ভৈরবপ্রসাদের নিকট নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিল।

ভৈরবপ্রসাদ একদিন প্রাতঃকালে একখানি ভাল কুশন্ চেয়ারে

দুই পা তুলিয়া উবু হইয়া বসিয়া, দুই হাতে একটি লম্বা কলিকা ধরিয়া ভুর্‌রা তামাকু সেবন করিতেছিলেন। এটি তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম এবং এ সময় তাঁহার মনটি বড়ই প্রফুল্ল থাকে। অযোধ্যা ও লছমী তাঁহার এই স্ফূর্ত্তীর সময় তাঁহার নিকট একত্রে আগমন করিল। ভৈরবপ্রসাদ মনের সুখে ভুর্‌রা খাইতেছিলেন, এইজন্য উহারা উভয়ে দণ্ডায়মান থাকা সত্ত্বেও প্রথমটায় কোনও কথা কহিলেন না। কিছুক্ষণ ধূমপান করিয়া অবশেষে একটি দীর্ঘ ও সুখটান টানিয়া, একমুখ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে উহাদের দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কিহে অযোধ্যা তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস', বোস' একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়ো—লছমী তুইও মা বোস্।"

প্রেমিক-যুগল কিন্তু বসিল না এবং কোনও কথাও কহিল না, পূর্ব্ববৎ ভাবে নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। তাহাদের এইরূপ ভাব দেখিয়া ভৈরবপ্রসাদ বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন,—"কিহে তোমরা ব'সছনা যে? আর আমার মুখের দিকে ওরকম ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে, হাত-জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছ যে? কি ব্যাপারটা বল দেখি শুনি?"

অযোধ্যা সহসা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া করযোড়ে বলিল,—"আমাদের প্রতি আপনি দয়া করুন; দয়া ক'রে আমাদের দু'জনের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন ক'র্ত্তে অনুমতি দিন।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন,—"য়্যাঁ, কি ব'লছ হে! বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন কর্ত্তে অনুমতি দোব কিহে! ওহে, ওকি কথা হে!"

অযোধ্যা বলিল,—"আজ্ঞে এ বিষয়ে আমরা উভয়ে একমত হ'য়ে

আপনার চরণে নিবেদন জানাতে এসেছি। আপনি দয়া ক'রে আমাদের বিবাহ দেবার——"

ভৈরবপ্রসাদ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বিবাহ—বিবাহ—ও কথাটি ভুলে যাও—ওটি এখন হ'চ্চে না। আরও তিনটি বৎসর চুপ ক'রে থাকতে হবে। লছমীর বয়েস এখন সতেরো বৎসর; আরও তিন বৎসর পরে, লছমীর বয়েস কুড়ি বৎসর হ'লে পরে, তবে আমি তোমাদের বিবাহ দোব। যদি অল্প বয়েসেই বিয়ে দোব তাহ'লে তো লছমীর মার ইচ্ছামত অনেকদিনই ওর বিয়ে দিয়ে দিতুম। তা'হলে কি আর ওকে লেখাপড়া শেখাতুম, না তুমি ওর সঙ্গে মেলামেশা কর্‌বার সুযোগ পেতে। ওকথা এখন ভুলে যাও। এখন দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে যাও, কেবল ভালবেসে যাও। দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে মিত্রতা বর্দ্ধিত কর; সহযোগীতা ক'রে আত্মীয়তা বর্দ্ধিত কর—বুঝলে? তারপর তিন বছর বাদে বিবাহ।"

অযোধ্যা বলিল,—"আজ্ঞে আমরা দু'জনই দু'জনকে খুব ভালবেসেছি আর উভয়ের বিচ্ছেদ উভয়ের পক্ষেই বড় কষ্টকর হয়ে পড়েছে।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"ও ভালবাসা কোনও কর্ম্মের নয়। এত অল্পদিনে ভালবাসা হ'তে পারে না। এখনও আরও তিন বৎসর ভালবেসে যাও—কেবলমাত্র ভালবেসে যাও, আর কিছু নয়—খালি ভালবাসা। তোমরা পরস্পরে পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হবে, এই কথা মনে রেখে ঐ ভাবে দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে যাও। কিন্তু কার্য্যতঃ দু'জনে ভাই-ভগ্নীর মতন ব্যবহার কর্ব্বে—বুঝলে?"

অযোধ্যা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। লছমী পূর্ব্ব হইতে

কোনও কথা কহিতেছিল না ; এখনও নীরবে রহিল। ভৈরবপ্রসাদ ঐ সকল কথাগুলি বলিয়া, সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু একটুখানি অগ্রসর হইয়াই পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন,—"ছাখ, আমি তোমাদের দু'জনকেই বেশ ভাল ক'রে বলে দিচ্চি যে, 'তোমরা ভবিষ্যতে দু'জনে, দু'জনের স্বামী-স্ত্রী হবে, এই কথাটি বর্ত্তমানে কেবলমাত্র মনে মনে জানবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ভাই-ভগ্নীর মতন ব্যবহার দু'জনেই করবে। এই কথাটি বিশেষ ক'রে মনে রাখবে। অযোধ্যা, তুমি এখন লছমীকে লেখাপড়া শেখাও, লছমী শিখুক। তুমি এখন পাশ্চাত্য জগতের নানাদেশের ও নানা পুস্তকের—নানারকম গল্পগুজব কর, লছমী সে সব শুনুক। পাশ্চাত্য দেশের নানা রকম উপন্যাস প'ড়ে, তোমরা এখন প্রকৃত ভালবাসা কি, তাই শিক্ষা কর ; তারপর অন্য কথা। যা যা ব'ললুম বেশ ক'রে দু'জনে মনে রাখবে, নইলে আমি অনর্থপাত ক'রব।"এইকথা বলিয়া তাঁহার সদাসর্ব্বদার সঙ্গী লাঠিগাছটি ঠক্ ঠক্ শব্দে ভূমে ঠুকিতে ঠুকিতে সবেগে প্রস্থান করিলেন। অযোধ্যা ও লছমী নীরবে হতভম্বের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

এই ঘটনার পর একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। ভৈরবপ্রসাদ পূর্ব্ব হইতেই অধিকাংশ সময়ই লছমী ও অযোধ্যাকে নিজের কাছে কাছে রাখিতেন ; এই ঘটনার পর হইতে যে সময়টা তাহারা নির্জ্জনে থাকিবার অবসর পাইত, সেই সময়ের মধ্যেও একাধিকবার তাহাদের নিকটে সহসা গমন করিয়া,তাহারা কি করিতেছে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতেন। এই সময় হইতে সকলেরই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানের পর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে ভৈরবপ্রসাদ তাঁহার ড্রয়িংরুমে বসিয়া চা পান করিতেন— এই সময় লছমী ও অযোধ্যাকে তাঁহার নিকটে বসিয়া চা পান করিতে হইত। চা পানের কিয়ৎক্ষণ পরে, লছমী অযোধ্যাকে সঙ্গে লইয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া পড়িতে বসিত। তাহাদের পড়াশুনা দুইঘণ্টা অবধি চলিত। ভৈরবপ্রসাদ এই দুইঘণ্টাকাল ড্রয়িং রুমে বসিয়া চিঠিপত্র পড়িতেন এবং কর্ম্মচারীবর্গকে লইয়া বৈষয়িক কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। তৎপরে স্নানাদির পর কন্যা লছমীও ভাবী জামাতা অযোধ্যাকে লইয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিতেন এবং তথাকার ভোজন কক্ষতলে বিস্তৃত তিনখানি কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া তিনজনে একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিতেন। আহারাদির পর তিনজনেই আবার ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিতেন। এ সময়টা তিনজনে নানারূপ গল্পগুজব ও সংবাদপত্র পাঠে অতিবাহিত করিতেন। তৎপরে অপরাহ্ণে —তিনজনেই উদ্যানে যাইতেন। উদ্যানে গমন করিয়া ভৈরবপ্রসাদ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন ও উদ্যানের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেন। অযোধ্যা এই সময়টা কোনও দিন উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করিত আবার কোনও দিন বা উদ্যান হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তার উপর খানিকটা বেড়াইত; কোনও দিন বা গাড়ী জোতাইয়া সহরে চলিয়া গিয়া খানিকটা ঘুরিয়া আসিত। লছমী এই সময়টা পিতা বা অযোধ্যা কাহারও নিকট থাকিত না। তাহাদের উদ্যান বাটির দুই চারিখানি বাটির পরে মিঃ ঘোষা নামে একজন বিলাত ফেরত বাঙ্গালী পত্নী ও পাঁচটি কন্যা লইয়া বাস করিতেন। মিঃ ঘোষার এই পাঁচটি কন্যার মধ্যে তিনটি যুবতী

ও দুইটি কিশোরী। এই পাঁচটি কন্যার সহিত লছমীর খুব ভাব ছিল। আমরা এই পাঁচটি কন্যাকে অতঃপর লছমীর সঙ্গিনীগণ বলিয়া অভিহিত করিব। ইহাদের সহিত আর দুই একবার আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে।

এই অপরাহ্ন সময়ে—লছমী কোনও কোনও দিন মিঃ ঘোষার বাটিতে গমন করিয়া তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত নানারূপ ক্রীড়া কৌতুকে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর গৃহে প্রত্যাগমন করিত; আবার কোনও কোনও দিন বা তাহারা লছমীদের বাটিতে আগমন করিত এবং সকলে মিলিয়া টেনিশ খেলিত। মিঃ ঘোষার বাটীর চারিদিকে—ভৈরব প্রসাদের উদ্যান বাটির মতন—অনেকটা করিয়া খোলা জমি নাই। তাঁহার বাটিটিও ক্ষুদ্র এবং বাটির চারিপার্শ্বে যেটুকু সামান্য জমি খোলা অবস্থায় পতিত আছে তাহাও আবার নানারূপ বাহারী গাছ ও লতায় পরিপূর্ণ, সেইজন্য বিদূষী কন্যাগণের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তথায় টেনিস্ কোর্ট নাই এবং এই জন্যই তাহারা ভৈরবপ্রসাদের উদ্যানস্থ সুবৃহৎ টেনিশ কোর্টে আসিয়া মধ্যে মধ্যে লছমীর সহিত টেনিশ খেলিয়া যায়।

সন্ধ্যার পর ভৈরবপ্রসাদ কন্যাকে ডাকিয়া লইয়া বাটির ভিতর প্রবেশ করিতেন এবং বাটির পশ্চাৎদিকস্থ বৃহৎ গাড়ী-বারান্দার উপরিভাগে যাইয়া উপবেশন করিতেন। এই সময়ে ভৈরবপ্রসাদের—মিঃ ঘোষের ন্যায়—তিন, চারিটি সুসভ্য বন্ধু আগমন করিতেন। অযোধ্যা যেখানেই যাউক না কেন, এই সময়ের পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাকেও এই স্থানে উপবেশন করিতে হইত। এই সময় সকলে নানারূপ মিষ্টান্ন সহযোগে চা পান করিতেন। চা পানের পর বন্ধুগণের সহিত ভৈরবপ্রসাদ

তাস খেলিতে বসিতেন এবং অযোধ্যাকে লইয়া লছমী পড়িবার ঘরে চলিয়া যাইত।

ভৈরবপ্রসাদ তাস খেলিতে, খেলিতে তথা হইতে মধ্যে, মধ্যে উঠিয়া যাইতেন এবং লাঠি গাছটি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে সহসা লছমীর পড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া—তাহারা দুই জনে—'প্রণয় গুঞ্জনে মাতিয়াছে কিনা' —সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। এই গোয়েন্দাগিরি দুটি বেলা, পড়িবার সময় হইত ; এই জন্য লছমী ও অযোধ্যাকে একটু সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত বটে কিন্তু অবশেষে একটি কারণে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

ভালবাসা দিন, দিন বাড়িতেই থাকে ; কমিবার দিকে যায় না। পরস্পরের সঙ্গ-সুখ লাভ করিবার দারুণ পিপাসা ও অমৃতময় প্রণয়-গুঞ্জনে মাতিবার অদম্য ইচ্ছা, প্রেমিক-প্রেমিকার মনে সদাই বলবতী হয়। একেতো বিবাহ হইল না এবং বিবাহের আশায় এখনও দীর্ঘকাল ক্ষুণ্ণ প্রাণে অবস্থান করিতে হইবে ; তার উপর আবার, যেটুকু মধুময় প্রণয়-আলাপ ও দুই চারিটি চুম্বন বিনিময় হইতেছিল, সেটুকুও ভৈরবপ্রসাদের কড়াকড়িতে ও গোয়েন্দাগিরিতে বন্ধ হইল—এই দুই কারণে লছমী ও অযোধ্যার মনে মহা দুঃখ ও নিরাশার সঞ্চার হইল। দুজনেই—নিজের, নিজের জীবন বৃথা ভাবিল। দুজনেরই মনে হইল যে, 'এ প্রাণ আর রাখিব না। দিবসের অধিকাংশ সময়ই ভৈরবপ্রসাদ, তাহাদের কাছে, কাছে রাখেন ; এক পড়িবার সময় তাহারা একটু নির্জ্জনে থাকিতে পায় বটে কিন্তু তাহাতেও ঐ প্রবল প্রতিবন্ধক। তাহারা পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে একখানি বই লইয়া অতি অল্পক্ষণ পড়িতে থাকে তারপর যখন যেই একটু প্রেমালাপে মগ্ন হইয়াছে অমনই ভৈরবপ্রসাদ'যা তা'একটা

বাজে ছুতানাতায় সেই ঘরে 'যখন তখন' প্রবেশ করিতেন—অমনই বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে প্রেমালাপ বন্ধ করিতে হইত। এইভাবে ক্রমাগত বাধা পাইয়া তাহারা অতীব নিরাশ হইয়া প্রেমালাপ বন্ধ করিল।

'প্রণয়ের-ঠাকুর' চিরদিনই 'প্রেমিক-প্রেমিকার' সহায়। তিন চারি দিন পরে ইহারা দুই জনে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, ভৈরবপ্রসাদ যখনই গোয়েন্দাগিরি করিতে আসেন, তখনই ঠক—ঠক্ করিয়া একটা শব্দ হয়। এই ঠক্-ঠক্ শব্দ তাহাদের মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার করিল। বহুক্ষণের বিরহের পর তাহারা পড়িবার ঘরে মিলিত হইয়াই—সর্ব্বপ্রথমে একটি চুম্বন বিনিময় করিত। তার পরে দুই জনে দুই খানি বহি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া প্রণয়-গুঞ্জনে মত্ত হইত। তারপর সহসা সেই ঠক্-ঠক্ শব্দ শুনিতে পাইলে, অমনি পুস্তকে মনঃসংযোগ করিত।

দুর্ব্বলতাই বলুন, আর মুদ্রা-দোষই বলুন, যাহাই হউক একটি দোষ ভৈরবপ্রসাদের ছিল। ভৈরবপ্রসাদ 'যখন তখন' তাঁহার বিশাল উদরে হাত না বুলাইয়া থাকিতে পারিতেননা এবং একগাছি মোটা বাঁশের লাঠি ভূমে ঠক্-ঠক্ করিয়া না ঠুকিয়া এক পদও চলিতে পারিতেন না। এই মোটা, বাঁশের লাঠি গাছটি এক দণ্ডও কাছ-ছাড়া করিতেন না; ইহাকে সদা-সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখিতেন, এমন কি শয়নকালেও এটিকে খাটের পার্শ্বে রাখিয়া শয়ন করিতেন।

কিছুদিন গোয়েন্দাগিরির পর ভৈরবপ্রসাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, 'তাঁহার আদেশ লছমী ও অযোধ্যা যথাযথ ভাবে পালন করিতেছে—তাহারা ঠিক ভাই—ভগ্নীর ব্যবহারে চলিতেছে।' এই বিশ্বাসে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

একটু
বেআইনি ;

## ভুল-ভাঙ্গা

লছমী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সাতটা হইতে নয়টা অবধি পড়িত। ভৈরবপ্রসাদ তাঁহার বন্ধু-বান্ধবকে লইয়া রাত্রি এগার ঘটিকা অবধি তাস খেলিতেন। প্রতিদিন পড়িবার পর লছমীকে রাত্রি নয়টা হইতে এগারটা অবধি পিতার ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট বসিতে হইত। ভৈরবপ্রসাদ লছমীকে বিশেষ করিয়া আদেশ দিয়াছিলেন যে, আমাদের রাত্রে তাস খেলবার সময় তুমি প্রতিদিন সেইখানে এসে বসে খেলা দেখবে আর আমার শিক্ষিত ও সভ্য বন্ধুগণের সঙ্গে মিশবে, আমাদের গল্পগুজব শুনবে—তাহলে তুমি সভ্য-জগতের অনেক কায়দা-কারণ শিখতে পারবে, বিদুষী হতে পারবে।

রাত্রে সাড়ে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। অযোধ্যা ও লছমী এখনও পড়িবার ঘরে বসিয়া গুজ্-গুজ্-ফুস্-ফুস করিতেছে। 'নারী-শিক্ষা' সম্বন্ধে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে ভৈরবপ্রসাদ আদেশ করিয়াছিলেন সেইজন্য গত-কল্য এবং অদ্য লছমী বড়ই ব্যস্ত ছিল। প্রবন্ধটির জন্য ভৈরবপ্রসাদ খুব তাড়া লাগাইয়াছিলেন সেইজন্য লছমী এই দুই দিন একেবারে প্রেমালাপের অবসর পায় নাই। প্রায় সাড়ে নয়টার সময় প্রবন্ধটি শেষ করিয়া, কাগজ-পত্রগুলি গুছাইয়া রাখিয়া লছমী ও অযোধ্যা দুই চারিটি ভালবাসার কথা কহিয়া যেই একটি চুম্বন করিবার উদ্যোগ করিয়াছে এমন সময় শব্দ হইল ঠক্-ঠক্-ঠক্। ঠক্-ঠক্ শব্দ শুনিতে পাইয়াই তাহারা চমকিয়া উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অযোধ্যা টপ্ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল; লছমী প্রবন্ধের কাগজগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া পুনরায় সেগুলি গুছাইতে লাগিল। ঠক্-ঠক্ শব্দে ভুলিতে হয়ত যেন [illegible]কিতে ঢুকিতে ভৈরবপ্রসাদ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একবার ঘরের

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তৎপরে লছমী ও অযোধ্যার মুখের উপর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"রাত্রি সাড়ে নয়টা কখন বেজে গেছে, এখনও আমাদের খেলার জায়গায় কেন গেলে না লছমী? তোমায় না বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছি যে আমি যখন ঐ সব বড়,বড়,রথী, রথী বন্ধু নিয়ে গল্পগুজব ক'রব বা তাস খেলব সে সময়টা তুমি সেখানে বসবে, তাহলে তোমার বিশেষ উপকার হবে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই যে তুমি আমার বন্ধু-বান্ধবের সহিত মেলামেশা ক'রে জ্ঞান লাভ ক'রতে কেন প্রায়ই অবহেলা কর? তোমায় তিন, চার বার ক'রে ডাকলে তবে তুমি যাও—তাও নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বে। ছিঃ মা, ছিঃ তোমার এরূপ ব্যবহার বড় দুঃখজনক এবং—এবং—কি বলব?—হাঁ, অতীব লজ্জাজনক।"

লছমী বলিল—"বাবা তোমার ঐ সব বুড়ো বন্ধুদের এক ঘেয়ে আলাপ শুনতে, শুনতে আমার বিরক্ত ধরে গেছে। একেবারে না গেলে নেহাৎ তুমি মনে কষ্ট ক'রবে—তাই এক একবার যাই। তা ছাড়া "নারী-শিক্ষা" প্রবন্ধটা শেষ করবার জন্যে তিন, চার বার তাড়া দিয়ে গেলে সেইজন্যে প্রবন্ধটা শেষ করলুম তাই আজ একটু দেরী হয়ে গেল।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"প্রবন্ধটা শেষ করে ফেলেছ? বাঃ—বাঃ বেশ, বেশ। অযোধ্যা তোমায় শিক্ষাদান-কার্য্য বেশ ভাল ফল প্রসব করেচে। তোমার উপর আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি—আমি ভাল দেখে একটা সোণার হাত-ঘড়ি তোমায় উপহার দিতে চাই, তুমি কাল নিজে বাজারে গিয়ে পছন্দ করে কিনে আনবে; বুঝলে? এখন এস—গাড়ী বারান্দায় এস।"

ভৈরবপ্রসাদ ভূমে লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে ঠক্-ঠক্ শব্দে গাড়ী বারান্দার দিকে চলিলেন, অযোধ্যা ও লছমী তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিল।

সকলে গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ আর তাস খেলা হইল না। ভৈরব-প্রসাদ গাড়ী-বারান্দায় উপবিষ্ট বন্ধুগণের সম্মুখে আজ কেবলই কন্যার বিদ্যাবত্তার ও তাহার ইংরাজী প্রবন্ধ রচনার সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। এই সঙ্গে অযোধ্যার ভাগ্যেও কিঞ্চিৎ প্রশংসা বৃষ্টি হইল---সে নেহাৎ একেবারে বাদ পড়িল না। অবশেষে গোটা কতক সিগার ও সিগারেটের শ্রাদ্ধ করিয়া বন্ধুগণ অন্যকার মত বিদায় হইলেন। ভৈরব প্রসাদ, লছমী ও অযোধ্যাকে লইয়া রাত্রিকালীন আহার সম্পন্ন করিতে গেলেন। ভৈরব প্রসাদ রাত্রিকালে আর তাঁহার সেই অন্দর মহলস্থ ভোজন-কক্ষে ভোজন করিতেন না। ( Dineing Room ) ভোজন-কক্ষ নামে অভিহিত, বহির্বাটির একটি কক্ষে তাঁহার রাত্রিকালীন ভোজন সমাধা হইত। এই ভোজন-কক্ষটি ড্রয়িং রুমের পার্শ্বে অবস্থিত এবং এই ভোজন-কক্ষটি পাশ্চাত্য-ভোজন-কক্ষের ধরন অনুযায়ী সজ্জিত আছে। এই কক্ষটির মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ লম্বা টেবিল স্থাপিত আছে এবং এই টেবিলটির চারিধারে কয়েকখানি চেয়ার পাতা আছে। এতদ্ব্যতীত তিনটি আলমারি ও দুইটি সেল্ফ্ওয়ালা ছোট আলমারি সেই কক্ষে আছে। এই সকল আলমারি নানা রকমের পোর্সিলেনের বাসন, ছুরি, কাঁটা, চামচ, ছোট তোয়ালে, বড় রুমাল প্রভৃতি দ্রব্যে সজ্জিত। ভৈরব-প্রসাদ এই কক্ষে বসিয়া রাত্রিকালে আহার করেন। তিনি, লছমী ও অযোধ্যাকে লইয়া এই কক্ষস্থ টেবিলের নিকট বেঞ্চিতে উপবেশন করেন। পাচক ঠাকুর তিন খানি কাংস-নির্মিত

থালিতে করিয়া আটার রুটি, ডাল, তরকারী ও দুই তিন রকমের আচার ও কিছু মিষ্টান্ন সাজাইয়া আনিয়া এই টেবিলের উপর থালিগুলি বসাইয়া দেয়—তৎপরে ইহাঁরা সকলে ছুরি, কাঁটা ও চামচের সাহায্যে ঐ সকল ভোজ্য-দ্রব্য ভোজন করেন। আহারাদির পর সকলে—স্ব, স্ব ভিন্ন, ভিন্ন শয়ন-কক্ষে শয়ন করিতে যান।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উহার পর আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন অপরাহ্নে অযোধ্যা সহরে বেড়াইতে যাইবার জন্য গাড়ি জুতিবার হুকুম দিতেছিল এমন সময় ভৈরব প্রসাদ তাহাকে বলিলেন—"দেখ অযোধ্যা আজ আমি একবার সিকরোলের দিকে যাব মনে করছি। আজ আর তুমি সহরে যেওনা।" এই কথা বলিয়া ভৈরব প্রসাদ বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন।

ভৈরব প্রসাদের দৈনিক জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করিবার ফর্দ পাঠ করিয়া পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে "ভৈরব প্রসাদ একটি বিষম কুনো লোক, তিনি কখনও তাঁহার এই উদ্যান-বাটিকার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরে কোথাও বাহির হন না।" আপনাদের এ অনুমান যথার্থ। ভৈরব প্রসাদ আজকাল বাটীর বাহিরে কোথাও পারতপক্ষে গমন করেন না তবে প্রায় একমাস অন্তর—কখনও বা পনের দিন অন্তর—তিনি অপরাহ্নে একবার করিয়া বাহির হন এবং সিকরোল বা ক্যাণ্টনমেণ্টে গমন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেনও তাঁহাকে সেলাম করিয়া আসেন। এই কার্য্যটি ঠিক নিয়মিতরূপে তিনি বহুদিন হইতে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তিনি তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণের নিকট গল্প করিয়া বলেন যে,—"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে বড়ই ভালবাসেন ও স্নেহ করেন তাই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমি বেশীরভাগ পনের দিন অন্তর তাঁর কাছে

গিয়ে সেলাম দিয়ে আসি ; কোনও, কোনওবার একমাস অন্তর যাই। যদি কখনও আমার যেতে, একমাসের পরে আরও দু, তিন দিন দেরী হয়ে যায় তাহলে সাহেব মহা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তখন বলেন যে, "ভৈরব তোমার এবার আসতে এত দেরী হ'ল কেন? আমার অত্যন্ত ভাবনা হয়েছিল তোমার জন্য। আমি ভাবলেম যে তুমি হয়ত কিছু পীড়া প্রাপ্ত হয়েছ—এই ভাবনায় গত দু রাত্রি আমি নিদ্রা যেতে পারিনি ভাল ক'রে—খানা খেতে পারিনি উদর ভ'রে।" এ রকম সম্মান কটা লোকের হয় বল দেখি—শুনি। আমার বড় লজ্জা করে তাই আমি মুখ ফুটে বলি না ; নইলে আমি যদি মুখ ফুটে একবার বলি তাহ'লে সাহেব আমায়, মহারাজা বাহাদুর টাইটেল দিয়ে দেন।"

এবার এক মাস অতীত হইয়া আরও চারি পাঁচ দিন অতীত হইয়া গিয়াছে তবুও সাহেবকে সেলাম দিতে যাওয়া হয় নাই। সেই জন্য ভৈরব প্রসাদ আজ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অযোধ্যার সহরে যাওয়া বন্ধ করিয়া—সেই গাড়ীতে করিয়া তিনি সিকরোলের দিকে যাত্রা করিলেন।

ভৈরব প্রসাদ বাহির হইয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে লছমী হাত, মুখ ধুইয়া ও কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া অন্দর মহল হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে অযোধ্যা একখানি আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িয়া একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতেছে। লছমী ধীরে, ধীরে অযোধ্যার নিকটে আসিয়া—আরাম-কেদারার হাতলের উপর নিপতিত অযোধ্যার হাতখানি টানিয়া বলিল—"চল অযোধ্যা দুজনে বাগানে গিয়ে এক সঙ্গে একটু বেড়াইগে চল। অনেক দিন এক সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়াইনি ;

আজ যখন ভাগ্যক্রমে অনেকদিন পরে বাবা বাড়ীর বার হয়েছেন তখন চল একটু বেড়ান যাক। আর হয়ত একমাস আবার এ সুযোগ আসবে না।"

অযোধ্যা এই খানি শুনিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"চল"। তৎপরে দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া বাগানে চলিয়া গেল এবং নানা রকম গল্প করিতে, করিতে বেড়াইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর লছমী বলিল—"অযোধ্যা এইবার পেছনকার বাগানে যাওয়া যাক চল। ওদিকটায় অনেক ফুল ফুটে আছে—গোটা-কতক ফুল তুলে আনিগে চল।"

ভৈরব প্রসাদের এই উদ্যান বাটির ঠিক মধ্যস্থলে অট্টালিকাটি অবস্থিত এবং এই অট্টালিকাটি বেষ্টন করিয়া চারিদিকে উদ্যান অবস্থিত এবং এই উদ্যানকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর অবস্থিত থাকিয়া এই উদ্যান-বাটীর প্রান্ত-সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রাচীরের মধ্যস্থলে, রাজপথের উপর এই উদ্যান-বাটির সুবৃহৎ ফটক অবস্থিত। অট্টালিকার সম্মুখ-ভাগস্থ উদ্যানকে ইহার অধিবাসীরা "সামনের-বাগান" এবং অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগস্থ উদ্যানকে "পেছনকার-বাগান" বলিয়া অভিহিত করে।

লছমী ও অযোধ্যা পিছনকার বাগানে উপস্থিত হইয়া এদিক, ওদিক বেড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর লছমী বলিল—"অনেক ঘোরা হ'য়েছে, আমি বড্ড পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি; চল ঐ পাথরের বেদীটার ওপর বসে একটু বিশ্রাম করিগে।"

এই পিছনকার বাগানের প্রায় প্রান্তদেশে একটি মর্ম্মর-বেদী স্থাপিত

আছে। লছমী ও অযোধ্যা—অট্টালিকার দিকে পিছন ফিরিয়া—এই বেঞ্চটির উপর উপবেশন করিল।

তখন সন্ধ্যা হইতে সামান্য কিছু বিলম্ব ছিল। কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিবার পর অযোধ্যা বলিল,—"চল লছমী, এইবার বাড়ীর ভেতর যাই চল। সন্ধ্যা হ'তে আর বড় দেরী নেই।"

লছমী বলিল,—"আমি আর একটু বিশ্রাম না ক'রে আর এক পাও চ'লতে পারব না। প্রায় দেড় ঘণ্টার ওপর বেড়িয়ে আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। আর একটু ব'স। আচ্ছা আমার কাছে বসতে তোমার ভাল লাগছেনা নাকি?" এই কথা বলিয়া লছমী অযোধ্যার স্কন্ধে নিজের মাথাটি রাখিয়া, তাহার অঙ্গে হেলান দিয়া বসিল।

অযোধ্যা বাম হস্ত দ্বারা লছমীর গলদেশ বেষ্টন করিল এবং স্নিগ্ধ ও সুমিষ্ট সান্ধ্য-বায়ু দ্বারা আন্দোলিত লছমীর মস্তকের সম্মুখভাগস্থ কেশগুচ্ছগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে, করিতে বলিতে লাগিল,—"লছমী আর কতদিন আমরা এ রকমভাবে আশায় আশায় দিন কাটাব?" লছমী কোনও কথা বলিল না। অযোধ্যা পুনরায় বলিল—"তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ; আমি কিন্তু বড়ই দুঃখে, বড়ই কষ্টে দিন কাটাচ্চি। আমাদের বিবাহ হ'তে যতই বিলম্ব হচ্চে আমি ততই হতাশ হয়ে যাচ্চি। তুমি কিন্তু বেশ নিশ্চিন্ত আছ।"

লছমী বলিল,—"এর আর উপায় কি ক'রতে পারি বল? আমি কি সাধ ক'রে নীরবে দিন কাটাচ্চি?"

অযোধ্যা বলিল,—"তুমি নিশ্চয়ই আমায় ভালবাসনা তাই নিশ্চিন্তে

আর নীরবে দিন কাটাতে পারছ। আমি কিন্তু তোমায় যে কত ভাল-বাসি, তা যদি জানতে তাহলে আর—"

অযোধ্যার কথায় বাধা দিয়া লছমী বলিল,—"তুমি যদি এই কথা বুঝে থাক তাহলে তুমি আমায় যা ভালবাস তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

অযোধ্যা বলিল—"কি তোমায় আমি ভালবাসি না।"

লছমী বলিল,—"কখনও নয়। যে ভালবাসে সে নিজের মন দিয়ে "তার-ভালবাসার-লোকের" মন বুঝতে পারে। তুমি যদি আমায় ভাল-বাসতে তাহলে তোমার নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারতে যে, আমি তোমায় ভালবাসি কি না, আমার ভালবাসা কতটা গভীর।"

অযোধ্যা বলিল—"তুমি যাই বল; আমি কিন্তু তোমার এই নীরব আর নিশ্চেষ্ট ভাবের প্রশংসা করতে পারি না।"

লছমী বলিল,—"নীরব না থেকে কি করব বল? যখন বাবার অনু-মতি না হলে উপায় নেই অথচ বাবার মনের ভাবও ঐ রকম ভীষণ তখন নীরব হ'য়ে না থেকে উপায় কি?" এই কথাগুলি শেষ করিয়াই লছমী নিজের বাহু-যুগল দিয়া অযোধ্যাকে বেষ্টন করিয়া বলিল—"আখ—বাবার মুখ চেয়ে আমাদের এখন কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে; তাতে সব দিকে ভাল হবে। আমাদের কোনও ভয় নেই—তুমি যখন আমায় ভালবাস আর আমি যখন তোমায় ভালবাসি তখন ভগবান আমাদের সহায় হবেন। কিসের ভয় তোমার? আমি তো তোমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। তুমি ভিন্ন অন্য কারো সঙ্গে আমি বিবাহ-বন্ধনে কখনও আবদ্ধ হব না এটাতো জান?"

অযোধ্যা বলিল—"ঠিক বলেছ লছমী, যখন তুমি আমায় যথার্থ ভাল-

বাস আর আমি তোমায় যথার্থ ভালবাসি তজ্জন্য দয়াময় ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের সহায় হবেন। লছমী একটা কথা আমায় বুঝিয়ে ব'লতে পার ?"

লছমী বলিল,—"কি কথা ?"

অযোধ্যা বলিল,—"দেখ, 'তুমি আমায় ভালবাস' এই কথাটা তুমি প্রথম যেদিন মুখ ফুটে আমায় বল' সেদিন এই কথাটি আমার বড় মিষ্টি লেগেছিল। তারপর তোমার মুখে ঐ কথাটি কত শত বার শুনেছি। আজ তুমি আবার ঐ কথাটি এখন আমায় বলতে—ঐ শত শতবার শোনা অতি পুরান কথাটি ঠিক নূতনের মতন মিষ্টি লাগল কেন লছমী ?"

লছমী মৃদু হাস্য সহকারে বলিল—"তুমি যে যখন তখন বল, আমার সবই মিষ্টি; সেই জন্যেই বোধ হয় আমার কথাগুলো তোমার মিষ্টি লাগে।"

অযোধ্যা প্রেমভরে বলিল—"সত্য লছমী, তোমার মুখের কথাগুলি বড় মিষ্টি; তার চেয়ে আবার, তোমার মুখখানি আরও অধিক মিষ্টি। সেই জন্যেই তোমার মুখে চুমো খেতে অত ভালবাসি।"

লছমী বলিল—"তা মন্দ নয়, জল খাবারের পয়সা বেঁচে যায় ; তা ওটা জানত যে—অধিক মিষ্ট খাইলে পীড়া হয়।"

অযোধ্যা বলিল—"তা হয় হোক। পীড়ার ভয়ে যে মিষ্টি খেতে বিরত থাকে সে বনে গিয়ে বাস করুক। আমি পীড়ার ভয় করি না অতএব আমি অধিক পরিমাণে মিষ্টি খাব।" এই কথা বলিয়া সে লছমীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাদরে একটি চুম্বন করিল।

লছমী ঈষৎ লজ্জাপূর্ণ স্বরে মৌখিক—"আঃ যাও"—বলিল বটে কিন্ত

সেও অযোধ্যার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া মুখে দুইটি চুম্বন করিল। অযোধ্যা এইবার লছমীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে দুইটি প্রতি-চুম্বন করিল। ইহাদের চুম্বন বিনিময়ের মৃদু শব্দ মিলাইতে না মিলাইতে একটি উচ্চ ও কঠোর শব্দে ধ্বনিত হইল—"আবার? আবার? যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে; আর নয়; আর চুমু খেওনা। খবরদার আর চুমু খেও না।"

অযোধ্যা ও লছমী এই কঠোর শব্দে চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল যে, ভৈরবপ্রসাদ কট্ মট্ করিয়া চাহিতে চাহিতে দণ্ডায়মান আছেন। ইহারা দুইজনেই, ভৈরবপ্রসাদকে দেখিয়াই অগ্রে তাঁহার হাতের দিকে চাহিল, এবং দেখিল যে, তাঁহার অতি প্রিয় লাঠি-গাছটি তাঁহার হাতে নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়, পূর্ব্ব-প্রথামত তাঁহার কক্ষের দ্বারে লাঠি-গাছটি রাখিয়া, ভৈরবপ্রসাদ তাঁহার কক্ষে শূন্য হস্তে প্রবেশ করিয়াছিল। তৎপরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সমাপন করিয়া ভৈরবপ্রসাদ কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পেস্কার তথায় দণ্ডায়মান আছে। পেস্কারকে ভৈরবপ্রসাদ খাতির করিতেন; পেস্কারও যে তাঁহাকেও অল্প-স্বল্প খাতির করিত না এমন নহে। ইহাদের দুইজনের সাক্ষাৎ হওয়াতে, দুইজনে নানারূপ আলাপ করিয়া দুইজনকেই আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। ভৈরবপ্রসাদ মহা আপ্যায়িত হইয়া পেস্কারের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে একেবারে নীচের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন এবং বিদায় গ্রহণ করিয়া গাড়ী চালাইতে হুকুম দিলেন।

ভৈরব প্রসাদ, তাঁহার বাটিতে উপনীত হইয়া যখন গাড়ী হইতে নামিতে যাইবেন সেই সময় লাঠির কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি শূন্য হস্তে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া চালককে বলিলেন—"দেখ্ ভেইয়া, আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ীতে, তাঁর খাস-কামরার দরজায় আমার লাঠিটা ভুলে ফেলে এসেছি। তুমি এখনই গিয়ে আর্দ্দালী ভেইয়াকে আমার নাম ক'রে সব ব'লে লাঠিটা চেয়ে আনগে।" চালক বলিল—"আচ্ছা ভেইয়া আমি এখনই যাচ্চি।"

গাড়ীর চালককে উক্ত কথা বলিয়া ভৈরবপ্রসাদ অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া অযোধ্যা ও লছমীকে অন্বেষণ করিয়া পরিচারকদের নিকট শুনিলেন যে, 'তাহারা বাগানে বেড়াইতেছে।' ভৈরবপ্রসাদ অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া 'পিছনকার বাগানে' প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া সহসা অযোধ্যা ও লছমীর চুম্বন ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তৎপরে পূর্ব্ব-কথিত কথাগুলি বলিতে বলিতে তাহাদের ঠিক পশ্চাতে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অযোধ্যা ও লছমী অট্টালিকার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল কাজে কাজেই তাহারা ভৈরবপ্রসাদের আগমন জানিতে পারে নাই। তার উপর অদৃষ্ট দোষে আজ আবার তাঁহার অতি প্রিয় লাঠি গাছটিও তাঁহার হাতে ছিল না।

লছমী, পিতার হাতে লাঠিটি নাই দেখিয়া, লাঠির উপরে মনে মনে ভয়ানক চটিতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে, অন্য অন্য দিন বাবার হাতে লাঠিটা থেকে 'ঠক্-ঠক্' শব্দ ক'রে তাঁর আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দেয়, আর ঠিক আজকের দিনটাই কিনা লাঠিটা বাবার হাতে রইল না।'

অযোধ্যাও এখন এই লাঠিটির কথাই ভাবিতে ছিল বটে কিন্তু সে, লছমীর ভাবনার ঠিক বিপরীত কথা ভাবিতেছিল। ভৈরবপ্রসাদের হস্তে অস্ত্র লাঠিটি ছিলনা বলিয়া লছমী মনে, মনে লাঠিটির উপর মহা ক্রোধান্বিত হইতেছিল; অযোধ্যা কিন্তু, এইজন্য লাঠিটির উপর মহা সন্তুষ্ট হইতেছিল। অযোধ্যা ভাবিতেছিল যে, "ভাগ্য ভাল যে ভৈরব প্রসাদের হাতে আজ এখন লাঠিটি নেই তাই রক্ষে। নয়ত আজ এখন নিশ্চয়ই লাঠি গাছটি তার পিঠে সজোরে প'ড়ত। শুধু পড়া নয়—প'ড়ত আর প্রেমভরে তার কতক ওঠা, নাবা ক'রে সোহাগে একেবারে দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যেত। সঙ্গে, সঙ্গে তার অকৃত্রিম প্রেমের চিহ্ন-স্বরূপ, গোটা কতক ভালবাসার দাগ পিঠের ওপর চির-জীবনের মতন রেখে যেত।"

কয়জনেই কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইয়া রহিল। ক্ষণ পরে সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"হ্যাঁ হে অযোধ্যা, তোমায় তা আমি বিশেষ করে বলে দিয়েছিলুম যে, তোমরা দুজনে, 'ভবিষ্যতে দুজনের স্বামী, স্ত্রী হবে' এই কথা কেবল মাত্র মনে রেখে ভালবেসে যাবে আর বর্ত্তমানে, কার্যাতঃ ভাই, বোনের মতন ব্যবহার ক'রে যাবে? তা এই রকম ভাবে চুমো খেয়ে কি তোমরা ভাই, বোনের মতন ব্যবহার বজায় রাখছ? য়্যাঁ! 'ভাই, বোনেতেও চুমো খায়' এ কথা তোমরা বলতে পার বটে—তা, ভাই, বোনে কি ওই রকম ঘন, ঘন চুমো খায়—না—ও রকম জোরে জাপটে ধরে চুমো খায়? আমার পরম বন্ধু ও বিশেষ কল্যাণকামী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রাসাদ থেকে এখানে ফিরে এসে, তোমাদের খুঁজতে খুঁজতে এই জায়গায় এসে দেখি যে, তোমরা এমন

বিভোর হয়ে বসে আছ যে, আমার মতন এমন একটা জল-জ্যান্ত মর্দ্দ এসে তোমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে সেটা টের পেলে না। তারপর তোমরা চুমু খেলে, আমি তা দেখলুম কিন্তু কিছু বললুম না, কারণ ভাই, বোনেতে একবার চুমু খেতে পারে। তারপর আবার যখন তোমরা চুমু খাওয়া-খায়ি ক'রে ভাই, বোনের গণ্ডী অতিক্রম ক'রলে তখন আমি রাগে আত্মহারা হ'য়ে এগিয়ে এসে তোমাদের বাধা দিলুম। আমি তোমাদের এই রকম ব্যবহারের কারণ জানতে চাই—এখনই চাই। আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে উদ্দেশ্য ক'রে এ কথা বলছি না—আমি তোমাদের দু'জনের কাছ থেকেই এর কৈফিয়ৎ চাই।"

অযোধ্যা আর কি কৈফিয়ৎ দিবে—ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিতেছিল। সে গুঁই-গাঁই করিতে লাগিল, স্পষ্ট কথা কিছু কহিল না। লছমী কিন্তু পিতার কথা শেষ হইতেই কথা কহিয়া, তাহাদের দুইজনের কৈফিয়ৎ একাই দিল। লছমী এখন আর পূর্ব্বেকার মতন লজ্জাশীলা ও স্বল্পভাষিণী নাই। এই অল্পদিনের মধ্যেই তাহার পূর্ব্ব-স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন শিক্ষিতা ও সভ্যতালোক-প্রাপ্তা বিদুষী রমণী—সে কি জন্য ভয় করিয়া বা খাতির করিয়া কথা কহিবে? 'সকলেই সমান' এই শিক্ষা যখন সে পাইয়াছে ও পাইতেছে তখন তাহার এই পরিবর্ত্তনের জন্য কোনও দোষ তাহাকে দেওয়া যায় না। নাচিতে নামিয়া ঘোমটা টানিবার আবশ্যক কি?

লছমী তাড়াতাড়ি পিতাকে বলিল—"বাবা আমরাত কোন অন্যায় কাজ করিনি। আপনি আমাদের যে রকম ভাবে চ'লতে ব'লেছেন আমরা ঠিক সেই রকম ভাবেই চলচি। তবুও আপনি ঐ চুমো খাওয়ার

কথা ব'লে আমাদের ভৎর্সনা করলেন ব'লে, যদিও আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত তবুও আমরা দুঃখিত হলুম না এই ভেবে যে, আপনি সভ্যতার আলোক পেলেও ভাল রকমে শিক্ষিত হননি। দেখুন বাবা, এই কারণেই আপনি আমাদের পবিত্র-চুম্বনে দোষ দেখলেন। বাবা, আপনি নিজেকে সভ্য ব'লে পরিচিত করেন, আমাকে সভ্য ক'রতে শিক্ষিতা ক'রছেন অথচ এই চুম্বন দেখে আপনি ক্ষেপে উঠছেন. সভ্য সমাজে চুম্বন অতি পবিত্র জিনিস তাই সভ্য লোকেরা, যখন, তখন, যেখানে, সেখানে; যার, তার সামনে চুম্বন করে আমার কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তাহ'লে আপনি ইংরাজি নভেল পড়ুন কিংবা সভ্য-সমাজের গতিবিধি লক্ষ করুন তাহলেই আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। ছিঃ বাবা আপনি এত সভ্য হ'য়ে শেষে এই অসভ্যের মতন কথা ক'য়ে ফেললেন? সভ্য সমাজে যদি আপনার এ কথা শোনে তা'হলে আপনাকে সমাজ-চ্যুত ক'রে দেবে। আপনার বন্ধুবান্ধবরা আপনার সঙ্গে এক সঙ্গে ব'সবেনা আপনার চা আর মিষ্টান্নতে থুৎকার দেবে, আপনার সিগার সিগারেট পদাঘাত ক'রবে."

ভৈরবপ্রসাদ ব্যগ্র ভাবে বলিলেন "ও, এ কথা জানতুম না হ্যাঁ, সত্যি, সত্যি কি সাহেবরা যেখানে, সেখানে; যার তার সামনে; যখন, তখন চুমু খায়? হাঁ। ঠিক কথাই বটে; আমি নিজেইতো কতবার ইষ্টিসানে দেখেছি যে, সাহেবরা সকলের সামনেই সব চুমু খাওয়া-খাযি করচে। লক্ষ্মী আমি তোর বুড়ো বাপ Old affectionate father, আমায় মাপ কর্। আমার এই অজ্ঞাত বর্বরতা পাপের জন্যে আমার মাপ কর্। অযোধ্যা আজ থেকে তুমি খুব চুমু

খেও। চুমু যখন এত পবিত্র জিনিষ তখন তুমি যত চুমু খাবে তোমার তত পুণ্যি হবে। হ্যাঁ আর একটি কথা; অযোধ্যা, তুমি লছমীকে পড়াবার পর আজ থেকে আমায় একটু ক'রে পড়িও। আমি মনে, মনে গর্ব্ব ক'রতুম যে, আমার স্বজাতিদের মধ্যে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য আর শিক্ষিত, আর আমার চাল্ চলন্ ঠিক সাহেবদের মতন। এখন কিন্তু দেখছি আমি সম্পূর্ণরূপে সভ্য হতে পারিনি। অযোধ্যা আজ থেকে নিশ্চয়ই আমায় পড়িও।"

লছমী সান্ত্বনা-সূচক স্বরে বলিল—"বাবা, আপনি আর আত্মগ্লানি ক'রবেন না। এ বিষয়ে আপনার তত দোষ নেই। আমাদের স্বজাতি-দের মধ্যে আপনি শিক্ষিত, সভ্য, শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি আমাদের জাতের গৌরব। তবে, সকল বিষয় আপনার জানা না থাকতে পারে—কারণ, সভ্যতার স্রোত দিন, দিন বর্দ্ধিত হচ্চে; সভ্যতার নিয়ম প্রণালী প্রভৃতি দিন, দিন নতুন ভাবে আবিষ্কৃত হচ্চে।"

ভৈরব প্রসাদ ব্যস্তভাবে বলিলেন—"সেই জন্যেই তো আমি ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখতে চাই। আমি যা চলন-সই গোছের সভ্য আছি তার চেয়ে আরও বেশী সভ্য হ'তে চাই। আমি এতদিন মনে ক'রতুম যে, কেবল ঘর-দোর বিলাতী ফ্যাসানে সাজালে; চা, চুরুট খেলে; টেবিলে খেলে, দু'চারটে ইংরিজি বুলি আওড়ালে; মেয়েকে Free love (অবাধ প্রেম) ক'রতে শেখালে আর বেশী বয়েসে মেয়ের বিয়ে দিলে সভ্য হওয়া যায়। এখন দেখছি সভ্যতা-স্রোত বৃদ্ধি পাওয়াতে, আমাদের মতন সভ্য লোকেদের মধ্যে—যখন, তখন, যার, তার সামনে; যেখানে, সেখানে চুমু খাওয়ার পদ্ধতি দাঁড়িয়েছে। এর পরে সভ্যতা

স্রোত বাড়তে, বাড়তে যখন—'যার, তার সামনে ; যেখানে, সেখানে চুমু খাওয়ার পদ্ধতির' ওপর উন্নতি হ'য়ে—'যে যাকে পাবে সে তাকে চুমু খাবে' এই পদ্ধতিটা দাঁড়াবে তখন আমি মনের সাধে, 'যাকে, তাকে' যত পারব' তত' চুমু খাবো আর সেই পূণ্যে স্বশরীরে স্বর্গে চলে যাব। এখন চল, সব বাড়ীর ভেতর চল। অযোধ্যা, লছমীর পড়া শেষ হয়ে গেলেই, বেশ ভাল দেখে একখানি আধুনিক ইংরিজী নভেল নিয়ে আমার ঘরে এসে আমায় পড়াবে—বুঝলে ?"

উদ্যান হইতে সকলে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নগদ মূল্যে বিধান ক্রয় করিয়া শরৎচন্দ্র আনন্দিত মনে কামাইতে বসিল। কামাইতে বসিবার পূর্ব্বে সে একবার কেবল মনে, মনে বলিল যে—"বামুনে যখন বিধান দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই ভূতে আমার কিছু অনিষ্ট ক'রবে না বা আমার ওপর রাগ ক'রবে না।" শরৎচন্দ্র, কেন এই ভূতের কথা বলিল সে মজার রহস্য কিছু পরেই জানিতে পারিবেন।

শরৎচন্দ্রের আদেশ অনুসারে, নাপিতটি, তাহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ও দুই পার্শ্বদেশ ক্ষুর দিয়া কামাইয়া দিল কিন্তু মস্তকের উপরিভাগের চুল কাটিল না। কেবল, যে অবধি ক্ষুর দিয়া কামাইয়া দিল, তাহার উপরে এক অঙ্গুলী পরিমিত স্থান কাঁচি দিয়া অল্প, অল্প ছাঁটিয়া—কেশহীন স্থানে ও কেশযুক্ত স্থানে একটা সামঞ্জস্য করিয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিল।

শরৎচন্দ্রের চুল ছাঁটিবার ভঙ্গী দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় গম্ভীর ভাবে এবং ভাবুকের মত ভাবে গদ-গদ হইয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি দেখছি আপনার মস্তকের অর্দ্ধভাগ কামিয়ে ফেলেচেন? ওঃ আপনার তাহলে পিতৃভক্তি আছে। আপনি যখন মূল্য দিয়েছেন তখন আপনি অনায়াসে, আপনার মস্তকের তিল-পরিমিত স্থান না কামালে পারতেন। কিন্তু আপনার হৃদয়ে পিতৃভক্তি এত প্রবল যে, আপনি মূল্য দেওয়া সত্ত্বেও, পিতাকে একেবারে বঞ্চিত করলেন না—তাঁর খাতিরে অর্দ্ধেকটা

মাথা কামালেন। রীতিমত মূল্য দিয়ে সম্পূর্ণরূপে-না-কামাবার অধিকারী হ'য়েও যে আপনি স্বেচ্ছায়, পিতৃভক্তির যূপ-কাষ্ঠে আপনার অর্দ্ধেক চুল বলি দিলেন, এতো কলিকালে একটা দুর্লভ ব্যাপার। সহস্র পাঁটা বলি দিলে যে ফল লাভ হয়, আপনার এই চুল বলি দেওয়াতে তা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক ফল লাভ হয়েছে। ওঃ কি ত্যাগ-স্বীকার! উঃ কি স্বার্থ বিসর্জ্জন! ধন্য আপনি।" আমরাও বলি বাবুগো ধন্য আপনি, পুরোহিত মহাশয় আপনিও ধন্য।

ভৃত্য দীননাথ ওরফে দীনু, এতক্ষণ অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে সে আর নীরব থাকিতে পারিল না। পুরোহিত মহাশয়ের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—"তাহলে, বাবু আমাদের অর্দ্ধেক ফল পেয়েছেন?"

পুরোহিত মহাশয় সগর্ব্বে বলিলেন—"নিশ্চয়ই। শাস্ত্রের আদেশ মত সমস্ত মাথাটা কামালে যখন পু'রো ফল পাওয়া যায় তখন অর্দ্ধেকটা মাথা কামালে অর্দ্ধেক ফল পাওয়া যাবেনা? নিশ্চয়ই যা'বে। শাস্ত্রকাররা কি ঘুষখোর রে ব্যাটা মূর্খ?"

দীনু বলিল—"বাবু যখন আপনা হতেই অর্দ্ধেক ফল পেয়ে গেছেন তখন কোন্ আক্কেলে আপনি পুরো মূল্য নিচ্ছেন?"

পুরোহিত মহাশয় নিজের কথায় নিজে ঠকিয়া গিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন—"য়্যাঁ।" পুরোহিত মহাশয় মনে করিয়াছিলেন যে, ঐরূপ কথা বলিয়া বাবুর খোসামোদ করিলে, আরও কিছু অর্থলাভ হইতে পারে—এই জন্যই তিনি ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি তো আ- মোসাহেব শ্রেণীর পাকা লোক নহেন যে চারিদিক সামলাইয়া খোসা

কথা বলিতে পারিবেন—কাজেই এইরূপ বে-সামাল হইয়া গেলেন; ব্যাপার অন্যরূপ দাঁড়াইল।

পুরোহিত মহাশয় "হ্যাঁ" বলিয়া নীরব হইয়া গেলেন বটে কিন্তু তাহাতে নিস্তার পাইলেন না। দীনু শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল—"হ্যাঁ কি? দিন, দিন, অৰ্দ্ধেকটা টাকা ফেরৎ দিন। বাবু যখন নিজে হতেই অৰ্দ্ধেক ফল পেয়েচেন তখন পূর্ণ মূল্য নিলে আপনার প্রবঞ্চনা করার পাপ হবে। আপনার মতন পদ্মপুরাণাচার্য্য আর পাতালখণ্ডতীর্থ লোক কি জেনে শুনে গঙ্গার তীরে পাপ ক'রতে পারে? দিন,দিন, অর্দ্ধেকটা টাকা দিন।"

সে এই কথা বলিয়া পুরোহিত মহাশয়ের সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করিল; পুরোহিত মহাশয় এতক্ষণ ভাবিয়াও দীনুর এই যুক্তি খণ্ডন করিবার কোনওরূপ উপযুক্ত উত্তর ভাবিয়া না পাইয়া, দীনুর উপর মনে মনে মহা ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি মনে, মনে ভাবিতে লাগিলেন যে—যদি তাঁহার দেহে শক্তি থাকিত এবং সেই সঙ্গে তাঁহার ব্যাঘ্রের ন্যায় দীর্ঘ নখর থাকিত তাহা হইলে তিনি এই দণ্ডে, ঐ পাষণ্ড, বদমাইসাগু দীনে ব্যাটার ঘাড়, দুই হাতে মটকাইয়া দিয়া, তাহার উষ্ণ-রক্ত আকণ্ঠ পরিমাণে পান করিতেন। যাহা হউক, যখন সে উপায় নাই তখন অগত্যা তাঁহাকে এ বিষয়ে নিরস্ত থাকিতে হইল। তিনি অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ওরে ব্যাটা মূর্খ, ব্রাহ্মণকে একবার দান ক'রলে তা আর ফিরিয়ে নিতে নেই। তা ছাড়া, বাবুর খেয়েই তো আমরা মানুষ। আমরা বাবুর আশ্রিত লোক—আমরা না হয় দু'টাকা বেশীই নিলুম। ঐ বাবুর কামান হয়ে গেছে—যা, যা; ।আদী করা রেখে, এখন বাবুকে চান করিয়ে দিগে যা।"

সঙ্গে

ক্ষৌর-কার্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার সমাধা হইয়া যাইবার পর শরৎচন্দ্র উঠিয়া আসিল এবং দীনুকে বলিল—"বাড়ী থেকে আসবার সময় তোকে যে সব জিনিস আনতে বলেছিলুম তা এনেচিস তো ?"

দীনু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ সবই এনেছি। আপনি ততক্ষণ চান ক'রবেন চলুন। আমি এগিয়ে এগিয়ে যাচ্চি, আপনি আমার পিছু পিছু নেমে আসুন ; কোনও ভয় নেই—বেশ বাঁধান ঘাট—জলের ভেতরে অনেক দূর অবধি সিঁড়ি আছে।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"আসবার সময়—গাড়ীর চালে চড়িয়ে তোকে যে দু'ঘড়া জল আর তোয়ালে, সাবান আনতে বলেছিলুম সেগুলো চট্ ক'রে গাড়ী থেকে আগে এইখানে নিয়ে আয়।"

দীনু ঘাট হইতে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গিয়া রাজপথে দণ্ডায়মান গাড়ী হইতে তোয়ালে, সাবান ও দুইটি শূন্য ঘড়া লইয়া পুনরায় শরতের নিকট প্রত্যাগমন করিল।

শরৎচন্দ্র তাহার হস্তস্থিত স্বর্ণখচিত-রৌপ্যময়-সাবানের বাক্স হইতে সাবানখানি তুলিয়া লইয়া তাহাকে বলিল—"আমি এই খানটায় বসছি, তুই আগে আমার মাথায় এক ঘড়া জলের খানিকটা ঢেলে দে, তারপরে আমার সাবান মাথা হ'য়ে গেলে বাকী জলটা ঢেলে দিবি—বুঝলি ? নে, ঢাল—ঢাল—"

মহা বিস্মিত হইয়া দীনু বলিল—"ঘড়া থেকে জল ঢেলে দোব কি ক'রে! আমি তো শুধু দু'টো খালি ঘড়া এনেছি।"

শরৎচন্দ্র বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিল—"সে কি রে ব্যাটা খালি ঘড়া এনেচিস কি বলে। এখানে আসবার জন্যে বাড়ী থেকে যখন গাড়ীতে

উঠি, তখন তোকে না বলেছিলুম যে, দুটো ঘড়া ক'রে কলের জল নিয়ে গাড়ীর চালে তুলে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে চল্—হ্যাঁ ?"

দীনু বলিল—"আপনি ঘড়া দুটো নিতে বলেছিলেন বটে—তা আমি মনে করলুম যে, 'গঙ্গার ঘাট থেকে বাড়ী ফেরবার সময় দু'ঘড়া গঙ্গা জল আনতে হবে ব'লে আপনি ঘড়া দু'টো নিতে বলেছেন'—তাই আমি খালি ঘড়া দুটো এনেছি। যাচ্চি গঙ্গায়, সেখানে আবার জল নিয়ে যাব কি ক'রতে।' নিন, চলুন,—চান করবেন চলুন—বেলা অনেক বেড়ে গেল।"

দীনুর কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্র রাগিল, মহা রাগিল। বেশী রাগ হইলে লোকে অন্ধ হইয়া যায় শুনিয়াছি,আজ সেটা প্রত্যক্ষ দেখা গেল। বিশ্বাস হইতেছে না? 'ক্রোধে অন্ধ হইয়া যাওয়া' কথাটা কবির কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন ? আচ্ছা যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে শরৎচন্দ্র চোখে দেখিতে পাইতেছে না কেন ? দীনু, শরতের চাকর ; দীনু, তাহার পদসেবা করে, তাহার জুতা ঝাড়িয়া দেয়, তাহার সকল রকম পরিচর্য্যা করে—সে কিন্তু ক্রোধে অন্ধ হইয়া দীনুকে তাহার চাকর বলিয়া চিনিতে পারিল না। সে দীনুকে, তাহার শ্বশুর, শ্যালক, পুত্র প্রভৃতি মনে করিয়া বিষম ভ্রম করিতে লাগিল এবং "ব্যাটা," "শালা," প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর অনেকগুলি মধুর বাক্য দীনুর প্রতি প্রয়োগ করিয়া, সে কখনও দীনুর পিতা, কখনও জামাতা, কখনও ভগ্নিপতি, কখনও বংশের আদি-পুরুষ হইতে লাগিল ও নানারূপ শোণিত-সম্বন্ধ-যুক্ত সম্পর্ক পাতাইতে লাগিল।

দীনু চাকর ও নীচ-জাতীয় ব্যক্তি, তবুও তাহার সহিত

শোণিত-সম্বন্ধ-যুক্ত সম্পর্ক পাতাইবার নিমিত্ত শরৎচন্দ্র ভয়ানক জিদ ধরিয়া বসিল এবং দীনুর নিকট বারংবার সেই প্রস্তাব করিতে লাগিল।

শরৎচন্দ্র ধনী, দীনু দরিদ্র; কিন্তু তবুও—অতি দরিদ্র হইয়াও সে কোনও মতে ধনী শরৎচন্দ্রের শ্বশুর অথবা শ্যালক হইতে চাহিল না। এবং অত বড় ধনী ও মানী লোকের শ্বশুর কিংবা শ্যালক হইতে পাইয়াও সে তিলমাত্রও গৌরব বোধ করিল না। সে, এই প্রস্তাবে একেবারে অসম্মত তো হইলই, অধিকন্তু ধীর ভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত শরৎকে বলিল—"বাবু আপনি ভদ্দর লোক, বড় লোক, তার ওপর আবার কলেজে প'ড়েছেন কিন্তু আপনি,আমায় শালাও ব'লছেন আবার ব্যাটাও ব'লছেন। যা বলবেন একটা বলুন। আমরা গরীব, পেটের দায়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে যখন গতর খাটাতে এসেছি তখন সব মাথা পেতে নোব। শালা ব'লবেন তো শালাই বলুন. ব্যাটা ব'লবেন না। ছেলে কি কখনও শালা হয়? ছেলের বোনকে কি কখনও বিয়ে করা যায়? আমাদের গরী-বের ঘরে তো যায় না।"

দীনুর এই সকল কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্র একটু নরম হইয়া গেল। তাহার রাগটাও কমিয়া গেল—তাহার দৃষ্টি-শক্তিও ফিরিয়া আসিল—সে চক্ষে বেশ্ স্পষ্টই দেখিতে পাইতে লাগিল। চশমার পেবল্-প্রস্তরে যে সকল উপাদান ও গুণ বর্ত্তমান আছে, দীনুর উপরোক্ত কথাগুলিতে সেই সকল উপাদান ও গুণ বর্ত্তমান আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই বটে কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে, দীনুর কথাগুলিতে নিশ্চয়ই পেবল্-প্রস্তরের গুণ বর্ত্তমান—তবে তাহা কত শক্তি ধারণ করে. মাইনস জিরো কি মাইনস ফাইভ (-0 কি-5) সে বিষয়- "দে মল্লিক"

কিংবা "লরেন্স মেও'র" দোকানে যাইয়া পরীক্ষা করাইলেই জানিতে পারা যাইবে।

যাহা হউক, দীনুকে এইবার ঠিক চিনিতে পারিয়া শরৎ বলিল—"ওরে গালাগাল কি তোকে দিই রে—গালাগাল দি তোর আক্কেলকে। তুই কি রকম বে-আক্কেল লোক বল দেখি! এই যে তুই কলের জল নিয়ে এলিনি, আমি এখন চান করি কিসে বল দেখি?"

দীনু মহা বিস্মিত হইয়া বলিল—"সে কি বাবু—চান ক'রবেন কিসে কি? মা গঙ্গার সামনে এসে চান করবার ভাবনা?"

শরৎ বিরক্তভরে বলিল—"গঙ্গায় যদি চানই ক'রব তাহলে তোকে ঐ ঘড়া দু'টো করে কলের জল আনতে ব'লব কেন?

দীনু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া 'ছাড়া-ছাড়া' কথায় বলিল—"গঙ্গায় চান করবেন না! আজকের দিন গঙ্গা-চান না ক'রলে কখনও চলে কি?"

শরৎ বলিল—"তা চলুক আর না চলুক, আমার তাতে ব'য়ে গেল। আমি কিছুতেই, ময়লা আর রোগের-আড্ডা এই গঙ্গাজলে চান ক'রতে পারবনা।"

এই কথা শুনিয়া দীনুর মন হইতে বিস্ময়, ভাব একেবারে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সে দুঃখিত হইল—মহা দুঃখিত হইল। দুঃখের প্রাবল্যে সে ক্ষুব্ধ ও করুণ স্বরে অথচ ঈষৎ চিৎকার করিয়া বলিল—"বাবু-বাবু আজকের দিনটার জন্যে আপনার ওসব পাপ কথা বন্ধ করুন। কর্ত্তাবাবু জন্মের মতন গেছেন, আর তো ফিরবেন না—তাঁর সুখের জন্যে, তাঁর তৃপ্তির জন্যে—তাঁর মুখ মনে ক'রে আপনি আর দু'তিনটে দিন যথেচ্ছাচার ক'রবেন না। এর পরে আপনাকে কেউ আর ব'লতে

আসবে না, আর আপনিও এমন দিন আর পাবেন না। সারা জীবনটার মধ্যে আজকের এই দিন আর কখনও ফিরে আসবে না। এর পরে অনেক রকমের অনেক দিন পাবেন কিন্তু আজকের এই দিন আর কখনও পাবেন না বাবু আর কখনও পাবেন না। এর পরে 'এই দিনের' জন্যে আপনাকে অনুতাপ ক'রতে হবে—'এই দিন' হেলায় হারিয়েছেন ব'লে আপনাকে অনেক কাঁদতে হবে। বাবু, আপনাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি; আপনার চেয়ে আমি ঢের বুড়ো; আমি দুনিয়ার অনেক ব্যাপার দেখেছি; আমার এই সামান্য কথাগুলো শুনুন বাবু শুনুন। লোকের বাপ, মা একবারই মরে; তাঁদের মরবার ঠিক পরের কাজগুলো লোককে সমস্ত জীবনের মধ্যে একবার মাত্রই ক'রতে হয়। অন্য কাজ যেমন সংশোধন ক'রে নেওয়া যায় এ কাজ আর তা করা যায়না। কাজে-কাজেই—এরপরে আপনার যত যথেচ্ছাচার করবার ইচ্ছে হয় ক'রবেন কিন্তু এখন এই ভেবে যে—'যখন সারা জীবনের মধ্যে এ দিন আর ফিরে পাব না, যখন এর পরে ভুল ধ'রতে পারলেও সে ভুলের আর সংশোধন ক'রতে পারব'না তখন এ রকম ক্ষেত্রে শাস্ত্রের আদেশ গুলো মেনে যাই; এতে আমার কোনও ক্ষতি হবে না, কোনও অপকার হবে না'—এই ভেবে, বাবু, এই কথাগুলো ভেবে আপনি 'নিয়মগুলো' সব মেনে চলুন।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"ওরে ব্যাটা, আমি কি কিছু জানিনা মনে করিস? তাই জন্যে আমায় নিয়ম মেনে চ'লতে বলচিস? আমি কি নিয়ম মেনে চলচিনা? যদিও এসব নিয়ম মেনে চলাকে আমি কুসংস্কারের কাজ বলে জানি তবুও আমি একটা কারণে, বিশেষ একটা প্যাঁচে পড়ে আমার

বিবেকের বিরুদ্ধবাদী হয়ে এই সব নিয়ম মেনে চলচি। আমি যদি নিয়ম মেনে না চলতুম তাহলে কি আর পুরুত ঠাকুরকে মূল্য দিয়ে ব্যবস্থা কিনতুম? না—এই গঙ্গার ঘাটে এসে তোর সঙ্গে মিছে বকা-ব'কি করতুম? আমি এতক্ষণ তাহলে শোফায় শুয়ে সিগারেট ফুঁকতুম। তবে যে গুলো নিয়ম নয় সে গুলোও মানতে ব'ললে আমি শুনব কেন? ওরে ব্যাটা গঙ্গার ভেতর ডুবে চান ক'রলে যে ফল হয়, 'গঙ্গা—গঙ্গা' ব'লে নর্দ্দমার জলে খুব দূরে থেকে, চান ক'রলেও ঠিক সেই ফল হয়—তা আমি তো গঙ্গার ধারে বসে রয়েছি। বাবা তো শাস্ত্র মেনে চ'লত কিন্তু, মা যখন মধ্যে মধ্যে গঙ্গা-চান করবার জন্যে বাবাকে অনুরোধ উপরোধ ক'রত তখন তো বাবা কিছুতেই মাকে গঙ্গা-চান কর'তে পাঠাত না। বাবা তো স্পষ্টই মাকে ব'লত যে—'গঙ্গার ভেতর নেমে চান ক'রলে যা ফল হয়, বাড়ীতে থেকে 'গঙ্গা-গঙ্গা' ব'লে নর্দ্দমার জলে চান ক'রলেও সেই ফল হয়—মন চাঙ্গা তো কটোরামে গঙ্গা।' শুনলি তো বাবা কি বলতেন? মন যদি চাঙ্গা হয় তাহলে একটা ছোট খুরির ভেতরও গঙ্গা পাওয়া যায়—তা ও জুটো তো বড় কলসী। একই ফল যখন পাওয়া যাবে তখন পরিস্কার, খাঁটি জলে চান না ক'রে, ঐ ময়লা, কাদাগোলা আর রোগের-আড্ডা জলে চান ক'রব কেন?"

দীনু বলিল—"বাবু, আপনার মন তো সে রকম চাঙ্গা নয়। তা যদি হোত তাহলে আপনি মা গঙ্গার জলকে কখনও ময়লা, রোগের আড্ডা বলতেন না। ওসব কথা যেতে দিন। দোহাই বাবু, সাত দোহাই আপনার, কর্ত্তাবাবুর মুখ চেয়ে আপনি আজ সব তর্ক ছেড়ে দিয়ে গঙ্গা-চানটা সেরে ফেলুন। এতে আপনার কোনও ক্ষতি হবে না অথচ

এ কটা বিশেষ নিয়ম রক্ষে হবে। কর্ত্তাবাবু যে আপনাকে বড় ভাল-বাসতেন, বড় যত্ন ক'রতেন, আপনার সুখের জন্যে তিনি নিজে কত কষ্ট করতেন—আপনি এই সামান্য একমাসে সে সব কি ক'রে ভুলে গেলেন বাবু? আমি চাকর—তাঁর আপনার-জন নই—পর; আমি কিন্তু তাঁর মুখখানি আর তাঁর দয়ার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।" এই কথা গুলি বলিতে, বলিতে দীনু কাঁদিয়া ফেলিল।

শরৎচন্দ্র কিন্তু দীনুর ক্রন্দন দেখিয়া বিচলিত হইল না। অশিক্ষিত ও ছোটলোকে কাঁদে, কাপুরুষে কাঁদে। সে শিক্ষিত, ভদ্র; তার উপর সে তো আর কাপুরুষ নয় যে কাঁদিবে কিংবা কান্না দেখিয়া বিচলিত হইবে। তাহার মনের জোর আছে (অবশ্য এই সবের বেলায়)। তাই সে বিরক্ত হইয়া বলিল—"তুই থাম্, থাম্—তোকে আর ওস্তাদী ক'রতে হবেনা। নেহাৎ ছেলেবেলা থেকে আমায় মানুষ করিচিস তাই—যখন, তখন ওস্তাদী ক'রে যা, তা বলিস তবুও—কিছু বলিনা। কিন্তু তোর দেখছি ক্রমে বড় বাড়্ বেড়ে যাচ্চে। তুই কিছু কি জানিস্ যে, সব কথায় মিছে ওস্তাদী করিস? গঙ্গাজলে চান ক'রে আমি, আমার সব নষ্ট করি আর কি? বাড়ীতে যে মাষ্টার আমায় পড়ায় সে বিলেত-ফেরতা তা জানিস তো। সেই মাষ্টারের কাছে আমি অনেকবার শুনেছি যে, গঙ্গা জলে কোনও মতে চান করা উচিত নয়; গঙ্গাজল অতি নোংরা আর গঙ্গা জলে চান করলে টাইফয়েড হয়।" এ ছাড়া, আমি মেডিকেল রিপোর্টে পড়েছি যে—'এই টাইফয়েড রোগটা একই স্থানবাসী হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদেরই বেশী হয় এর কারণ হিন্দুরা গঙ্গাস্নান করে আর গঙ্গাজল খায়।' বুঝলি এখন যে, গঙ্গার জলে টাইফয়েড

রোগের বীজাণু আছে। আমি কি আর সাধ ক'রে একটা দিন মাত্রও গঙ্গা চান ক'রতে চাইচি না। ও জলে চান করলেই আমার টাইফয়েড হবে। নাঃ বাবা, কাজ নেই ওতে চান ক'রে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। যা, তুই কোথাও থেকে দু'ঘড়া কলের জল যোগাড় করে নিয়ে আয়। এর জন্যে যদি দু-পাঁচ টাকা দাম দিতে হয় তাও দিয়ে আনবি। যা, যা, দেরী করিসনি।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একটি বৃদ্ধ লোক গঙ্গা-স্নান করিতে আসিয়া—শরৎচন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে বসিয়া—অঙ্গে তৈল-মর্দ্দন করিতেছিলেন। বৃদ্ধ লোকটির বয়ঃক্রম প্রায় স'ত্তর বৎসর। তিনি, তাঁহার বয়সের অনুপাতে বেশ সবল ও সুস্থ-কায়। তিনি প্রতিদিন নিয়মিত রূপে গঙ্গা স্নান করেন।

আগে যেমন নিয়মিত রূপে গঙ্গা-স্নানার্থীর সংখ্যা খুব বেশী মাত্রায় ছিল এখন ততটা বেশী না থাকিলেও এখনও এমন কতকগুলি লোক আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, নিয়মিত রূপে গঙ্গাস্নান করিলে শরীর খুব ভাল থাকে এবং গঙ্গার মাটি নিয়মিত রূপে মাখিয়া স্নান করিলে অনেক প্রকার দুরারোগ্য রোগ একেবারে সারিয়া যায় এবং নীরোগীর সাধারণ-স্বাস্থ খুব ভাল থাকে। এই জন্য এখনও অনেকগুলি লোক নিয়মিত রূপে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন এবং যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা গঙ্গার মাটি মাখিয়া কর্দ্দম-স্নান করেন।

গঙ্গার প্রায় প্রত্যেক ঘাটেই প্রতিদিনই, এইরূপ নিয়মিত গঙ্গাস্নানার্থীর দল সমবেত হন। ঘাটে যে উড়িয়া ব্রাহ্মণটি থাকে—তাহার নিকট এই সকল স্নানার্থীর টিকা, তামাক, হুঁকা প্রভৃতি গচ্ছিত থাকে। ইঁহারা—দড়ি দিয়া বাঁধা একটি ছোট তৈলপূর্ণ শিশি হাতে ঝুলাইয়া লইয়া এবং বগল-দাবায় গামছা, কাপড় লইয়া প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে—নিজ, নিজ সুবিধামত নির্দ্দিষ্ট ঘাটে আসিয়া সমবেত হন এবং সর্ব্বাগ্রে

এক ছিলিম তামাক খাইয়া তৎপরে অঙ্গে তৈলাদি মর্দ্দনের পর আবার এক ছিলিম করিয়া তামাকু সেবন করিবার পর স্নান করিতে নামেন।

আমাদের কথিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া প্রথমে এক ছিলিম তামাকু সেবন করিয়া পথ-শ্রম অপনোদন করিতেন। তৎপরে প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈল-মর্দ্দন করিতেন। তৈল-মর্দ্দনের পর আবার আর এক ছিলিম তামাক খাইয়া তবে স্নান করিতেন।

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তৈল মর্দ্দন করিতে, করিতে শরতের সমস্ত কথাই অতীব কৌতূহল-পূর্ণ চিত্তে শুনিতেছিলেন। তিনি এতক্ষণ কৌতূহলী হইয়া শরৎচন্দ্র ঘটিত সমস্ত ব্যাপার কেবল দেখিতেছিলেন। এক্ষণে শ্রাদ্ধ নর্দ্দমা অবধি গড়ায় দেখিয়া তিনি আর কেবল দর্শকের স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিনীত ভাবে শরৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মশাই মাপ ক'রবেন—একটা কথা বলি, অনুগ্রহ ক'রে শুনুন। আপনি যদি রোগে আক্রান্ত হতে না চান তাহলে আপনার গঙ্গা স্নানই করা উচিত।"

শরৎচন্দ্র একজন অপরিচিত কর্ত্তৃক সহসা এইরূপ ভাবে সম্বোধিত হওয়ায় অতীব বিস্মিত হইয়া, বৃদ্ধের প্রতি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আপনার কথার অর্থ কিছু বুঝতে পারলুম না।

বৃদ্ধ বলিলেন—"বুঝতে পারলেন না? আচ্ছা, আমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্চি। আপনি কিন্তু আগে আমার দু'একটি কথার উত্তর দিন। আচ্ছা—মানুষের অশৌচের সময়, তার কলেরা হওয়ার বেশী সম্ভাবনা না—টাইফয়েড হওয়ার বেশী সম্ভাবনা?"

শরৎ বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিরক্তিভরে বলিল—"তা আমি ব'লতে পারি না। আর সে সব কথায়—"

শরতের কথা শেষ হইতে না দিয়াই বৃদ্ধ চট্ করিয়া বলিলেন—"সে কি মশাই, আপনি ব'লতে পারেন না কি বলুন? আপনার কথাবার্ত্তা শুনে, আপনি যে একটা 'পণ্ডিত-লোক' সে কথাটা বেশ বোঝা যাচ্চে। আপনি, আপনার অদ্ভুৎ বিনয়-গুণ দেখাবার জন্যে আমার কাছে আত্ম-গোপন ক'রচেন। তা দেখুন, আপনার গৃহ-শিক্ষক বিলাত-ফেরৎ এই কথা শুনে এবং গঙ্গা-স্নানে আপনার অনিচ্ছা দেখে, আপনি যে একজন 'বিজ্ঞান-জানিত-লোক' এটা আমি বেশ বুঝতে পেরেচি। তা, আপনি যখন 'বিজ্ঞান-জানিত-লোক' তখন আপনি নিশ্চয়ই খুব সাবধানে থাকেন এবং বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে জীবন যাপন করেন। সাবধানে থাকলে; বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে আগে থাকতে Precaution নিলে কোনও রোগই—বেশীর ভাগ—কাছে ঘেঁসতে পারেনা।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"নিশ্চয়ই পারেনা। বেশীর ভাগ কেন—একে-বারেই কাছে ঘেঁসতে পারেনা। এইজন্যই তো আমি গঙ্গাজলে চান ক'রতে চাইচি না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"বেশ, বেশ। এইবার আমার কথাটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। দেখুন—আপনি 'বিজ্ঞান-জানিত-লোক' এবং খুব সাবধানে জীবন যাপন করেন, সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার টাইফয়েডে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মশাই হাজার সাবধানী হ'লে আপনার এই অশৌচের সময় আপনি নিশ্চয়ই সব বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চ'লতে পারেন নি। আপনি যখন 'বিজ্ঞান-জানিত-লোক' হ'য়েও কাচা

গলায় দিয়েছেন, শুধু পা ক'রেছেন, গঙ্গার ধারে কামাতে এসেছেন তখন, আপনার নিজের ইচ্ছে অবশ্য না থাকলেও—বাড়ীর মেয়েদের অনুরোধে আর কান্নাকাটিতে, গত একমাস ধ'রে আহারাদি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক অনিয়ম যে আপনি ক'রেচেন একথা আমি বেশ বুঝতে পারচি। তাহলেই এক্ষেত্রে আপনার কলেরা হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী, সেটা বোধ হয় আপনার মতন 'বিজ্ঞান-জানিত-লোক'কে আর ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌তে হবেনা। আহারাদির জিনিস আর সময় সম্বন্ধে অনিয়ম হলেই কলেরা হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।"

শরৎচন্দ্র মহা আগ্রহের সহিত বলিল—"মশাই ঠিক ব'লেছেন, ঠিক ব'লেছেন। গত একমাস ধ'রে আমি প্রতিদিন হবিষ্য করিনি বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে—আজ দশপিণ্ডি, কাল অ'মুক, পরশু তোমুক —ঐ রকম এক একটা ফ্যাচাঙের জন্যে আমায় সেই আলোচাল, কাঁচকলা, কচু, ঘেঁচু দিয়ে তৈরী, সেই আধ্-কাঁচা, ভীষণ হবিষ্য খেতে হ'য়েছে। আর আহারাদির জিনিস আর সময় সম্বন্ধে অনিয়ম তো প্রায়ই হ'য়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"অন্ততঃ বিজ্ঞানের খাতিরে হওয়াত' উচিত। দেখুন, এই কারণেই—অশৌচের সময় গঙ্গা-স্নানের আর গঙ্গাজল পানের ব্যবস্থা আছে। যদি বলেন কি কারণ? তাহ'লে বলি শুনুন! আপনি যদি গঙ্গাজলে স্নান আর গঙ্গাজল পান করেন তাহ'লে আপনার —ঐ যে কলেরা হওয়ার আশঙ্কা—সেটা কেটে যাবে।"

শরৎ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল,—"কি পাগলের মত

কথা বলেন মশাই। আপনার গঙ্গার আর সে শক্তি নেই; আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন যে, এটা কলিকাল।"

বৃদ্ধ বিনীতভাবে বলিলেন,—"না মশাই, এটা যে কলিকাল তা ভুলিনি। আর আপনাকে যে কথাটা বললুম সেটা কলিকালেরই লোকের কথা। আপনারা যাদের মাথায় তুলে নাচেন তাদেরই কথা। আমাদের পূর্ব্বকালের লোকেরা যে কথা বলে গেছেন সে সব কথা ব'ল্‌ছি না—ভয় নেই।"

শরৎ বলিল—"জগতের, একালের সভ্য ও শিক্ষিত লোকদের তো মাথা খারাপ হয়নি যে তারা আপনাদের সেকালের লোকদের মতন ব'ল্‌বে যে, 'গঙ্গায় চান ক'রলে পুণ্যি হয়, সর্ব্বরোগ নাশ হয়।' যেতে দিন না ওসব কথা। আপনি কুসংস্কারাপন্ন লোক ব'সে র'য়েছেন, সাব্যস্ত ক'রেছেন যে আমি—বাপ ম'রে যেতে 'ঘাট-কামান' ক'র্ত্তে এসে গঙ্গাস্নান ক'র্ত্তে রাজী হ'চ্চি না—তাই আমায়, দু' একটা শাস্ত্রের বচন ঝেড়ে গঙ্গা-চানে রাজী ক'রিয়ে, ফাঁকতালে একটু পুণ্য-সঞ্চয় ক'রে নেবেন এই কথা মনে ভেবেছেন তো? তা আমি অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"মশাই; আমার ঘাড়ের ওপর তো দুটো মাথা নেই যে, আমি আপনার মতন 'বিজ্ঞান-জানিত-লোককে' সেই সব সেকেলে শাস্ত্র-কথা বোঝাতে যাবো। আমি 'যা-তা' একটা বোঝাতে গেলে আপনি যদি বিজ্ঞান বলে আমায় খানিকটা মাটীতে পরিণত ক'রে ফেলেন কিংবা আমায় যদি একগ্লাস জলে পরিণত ক'রে ফেলে 'ঢক্‌-ঢক্‌' ক'রে খেয়ে ফেলেন তাহ'লে আমার দশাটা কি হয় সেটা আমি ভেবে

দেখেছি। আমি আপনাকে যা বলছি, তা আপনার নিজেরই ভালর জন্তে বলছি। শুনুন—এই বিংশ শতাব্দীরই কতকগুলি জ্ঞানী ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অদ্ভুত পারদর্শী সাহেব ডাক্তার, অনেক পরীক্ষার পর ব'লেছেন যে, গঙ্গার জলে কলেরা রোগের জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাঁরা এক পাত্র কলের জলে আর এক পাত্র গঙ্গার জলে কলেরা রোগের কতকগুলি জীবাণু সম-পরিমাণে ছেড়ে দেন। তারপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরে তাঁরা সেই পাত্র দুইটি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে, গঙ্গার জলে কলেরার যে জীবাণুগুলো ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছিল সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে; আর কলের জলে কলেরার যে জীবাণুগুলো ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছিল সেগুলো অধিক সংখ্যায় বেড়ে উঠেছে।"

শরৎচন্দ্র ব্যগ্রভাবে বলিল,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। কি একটা Medical Journal'এ ঐ রকম Report বেরিয়েছিল বটে। তাঁরা আরও কি কি——"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"হাঁ, তাঁরা আরও বলেছিলেন যে,'কলেরা-মহামারী ক্ষুদ্র ও ঘন, ঘন অবস্থিত বাসগৃহ-বিশিষ্ট স্থানে শীঘ্র আত্ম-প্রকাশ করে এবং অতি শীঘ্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কাশীর মতন ক্ষুদ্র সহরে লোকসংখ্যা এত অধিক এবং কাশীবাসীরা এত ঘন ঘন ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে বাস করে যে, সেখানে সর্ব্বদাই কলেরা আত্ম-প্রকাশ ক'রত এবং এত শীঘ্র ও এরূপভাবে বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়ত যে, কাশীবাসীরা অতি অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হ'য়ে যেত; এ পৃথিবীতে তাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকত না। কিন্তু কাশী-বাসীরা নিয়মিতরূপে গঙ্গাজল পান গঙ্গাস্নান করে ব'লে সেখানে যেরূপ-

ভাবে কলেরা হওয়া সম্ভব সেরূপভাবে হ'তে পারে না এবং কখনও কখনও কলেরা আত্ম-প্রকাশ ক'রলেও তাদের সেরকম ভাবে ধ্বংস ক'রতে পারে না; আর অতি অল্পদিনের মধ্যে কলেরাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।' মশাই! এই তো হ'ল আধুনিক শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের কথা। আমি এই কারণেই আপনাকে বলছিলুম যে, যদি রোগাক্রান্ত হ'তে না চান তাহ'লে এখনই গঙ্গাস্নান ক'রুন। শুধু আজকের দিনটা নয়—আজকের দিন, কালকে শ্রাদ্ধের দিন আর পরশু নিয়ম-ভঙ্গের দিন—এই তিনটে দিনই আপনি গঙ্গাস্নান ক'রুন আর গঙ্গাজল পান করুন। আপনি হাজার বিধান ক্রয় করুন তবুও এই তিনটে দিন আপনাকে আহারাদি সম্বন্ধে অনেক অনিয়ম ক'রতেই হবে; কেননা আপনি এ কার্য্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। এক যদি, একার্য্য একেবারে পরিত্যাগ ক'রতেন তাহ'লে না হয় যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারতেন। মশাই! আপনি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের বাক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের বাক্য হচ্চে 'Prevention is better than cure' অতএব Prevention হিসাবে আপনি এই তিনটে দিন গঙ্গাজল পান করুন আর গঙ্গাস্নান করুন। বুঝলেন?"

শরৎচন্দ্র সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল,—"মশাই আপনি ঠিক ব'লেছেন। আপনার কথা শুনে আমার পেটটার ভেতর কি রকম 'গুড়্-গুড়্' ক'রছে; গা'টাও কি রকম ব'মি ব'মি ক'রছে। বাস্তবিক মশাই, আমি এই Reportএর ব্যাপারটা একদম ভুলে গেছলুম—নইলে আমি গত একমাস ধ'রে রোজই গঙ্গাজল খেতুম। আমার মা বলেছিল যে—'ওরে শরৎ অশৌচের সময় গঙ্গাজল ভিন্ন

অন্য কোনও জল খেতে নেই'—মায়ের ঐ কথা শুনে আমি খিঁচিয়ে উঠেছিলুম। এ ব্যাপারটা মনে থাকলে কোন উজবুক খিঁচোতো? সত্যিইত' Strem Water (স্রোতের জল), এতে ওরকম একটা বিশেষগুণ থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়। আচ্ছা, তাহ'লে চান ক'রে ফেলা যাক?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"হাঁ, যান চান ক'রে ফেলুন গে—'জয় মা গঙ্গা' ব'লে ক'সে গোটা কতক ডুব দিন গে।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একটু মৃদু হাসিলেন এবং চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, কৌতূহল-পরবশ হইয়া অন্যান্য যে দুই চারিটি ভদ্রলোক নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহারাও মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন।"

"মহাশয়ের সঙ্গে যখন আলাপ হ'ল তখন দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে এক আধবার যাবেন।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধকে নিজের নাম ঠিকানা জানাইয়া শরৎচন্দ্র স্নান করিতে গমন করিল। সে দীনু চাকরের হাত ধরিয়া অতি সন্তর্পণে গঙ্গার জলে নামিল। কোমর অবধি জলে নামিয়া সে আর অগ্রসর হইল না; সেই স্থানে দাঁড়াইয়া নাকে ও কাণে অঙ্গুলী দিয়া তিন চারিটি ডুব দিল।

শরৎচন্দ্র অত অল্পজলে দাঁড়াইয়া ডুব দিতেছিল বলিয়া, ডুব দিবার সময় তাহার পৃষ্ঠদেশ জলের উপরে থাকিতেছিল। ইহা দেখিয়া দীনু বলিল,—"বাবু আর একটু নেমে চান করুন, আপনার পিঠে যে একদম জল লাগছে না। ও কি রকম চান হচ্চে বাবু!"

শরৎ বলিল,—"পিঠে জল নাই লাগুকগে, আমি আর নামছি না —সাঁতার জানিনা, শেষে ডুবে ম'রব নাকি?" মাত্র দুই তিনটি

ডুব দিবার পরই শরৎচন্দ্র উপরোক্ত কথাগুলি দীনুকে বলিয়াছে, এমন সময় সামান্য দূর দিয়া একখানি ষ্টিমার চলিয়া গেল। ষ্টীমার চলিয়া যাওয়াতে গঙ্গার উপর দিয়া একটু জোরে স্রোত বহিয়া গেল এবং সেই স্রোতগুলি ঘাটের উপর সজোরে, সশব্দে আঘাত করিতে লাগিল; নিকটবর্ত্তী নৌকাগুলি সজোরে দুলিতে লাগিল। এই ব্যাপারে শরৎচন্দ্র 'বাবারে' 'মারে' বলিয়া লাফাইতে লাফাইতে জল হইতে ঘাটের উপর উঠিয়া পড়িল।

"আহা কি করেন, উঠে পড়চেন কেন?—এখনও যে ভাল ক'রে সর্ব্বাঙ্গ ভেজেনি; এখনও ঠিকমত চান করা হ'লনা আর আপনি জল থেকে উঠে পড়চেন যে?" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে দীনু শরতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

শরৎচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে একটি ধাক্কা দিয়া তাহাকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিয়া, আরও চা'র পাঁচটি সিড়ি অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তৎপরে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল,—"জল থেকে উঠে প'ড়বনা তো কি জলের ভেতর দাঁড়িয়ে ম'রব নাকি? ওবাবা কি ভয়ানক ঢেউ; ঢেউগুলো বুকে লাগতে আমার দম বন্ধ হ'য়ে যাবার মতন হ'য়েছিল। আর-একটুক্ষণ জলে থাকলে আমায় 'নাকানী-চোবানী' খাইয়ে ডুবিয়ে মারত'। ওঃ—শালার জাহাজ গেল, আর সমুদ্রের মতন ঢেউ বইয়ে দিয়ে গেল। বাবা——"

দীনু বলিল,—"তা ব'লে বাবু, আপনার চান না সেরে ওঠবার কোনও দরকার ছিল না—ওইটুকু জলে দাঁড়িয়েছিলেন, আপনার ডোববার কোও ভয় ছিলনা।"

শরৎ বলিল—"ওঃ ব্যাটা—তাকি আর ছিল! বুঝেছি তোমার মতলব—কেন তুমি ওকথা ব'লছ তা বুঝেছি। আমি জলে থেকে ওই ঢেউয়ের মাঝে প'ড়ে 'নাকানী-চোবানী' খেতে খেতে 'হাঁক্-পাক্' ক'রতুম আর তুমি ব্যাটা ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে আর মনে মনে আমোদ পেতে।"

দীনু বলিল,—"কি অন্যায় কথা যে বাবু বলেন তা বুঝতে পারিনা। আমি কি ওই ভেবে আপনাকে চান করবার কথা বললুম!"

শরৎ বলিল,—"নিশ্চয়ই! আমি একটা 'লেখাপড়া জানা লোক' আমি কি বুঝতে পারিনি মনে করিস? ওরে ব্যাটা Education এর (শিক্ষার) একটা মূল্য আছে জানিস্। যাকগে ও নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। আমি ওই উড়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে কাপড় ছেড়ে নিচ্চি—তুই শিগ্‌গীর ক'রে চান ক'রে নিয়ে আয়।" এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র উপরের দিকে উঠিয়া গেল।

দীনু আর অধিক বাক্যব্যয় করিল না। শরৎকে গঙ্গাস্নান করিতে দেখিয়া সে মনে বড়ই আনন্দ পাইয়াছিল—প্রাণে একটা তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। সে মনে মনে শরৎকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিল, —"হায়রে বাবু! সাহেবরা বলেছে ব'লে তুমি আজ মা গঙ্গার মাহাত্ম্য বুঝলে। কিন্তু তোমার নিজের জাতের, প্রাচীনকালের মহাপুরুষরা যে, সাহেবদের বলবার অনেককাল আগে থেকে মা গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক বেশী কথা ব'লে গেছেন—সেটা একবার ভেবে দেখলে না? 'মা গঙ্গার জলে ওলাউটোর বীজ মরে যায়,' কেবলমাত্র এই কথাটুকু অন্য-লোকেরা জানতে পেরেচে, কিন্তু তোমার পূর্ব্বপুরুষরা যে,

অনেক আগে থেকে বলে গেছে যে, 'মা গঙ্গার জলে সর্ব্বরোগ নাশ হয়—'অজ্ঞ-লোকেরা' এখনও সেকথা জানতে পারিনি ; তাদের জ্ঞান বাড়ুক তখন তারাও বলবে যে, 'আমরা অনেক পরীক্ষা করে দেখেছি যে গঙ্গা নদীর জলে সকল রোগের বীজ নাশ হয়'। তারপরে, তবে তোমাদের মতন বাবুদের এ কথা বিশ্বাস হবে। 'গঙ্গার জলে ওলাওঠার বীজ নাশ হয়' এ কথা, সাহেবরা বলবার আগে তো বিদ্বান (?) আর সভ্য (?) বাবুরা বিশ্বাস না ক'রে উপহাস ক'রে উড়িয়ে দিতেন, এখন সেই উপহাসের-কথা বিশ্বাস ক'রতে বাবুদের লজ্জা হয়না। আমি তো মূর্খ আর অসভ্য লোক তাই এটা ঠিক বুঝতে পারিনা—আমায় কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে যে—যে সব লোক, নিজেদের জাতের আর ধর্ম্মের প্রাচীন পুঁথিগুলোকে অবিশ্বাস ক'রে নিজেদের, একটা অসভ্য-জাতের বংশধর ব'লে জগতের মাঝে পরিচয় দে'য়, তারপর অন্য এক দেশের, অন্য এক ধর্ম্মের লোক যখন তাদের ব'লে দে'য় তখন তারা নিজেদের জাতের আর ধর্ম্মের প্রাচীন পুঁথিগুলোর কথা বিশ্বাস করে—সেই সব লোক কি ক'রে নিজেদের সভ্য আর শিক্ষিত বলে ? বলতে একটু লজ্জা করেনা ? নিজের মনের কাছেও কি নিজেকে একটু ছোট ব'লে বোধ হয়না ? দূর, ছাই—কেনই বা তা হবে ? এরা সব যে, গ্রামের মাঝখান দিয়ে যায়। যাক্‌গে আর বেলা বাড়িয়ে কাজ নেই—চানটা সেরে ফেলি। মাগো সর্ব্বরোগ-নাশিনী, সর্ব্বপাপ নাশিনী গঙ্গা তোমার জয় হোক মা।"

এই কথা বলিয়া জলের অতি নিকটে উপস্থিত হইয়া দীনু একটি প্রণাম করিল এবং কিঞ্চিৎ জল হাতে করিয়া লইয়া নিজের মাথার উপর

ছিটাইয়া দিয়া, অনুচ্চ-স্বরে বলিল—"মা গঙ্গা, চান করবার জন্যে বাধ্য হ'য়ে তোমার পবিত্র জলে পা দিতে হচ্ছে, সেজন্য মাপ ক'র মা।" এই কথা বলিয়া দীনু গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং কখনও সাঁতার দিয়া, কখনও ডুব দিয়া, খুব আনন্দ ও উৎসাহ ভরে স্নান করিতে লাগিল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৺নবীনচাঁদ ঘোষ কলিকাতা সহরের একজন বিখ্যাত ধনী ও ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা করিয়া তিনি অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মৃত্যুকালে অনেক বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। নবীনচাঁদের পিতা সামান্য গৃহস্থ ছিলেন। তিনি একখানি বাটি, নগদ তিন সহস্র মুদ্রা এবং তিনটি পুত্র রাখিয়া এই নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে নবীনচাঁদ সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিন সহোদরে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি আপোষে বিভাগ করিয়া লইল। নবীনচাঁদের ইচ্ছা ছিল যে, তিন সহোদরে মিলিয়া কোনরূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার সহোদর যুগল তাহাদের শ্বশুরের পরামর্শে এ বিষয়ে একেবারে অসম্মত ছিল বলিয়া নবীনচাঁদ প্রস্তাব করেন যে—"আমি এই বসত-বাটির কোনও অংশ লইব না, তোমরা দুইজনে তাহা সমান দুই অংশে বিভাগ করিয়া লও, আমাকে ঐ নগদ তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান কর।" নবীনচাঁদের প্রস্তাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামনাথ ও কনিষ্ঠ সহোদর হরিনাথ একবাক্যে সম্মত হইলেন। নবীনচাঁদ নগদ তিন সহস্র মুদ্রা লইয়া—তাঁহার প্রাপ্য, বসত-বাটির এক তৃতীয়াংশের দাবী পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ ও মধ্যমাগ্রজ যেমন ঐ নগদ টাকার কোনও অংশ পাইলেন না—তেমনি তাঁহারা বসত-

বাটিটি সমান দুই অংশে পাইলেন নবীনচাঁদকে আর তাহার কোনও অংশ দিতে হইল না।

এইরূপভাবে আপোষে বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া তিন সহোদরই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। নবীনচাঁদের সহোদর-যুগল একটী সওদাগরী অফিসে চাকুরী করিতে প্রবেশ করিল। তাহারা পঁচিশ টাকা বেতনে চাকুরী করিতে আরম্ভ করিল; তৎপরে ত্রিশ বৎসর পরে সংবাদ লইয়া জানা গেল যে—'তাহাদের বেতন, এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাড়িতে, বাড়িতে এখন পঁচাত্তর টাকায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং আর বাড়িবার দিকে অগ্রসর হইতেছে না। বেতন বেচারা এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাড়িবার দিকে চলিয়াছে, সুতরাং এই দীর্ঘ দিনের পথ চলিয়া যাওয়াতে বেচারাকে বাত-ব্যাধিতে ধরিয়াছে তাই সে বেচারা আর চলিতে না পারিয়া পঁচাত্তরের ঘরে আসিয়া, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়া আছে। ইহারা সেরূপ বুদ্ধিমান হইলে এই বাত-ব্যাধিগ্রস্ত বেতনকে গরম তৈল মালিশ করিয়া কার্য্যক্ষম করিতে পারিত। কিংবা যে ভাগ্যবানের হাতে বেতন বেচারার দেহ ও প্রাণ রক্ষিত, সেই ভাগ্যবানকেও তৈল-দান করিতে পারিলে—বেতন বেচারী ব্যাধিমুক্ত হইয়া পুনঃ কার্য্যক্ষম হইতই হইত। কারণ Things which are equal to the same thing are equal to one another আমরা এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে সুফল ফলিতে দেখিয়াছি। তৈল-দান করিয়া বহু—বহু ব্যক্তি, তাহাদের বাত-ব্যাধি-গ্রস্ত চলচ্ছক্তিহীন বেতনকে পুনরায় কার্য্যক্ষম, সবল ও দ্রুতগমনশীল করিয়াছে।

নবীনচাঁদের সহোদর-যুগল কিন্তু এইরূপভাবে তৈল-দান করিতে ঘৃণা বোধ করিত। তাহারা ঐ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিল। কেবল এই বেতন বিষয়ে নহে—সকল বিষয়েই ইহারা অতি অল্পে সন্তুষ্ট হইত। এই কারণেই, পিতৃ-বিয়োগের পর বিষয় বিভাগের সময় তাহারা, কনিষ্ঠ নবীনচাঁদের প্রস্তাবানুসারে আপোষে বিষয় বিভাগে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সে সময়ে তাহারা যদি আপোষ-বিভাগে সম্মত ও সন্তুষ্ট না হইয়া পরস্পরে মোকর্দ্দমা করিত তাহা হইলে আজ আর তাহাদের—নিজের বাটিতে অবস্থান করিয়া, অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে দিন যাপন করিতে হইত না। আপোষে নিষ্পত্তি না করিয়া যদি তাহারা মোকর্দ্দমায় মাতিত তাহা হইলে বৎসর খানেকের মধ্যে তাহারা দেখিত যে—মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু মোকর্দ্দমার খরচা যোগাইয়া তাহারা পথের ভিখারী হইয়াছে এবং সম্পত্তির মধ্যে তিন ভ্রাতার তিনখানি মোকর্দ্দমার-রায়ের কাগজ আছে—তাও আবার নকল।

নবীনচাঁদের, কি জানি কেন, ব্যবসার দিকে বরাবরই প্রবল ঝোঁক নবীনচাঁদ নগদ তিন সহস্র মুদ্রা লইয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বড় রাস্তার ধারে একখানি ছোট বাটী ভাড়া লইলেন। ঐ বাড়ীটির নিম্নতলে তিনি একখানি মণিহারির দোকান খুলিলেন এবং উপরতলে স্ত্রীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে মুর্গীহাটা হইতে পাইকারী দরে জিনিষ কিনিয়া আনিয়া, খুচরা দরে এখানে বেচিতে লাগিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর ও বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহার বেশ লাভ হইতে লাগিল। তিনি নানারকমে মাথা খেলাইয়া ব্যবসার

শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল তাঁহার আয়ও তত' বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কিন্তু তাঁহার নিজের পারিবারিক খরচা একটি পয়সাও বাড়িল না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই কষ্ট করিয়াও জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেননা এবং খুব আড়ম্বর করিয়াও দিন যাপন করিতেন না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত মাঝারী রকম চালে চলিতেন। এখন তাঁহার আয় বাড়িল বলিয়া তিনি খরচা বাড়াইলেন না—পূর্ব্ববৎ চালে চলিতে লাগিলেন! পাঁচ বৎসর পরে তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে সমস্ত খরচ-খরচা বাদে প্রায় বিশ সহস্র টাকা লাভ হইয়াছে। এই সময় তিনি পূর্ব্ব ব্যবসা ত্যাগ করিয়া বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশে তখন বিলাতী কাপড়ের খুব আদর ও কাটতি। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি প্রচুর অর্থ লাভ করিলেন এবং স্বয়ং বিলাতে ফরমাস দিয়া রাশি, রাশি কাপড় আমদানী করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন। প্রায় বার বৎসর এইভাবে ব্যবসা চালাইয়া তিনি নগদে ও ভূসম্পত্তিতে প্রায় পনের লক্ষ টাকার মালিক হইলেন। ব্যবসায় সূত্রে অনেক বড়, বড় ইংরাজ ও মাড়োয়ারীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল; তিনি চারিদিকে খুব সম্মান পাইতে লাগিলেন এবং কলিকাতার একজন বড় ব্যবসাদার ও ধনী ব্যক্তি বলিয়া দেশ, বিদেশের ব্যবসাদার মহলে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে, সঙ্গে নবীন চাঁদ ভাড়াটিয়া বাটি পরিত্যাগ করিয়া—নিজের বাসের জন্য একখানি প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহা সাহেবী ফ্যাসানে সুসজ্জিত করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই নূতন বাটিতে আসিবার

দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি নূতন বাটিতে আসিবার পরে, যথাসময়ে খুব ধুমধাম্ করিয়া পুত্রের শুভ অন্ন-প্রাশন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া, বড় আদরে পুত্রের নাম রাখিলেন শরৎচন্দ্র।

যত দিন যাইতে লাগিল নবীনচাঁদ উন্নতির দিকে ততই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার বৃহৎ কারবার, বৃহৎ কার্য্যালয় শত কর্ম্মচারী দ্বারা পরিপূর্ণ। এই সকল কর্ম্মচারীর উপর একজন অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার নাম গোবিন্দবাবু। গোবিন্দবাবু খুব বিশ্বাসী এবং বিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি। তিনি নবীনচাঁদের বাল্যবন্ধু এবং এখনও উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। নবীনচাঁদ, গোবিন্দবাবুকে খুব বিশ্বাসের চক্ষে দেখেন এবং তাঁহার ব্যবসার টাকা কড়ি সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার গোবিন্দবাবুর উপর অর্পণ করিয়াছেন। গোবিন্দবাবুও খুব বিশ্বাস ও দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। সুদক্ষ অধ্যক্ষ বলিয়া গোবিন্দবাবুর চারিদিকেই বেশ সুনাম হইয়াছে এবং তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও প্রভুপরায়ণতার কথা নবীন-চাঁদ যেমন জানিতেন তেমনই পরিচিত, অপরিচিত অনেক লোকই জানিত।

সময় যখন ভাল হয় তখন ধূলা মুঠা ধরিলে সোনা মুঠা হয়। নবীন-চাঁদ এই সময় হইতে রপ্তানীর ব্যবসা ধরিলেন তিনি কলিকাতা ও মফঃস্বল হইতে চাউল, সরিষা, পাট্ প্রভৃতি কিনিয়া বিদেশে রপ্তানী করিতে লাগিলেন। এই রপ্তানীর ব্যবসায়েও তিনি প্রভূত অর্থ লাভ করিতে লাগিলেন।

নবীনচাঁদ প্রথম অবস্থায় এক নৌকায় পা দিয়া চলিতেন, কিন্তু পয়সা হওয়ার সঙ্গে, সঙ্গে তিনি দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি খিচুড়ী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন; কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে। তিনি সভ্য লোকের সহিত মিশিতেন বটে কিন্তু নিজে পুরা সভ্য হইতে চাহিতেন না এবং হনও নাই। তবে তাঁহার পুত্র শরৎচন্দ্রকে পুরা রকম সভ্য করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সভ্য বন্ধুগণের সহিত আলোচনায় ও পরামর্শে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে—পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে মানুষ যথার্থ সভ্য, শিক্ষিত ও উন্নতিশীল হয়; তাহার চরিত্র সুগঠিত হয়, মন স্বাধীন হয়, প্রবৃত্তি স্বাধীন হয়; সে যথার্থ মানুষ হয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি, পুত্র শরৎচন্দ্রকে উত্তমরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার মানস করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি বহুপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রকে বেশী দামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন এবং অনেক টাকা খরচ করিয়া অনেক বিলাত-ফেরৎকে, তাহার গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে স্ব-সমাজ ও স্বধর্মত্যাগী সুসভ্য লোকদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন বটে কিন্তু কখনও স্ব-ধর্ম্মে আস্থাহীন হন নাই এবং তাঁহার বাটি যদিও সাহেবী ফ্যাসানে সুসজ্জিত তবুও বাটির সর্ব্বোচ্চতলে ঠাকুর-ঘর নামধেয় একখানি স্বতন্ত্র গৃহ ছিল ও সেই ঠাকুর ঘরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। তিনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যাবেলায় ঐ ঠাকুর ঘরটিতে যাইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন।

নবীনচাঁদ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া বহু প্রকার উপায় অবলম্বন

করিলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু যথার্থ শিক্ষিত হইতে পারিল না, তাহার যথার্থ বিদ্যা লাভ হইল না এবং সে বিশেষরূপে কতকগুলি কুফলের অধিকারী হইল। স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া সে কলেজে প্রবেশ করিল এবং যথা সময়ে এল, এ পাস করিল।

এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া কলেজে প্রথম ভর্তি হইবার কিছুদিন পর হইতে শরতের মেজাজটা গরম হইয়া গেল। সে নিজেকে একজন শিক্ষিত লোক বলিয়া ভাবিতে লাগিল। তৎপরে যত দিন যাইতে লাগিল তাহার এই ধারণা ও তত বাড়িতে লাগিল। এল, এ, পাস করিয়া যখন সে বি, এ, পড়িবার নিমিত্ত তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল তখন হইতে সে, নিজেকে একজন মহা-জ্ঞানী ও বিশেষ বিদ্বান লোক বলিয়া মনে ক'রিতে লাগিল। সে যখন-তখন, যার-তার কাছে নিজের বিদ্যার বড়াই করিত এবং কোনও বিষয়-না বুঝিলেও তাহাতে মন্তব্য প্রকাশ করিত ও তাহার মত অন্যায় বা ভুল হইলেও সে, সেই ভুল মত প্রতিষ্ঠার জন্য কতকগুলি অসার যুক্তি প্রয়োগ করিত এবং যখন আর হালে পানি পাইত না তখন বর্ব্বরের মতন ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়া প্রতি-পক্ষকে অপমান করিত। এতদ্ব্যতীত সে, নিজেকে বৈজ্ঞানিক বলিয়াও মনে করিত—ইহার কারণ এই যে, সে এল, এ, পড়িবার সময় বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছিল এবং বি, এ',তেও বিজ্ঞান পড়িতেছিল।

পাশ্চাৎ শিক্ষার মহিমায় এবং বাটিতে বিলাত ফেরৎ মাষ্টারের নিকট কতকগুলি—আমাদের ধাতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং আমাদের পক্ষে অসার—পাশ্চাত্য বাজে নভেল পড়িয়া শরৎচন্দ্র ঘোরতর নাস্তিক

হইয়া পড়িল ; তাহার চরিত্রও বিসদৃশ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, পিতামাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দূরে থাক, মায়া-মমতা অবধি নাই। সে, নিজের ইচ্ছামত সমস্ত কার্য্য করে, কোনও বিষয়ে কাহারও কোনওরূপ মানা মানেনা।

শরৎচন্দ্রের পিতা নবীনচাঁদও—তাহার স্বেচ্ছামত কার্য্য সম্পাদনে কখনও কোনওরূপ বাধা দিতেন না। নবীনচাঁদ, তাহার সকল আবদার সহ্য করিতেন ; সে যখনই যাহা চাহিত, তখনই তাহাকে তাহাই দিতেন। বিলাত-ফেরৎ গৃহ-শিক্ষকের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নবীনচাঁদ নিশ্চিন্ত ছিলেন। শরতের চাল-চলন্ সম্বন্ধে কেহ কোনওরূপ অনুযোগ করিলে নবীনচাঁদ তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। শরৎ প্রতিমাসে তিন,চারিশত মুদ্রা বাজে খরচ করিলেও তিনি তাহাতে কোনওরূপ বাধা দিতেন না।

শরৎচন্দ্র সাহেব-বাড়ী হইতে নানা ফ্যাসানের সাহেবী-পোষাক প্রস্তুত করায়। খুব বেশী দাম দিয়া এক-এক প্রস্থ পোষাক তৈয়ারী করায় এবং দুই একবার ব্যবহার করিয়াই তাহা বাতিল করিয়া দিয়া আবার অনেক টাকা খরচ করিয়া নূতন পোষাক লইয়া আসে। গৃহ শিক্ষককে লইয়া প্রায়ই সাহেবদের হোটেলে যাইয়া খানা খাইয়া আসে। এই সমস্ত নানারূপ কারণে সে প্রতি মাসে শত, শত মুদ্রা ব্যয় করে ; নবীনচাঁদ এই খরচের জন্য তাহাকে একদিনও কোনও প্রকার জিজ্ঞাসা-বাদ করিতেন না, বা সে 'কি করিতেছে,' 'কি না করিতেছে' এ সম্বন্ধে কোনও সংবাদই লইতেন না। তবে—মধ্যে, মধ্যে কেবল বিলাত-ফেরৎ শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে—"শরতের লেখাপড়া কি রকম হ'চ্ছে ?" শিক্ষক মহাশয় উত্তরে বলিতেন যে—"উত্তমরূপই

হ'চ্চে। আমি, শরৎকে বই পড়িয়ে শিক্ষা দিচ্ছি; মিউজিয়ম, জু-গার্ডেন, বোটানিকাল-গার্ডেন প্রভৃতি নানা স্থানে ওকে নিয়ে গিয়ে ব্যবহারিক-জ্ঞান দিচ্চি। কলেজের পড়া ছাড়া ভাল, ভাল পাশ্চাত্য দেশীয় পত্রিকা উপন্যাস, সাহিত্য প্রভৃতি বাড়ীতে পড়াচ্চি।" এই সকল কথা শুনিয়া নবীনচাঁদ ভাবিতেন যে, তাঁহার শরৎ অতি শীঘ্রই একজন আদর্শ ব্যক্তি বলিয়া জগৎ মাঝারে পরিচিত হইবে।

নবীনচাঁদের বাল্যবন্ধু ও কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ গোবিন্দবাবু কিছু মধ্যে, মধ্যে শরতের 'বে-চাল' সম্বন্ধে তাঁহার নিকট অনুযোগ করিলে নবীনচাঁদ তাঁহাকে বলিতেন যে—"আমি কি না বুঝে, সুঝে শরৎকে স্বেচ্ছামত চ'লতে দি? আমি যদি ওর ইচ্ছামত কাজ ক'রতে বাধা দিতে থাকি তাহলে ওর মনের স্বাধীন-প্রবৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হ'তে পারবেনা; অঙ্কুরেই সেগুলি নষ্ট হ'য়ে যাবে। স্বেচ্ছামত কাজ ক'রতে বাধা পেতে, পেতে ওর মনটা শীঘ্রই দাসভাবাপন্ন হ'য়ে প'ড়বে। দেখ গোবিন্দ, এই কারণেই আমাদের জাতের এত অবনতি। আমি, আমার শিক্ষিত, সভ্য বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ক'রে দেখেছি যে, তাঁদের কথাই ঠিক। তাঁরা বলেন যে—'আমরা, আমাদের ছেলেদের বাল্যাবস্থা থেকে-তাদের স্বেচ্ছামত কাজ ক'রতে বাধা দিয়ে থাকি ব'লেই তাদের মনটা দাসভাবাপন্ন হয়ে পড়ে, পরিণামে আর তা'রা জীবনে বিশেষ রকম উন্নতি ক'রতে পারেনা।

পুত্রের মন যাহাতে দাসভাবাপন্ন হইয়া না যায় সেজন্য পুত্রের পিতা যেরূপ কার্য্য করিতেছিলেন, পুত্রের মাতা, তাঁহার সেরূপ কার্য্যের একেবারেই অনুমোদন করিতেন না। শরৎচন্দ্রের মাতা মোক্ষদাসুন্দরী,

পুত্রের কথাবার্ত্তা ও বিপরীত চাল-চলনে একেবারে বুক-ভাঙ্গা হইয়া পড়িয়া স্বামীর নিকট প্রায়ই নানারূপ অভিযোগ করিতেন কিন্তু স্বামীর উপেক্ষা ও অমনোযোগ ভিন্ন এ বিষয়ে আর কোনও ফল পাইতেন না। অবশেষে নিজেই, শরৎকে সংশোধন করিবার মানসে তিনি প্রায়ই তাহাকে সাদরে নিকটে বসাইয়া—দেব-দ্বিজে ও পিতামাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবার নিমিত্ত নানারূপ উপদেশ দিতেন। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" শরৎচন্দ্র মাতার উপদেশের এক বর্ণও পালন করিত না। সে প্রথম প্রথম মাতার আহ্বানে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার উপদেশগুলি কান পাতিয়া শুনিত। কিন্তু সে যখন ভাবিয়া দেখিল যে—তাহার মাতা যে সকল উপদেশ দেন তাহা কোনও সভ্য-রচিত পুস্তকে নাই এবং তাহার বিলাত-ফেরৎ গৃহ-শিক্ষকও কখনও এরূপ উপদেশ তাহাকে দেননা ; বরঞ্চ ইহার বিপরীত উপদেশই দেন—তখন সে আর, মাতার আহ্বানে, তাঁহার নিকটে যাইত না। 'এখন প'ড়ছি,' 'এখন বিশেষ কাজ আছে,' 'এখনই বাইরে যেতে হবে,' 'আর একটু পরে যাব' ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ ওজর করিয়া সে, মাতার আহ্বান উপেক্ষা করিত। তারপর যখন আর কোনও ওজর করিবার হেতু পাইত না তখন অতীব বিরক্তি ভাব প্রদর্শন করিয়া, মাতার নিকট গমন করিত এবং তিনি কিছু বুঝাইতে আসিলে দাঁত মুখ খিচাইয়া বলিত যে—"তুমি কা'কে বোঝাতে আস বল দেখি ? আমি কি একটা মূর্খ না 'যে-সে' লোক যে তুমি আমায় ঐরকম বাজে কথা সব বোঝাতে আস ? তোমার ঐ সব অসার যুক্তি নিয়ে তুমি চিরদিন থাক, আমায় খবরদার ওসব আর ব'লতে এসনা।" এই রকম ধরণের কথা বলিয়া

পুত্র সরোষে স্থান-ত্যাগ করিয়া যাইত। স্বামীর নিকট বলিতে গেলে তিনি, নিজের বিজ্ঞতা দেখাইয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া মোক্ষদাসুন্দরীকে নিরস্ত করিতেন, পুত্রকে কখনও শাসন করিতেন না। মোক্ষদাসুন্দরীর প্রাণ কিন্তু এইরূপ প্রবোধ-বাক্যে শান্ত হইত না। পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মহা কাতর হইয়া, প্রতীকার কামনায়, তিনি বড় আশা করিয়া স্বামীর শরণাপন্ন হইয়া বার, বার বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে জগৎ-স্বামীর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার স্বামী যাহাতে পুত্রের এই বিপরীত ভাবের প্রতীকার করেন এবং পুত্রকে শাসন করেন এই প্রার্থনা তিনি দিবানিশা জগৎ-স্বামীর নিকট করিতে লাগিলেন। 'হে ভগবান আমার স্বামীর চোখ ফুটিয়ে দাও, আমার ছেলের এই বিপরীত মতিগতির কথা তিনি যেন বুঝতে পারেন' এই প্রকারের সকাতর প্রার্থনা, শ্রীভগবানের শ্রীচরণে, মোক্ষদাসুন্দরী ভক্তিপূর্ণ চিত্তে করিতে লাগিলেন। স্বামী, পুত্রের মঙ্গল কামনায় হিন্দু-সতীর এই সকাতর প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীভগবান কাতর হইয়া পড়িলেন—তিনি ইহার প্রতীকার করিয়া দিলেন।

মোক্ষদাসুন্দরী যদি এতকাল ধরিয়া লৌকিক সাহায্যের আশায় না থাকিয়া উপরকার সাহায্য কামনা করিতেন তাহা হইলে কোন্‌কালে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়া যাইত। অজ্ঞানতাবশে, মোহবশে তিনি এতদিন তাহা করেন নাই তাই তাঁহার এতটা মনকষ্ট ভোগ হইল। এক্ষণে করুণাময় শ্রীভগবানের শরণ লওয়াতে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। একদিনের একটি সামান্য ঘটনা হইতে নবীনচাঁদ,শরতের স্বরূপ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল, তিনি স্বকৃত কর্ম্মের বিষময় ফল দেখিয়া অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নবীনচাঁদ একদিন মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে কোনও বিশেষ কার্য্য হেতু অসময়ে অন্দরে প্রবেশ করিতেছিলেন। প্রবেশ করিবার মুখে তিনি ভিতর-দিক হইতে আগত একটা গোলমাল শুনিতে পাইলেন। প্রথমটায় বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ভিতরদিকে আরও খানিক অগ্রসর হইয়া পুত্রের ক্রোধ-মিশ্রিত উচ্চ কণ্ঠস্বর এবং পত্নীর ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি বিস্মিত চিত্তে আরও অগ্রসর হইয়া একটি কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন যে, শরৎচন্দ্র আহার করিতে বসিয়াছে এবং তাহার মাতা মোক্ষদাসুন্দরী নিকটে অবনত মস্তকে কাঁদিতেছেন। শরৎচন্দ্র খুব তর্জ্জন, গর্জ্জন করিয়া হাত, মুখ নাড়িতে নাড়িতে মোক্ষদাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া তাঁহাকে বলিল—"তোমায় আমি আজ শেষ ব'লে দিচ্ছি যে, তুমি আমায় আর কখনও অমন 'যা-তা' বোঝাতে এস না। যদি আস, তাহলে আজ যা অপমান হ'লে তার বিশ-গুণ বেশী অপমান হবে। তুমি নিজে যেমন ইল্লিটারেট্ তার ঠিক উপযুক্ত অপমান আজ হওনি।"

শরৎচন্দ্র ব্যক্তব্য শেষ করিয়াই আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাহিরে যাইবার জন্য, পশ্চাৎ ফিরিয়া, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াই দেখিল যে, তাহার পিতা দ্বারে দণ্ডায়মান।

নবীনচাঁদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে কি? এত গোলমাল কিসের?"

মোক্ষদাসুন্দরী হেঁট-মুণ্ডে, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিলেন। স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াই তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং স্বামীকে দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি—আমায় কোথাও পাঠিয়ে দাও। আমি এখানে আর একদণ্ড থাকতে পারবনা। এখানে থেকে—মা হ'য়ে, ছেলের এ রকম অধঃপতন চক্ষের ওপর দেখতে পারবনা আর তার কাছে এরকম অপমানও হ'তে পারবনা। এই কথা বলিয়া তিনি আরও জোরে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই ঘরটি শরৎচন্দ্র বাবুর খাস-কামরা। সে এই ঘরে দুইবেলা আহার করে এবং রাত্রিকালে শয়ন করে। এই ঘরে একখানি, একজন লোক শুইবার উপযোগী ছোট খাট আছে। নবীনচাঁদ এই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিলেন এবং পুত্রকে নিকটে বসিতে আদেশ (শ্রীবিষ্ণু—অনুরোধ) করিয়া বলিলেন—"দেখ শরৎ, তুমি যখন চোদ্দ, পনের বছরের ছেলে তখন থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত, তোমার মা, তোমার নামে অনেক অভিযোগ আমার কাছে করেন। তুমি পূর্ব্বে ছেলেমানুষ ছিলে সেইজন্যে তখন; আর তারপরেও তুমি উপযুক্ত শিক্ষা পাচ্ছ ব'লে সে সব কথা আমি কাণে তুলিনি। কিন্তু তোমার মার প্রতি তোমার যে উক্তি, আজ নিজ কর্ণে শুনলুম তাতে তো আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি! তুমি এখন ছেলেমানুষ নও, তার ওপর তুমি আবার শিক্ষিত হ'চ্ছ; নেহাৎ মূর্খ বা ইতর তুমি তো নও—তোমার মুখ থেকে এরকম কথা বার হওয়া অতীব লজ্জা, অতীব ঘৃণার কথা। তা ছাড়া—তোমাদের মা-ছেলের মধ্যে এ রকম একটা বিরোধী-ভাব থাকাত' ভাল নয়।"

শরৎ বলিল—"বাবা মার প্রতি কি আমার য়্যাফেক্‌সন (ভালবাসা) নেই? আছে—তবে আমাদের মতন জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোকদের পক্ষে যতটা সঙ্গত ও সম্ভব ততটা ভালবাসা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান মার প্রতি আমার আছে। কিন্তু তাই ব'লে স্ত্রীলোকের—বিশেষতঃ অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের কথা আমি কি ক'রে পালন করি। মা যে সকল অসম্ভব ও অনুমোদনের অযোগ্য কথা বলে, সে সকল কথা আমি কিছুতেই পালন ক'রতে পারিনা।"

নবীনচাঁদ বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"তোমার মা কি এমন অসম্ভব কথা বলে যা তুমি পালন ক'রতে পারনা?"

শরৎচন্দ্র অবজ্ঞাভরে বলিল—"আমি যত বারণ করি যে আমার কাছে ও সকল বা, তা বোঝাতে এসনা, মা খালি ততই ব'লবে যে, 'মা কালীকে ভক্তি কর'; 'বাবা তারকনাথকে ডাক'; বাবা সত্যনারায়ণের কাছে মাথা ঠোক'। দেখুন আমি এক ঈশ্বরকেই মানিনা বা স্বীকার করিনা তা আমি আবার অত' দেবতাকে মানতে যাবো। আমার কি আর অন্য কোনও কাজ নেই।"

নবীনচাঁদ মহা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সে কি হে, তুমি ঈশ্বরকে মাননা বা তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করনা কি?! কি ব'লছ তুমি, অ্যাঁ!"

শরৎচন্দ্র বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভাবে বলিল—"ঈশ্বর ব'লে কেউ কি আছে যে তাকে মান্‌তে যাব বা তার অস্তিত্ব স্বীকার করব? আপনার এত বয়েস হ'য়ে গেল—'ঈশ্বর নামে যে কিছুই নেই' এই কথাটা আপনি এখনও জানতে পারেন নি বাবা?... য়্যাঁ!

নবীনচাঁদ বলিলেন—"সে কি বাবা, ঈশ্বর নেই কি? তিনি অবশ্যই

আছেন। এই দেখ, এই যে আমি অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে এত বড়-লোক হয়েছি সেটা একমাত্র ঈশ্বরের দয়ায়, বিধাতার অনুগ্রহে।"

শরৎচন্দ্র উপেক্ষার হাসি, হাসিয়া বলিল—"আপনার যে এই অবস্থার উন্নতি হয়েছে তার বিধাতা আপনি নিজে। ঈশ্বর এসে আপনাকে বড় লোক ক'রে দিয়ে যায়নি—আপনি নিজের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে বড়লোক হয়েছেন।"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"না, না. তা কখনও নয়। আমার মতন, এমন কি আমার চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম ও চেষ্টা, লক্ষ লক্ষ লোকে ক'রছে, কিন্তু সকলেই কি বড়লোক হ'তে পারছে? তুমি লেখা-পড়া যাহোক কিছু শিখেছ আর তুমি এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারলে না যে, ঈশ্বর যদি নেই তাহলে এই বিশাল পৃথিবী আর প্রাণী সৃষ্টি ক'রলে কে? আমাদের নিত্য-প্রয়োজন যোগাচ্ছে কে? শক্ত মাটিতে সোনা ফলাচ্ছে কে?"

শরৎচন্দ্র বলিল—"নেচার,—আপনাকে আর বেশী কি বলব—আপনি এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারলেন না যে, নেচারের শক্তিতে (স্বভাবের শক্তিতে) এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, শস্য উৎপাদন হচ্চে। নেচারের বলেই সব হচ্চে—নেচারের বলে আমরা জন্মাচ্ছি, জন্ম দিচ্ছি, জীবন-ধারণ করছি আবার মরে যাচ্ছি। ঈশ্বরের এতে কোনও হাত নেই। কাপুরুষ, দুর্ব্বল-চেতা লোকেরাই ঈশ্বরের দোহাই দেয়। সভ্য-জগৎ এই সমস্যা নিয়ে তোলপাড় হ'য়ে গেছে। মহা, মহা জ্ঞানী মহাপুরুষরা এই সত্য আবিষ্কার ক'রে চির-স্মরণীয়, জগদ্বরেণ্য হ'য়ে গেছেন। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে, সঙ্গে বিজ্ঞানের বল বাড়ছে—বিজ্ঞান-

বলে কত শত, অসম্ভব কাজ আজ সম্ভব হ'য়েছে।' আপনি যে কথা ব'ললেন সে কথা অসভ্য, অশিক্ষিত লোক বিশ্বাষ ক'রবে। আমি শিক্ষিত,জ্ঞানী ; তার ওপর বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছে,আমি আপনার কথা কিছুতেই বিশ্বাষ ক'রব না—ক'রতে পারিনা জানবেন।"

নবীনচাঁদ ধীরভাবে বলিলেন—"শরৎ তুমি প্রবীণ লোক নও ছেলেমানুষ, তুমি জগতের এ সব রহস্যের কি বোঝ' যে, এই সব কথা তুলে আমার সঙ্গে তর্ক ক'রতে আস ? আর, বিজ্ঞানেরই বা তুমি কি জান ? তুমি তো এই সবে থার্ড ইয়ারে প'ড়তে আরম্ভ করেছ—"

শরৎচন্দ্র গর্ব্বভরে বলিল—"আমি যে বিশ্ব-বিদ্যায় জ্ঞান লাভ ক'রেছি তা কি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট বিদ্যা অভ্যাস ক'রে ? তা নয়, বাবা তা নয়—আমি অনেক রকম-ফের ক'রে তবে একটা বিশেষ জ্ঞানী লোক হয়েছি। আমি কলেজে পড়েচি তার ওপর আবার হোম-টিচার্ (গৃহ-শিক্ষক) আমাকে পাশ্চাত্য দেশের নানা রকম বই, পত্রিকা প্রভৃতি পড়ান্—শুধু পড়ান' নয় ; সে সবের নানা রকমের টিকা, টিপ্পনী ক'রে নিগূঢ় অর্থ বুঝিয়ে দেন। আমি ফাঁকি দিয়ে জ্ঞানী হইনি বাবা। আমি যে জ্ঞানী ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছি সেটা বিশেষ পরিশ্রমের ও মস্তিষ্ক-চালনার বিনিময়ে।"

নবীনচাঁদ পূর্ব্বাপেক্ষা ধীরভাবে বলিলেন—"জ্ঞান—সমুদ্র, মহা সমুদ্র বিশেষ। এই এত' অল্প বয়েসে তুমি বা তোমার হোম-টিচার মহাশয় কি ক'রে জ্ঞানী হ'লে ! তোমার মাষ্টার মশাই তো কেবল বিলেত-ফেরতা। কিন্তু সেই বিলাতের মহামনিষী, 'পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কারকারী' মহাজ্ঞানী সার্ আইজ্যাক নিউটন জ্ঞান-সম্বন্ধে কি

বলেছেন মনে আছে কি? তিনি অত বড় পণ্ডিত, অত বড় জ্ঞানী-লোক হ'য়ে বলেছেন যে, 'জ্ঞান-মহাসমুদ্র আমার সন্মুখে—আমি তার তীরে দাঁড়িয়ে উপলখণ্ড তুলেছি মাত্র, জল স্পর্শও ক'রতে পারিনি—জ্ঞান-সমুদ্র অক্ষুণ্ণ ভাবে অবস্থান করছে'। শরৎ, মহাত্মা নিউটনের মতন লোক যদি এই কথা ব'লতে পারেন তাহ'লে আমাদের মতন লোকের কি জ্ঞানের গর্ব্ব করা উচিত?"

শরৎচন্দ্র বলিল—"নিউটন এ কথা যখন বলেছেন তখন তিনি জ্ঞানী ছিলেন না—তাই বলেছেন। আমি তা'বলে ও রকম কথা ব'লতে পারি না। আমি শিক্ষিত, আমি জ্ঞানলাভ করেছি, আমি নিজেকে অবশ্যই জ্ঞানী ব'লে প্রচার করব। দেখুন বাবা, আমার মতন শিক্ষিত জ্ঞানী লোককে আপনি—ঈশ্বর আছে, দেবতাকে ভক্তি কর—এই সব বাজে কথা বোঝাতে আসবেন না। মায়ের সঙ্গদোষে দেখছি আপনারও মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। It is a pitty—really a pitty.

নবীনচাঁদ বলিলেন—শরৎ, মাথা খারাপ আমাদের নয়—তোমারই খারাপ হয়েছে দেখছি। তুমি কিসে এমন জ্ঞানী হ'লে, কি এমন প্রমাণ পেলে যে, ফট্ ক'রে একেবারে বলে ব'সলে 'ঈশ্বর নেই।' তুমি তো তেমন কিছু শিক্ষিত হওনি, তেমন কিছু তো পড়োনি—আর যদিই বা তোমার খুব পড়া থাকতো, তুমি অনেকগুলো পাস্ ক'রে থাকতে তাহ'লেই কি তুমি যথার্থ জ্ঞানী হ'তে পারতে? অধিক বয়েস না হ'লে, বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে, সঙ্গে নানা রকম দেখে শুনে অভিজ্ঞতা না বাড়লে মানুষ কিছুতেই যথার্থ জ্ঞানী হ'তে পারে না। মানুষের, উপযুক্ত জ্ঞান-লাভ মানবতত্ত্ব অধ্যয়নেই হয়। আর, মানবতত্ত্ব অধ্যয়ন করবার উপযুক্ত

ও প্রকৃত পাত্র হ'চ্ছে মানুষ। তুমি আগে দীর্ঘকাল ধ'রে এবং ভাল ক'রে মানব-সমাজে মিশতে থাক', দর্শন ও সহবাসের ফলে মানব-চরিত্র বিশেষ ক'রে অধ্যয়ন ক'রে একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর' তারপর নিজেকে কতকটা জ্ঞানী ব'লে মনে ক'র। তার পরে কোনও একটা সিদ্ধান্তকে মনে স্থান দিও। এর পূর্ব্বে—যে সব লোক জ্ঞানী ছিলেন, তাঁরা বহু, বহু যুগ পূর্ব্ব থেকে যে সব সিদ্ধান্ত ক'রে গেছেন সেগুলোকে মেনে নেও। মানব তত্ত্ব অধ্যয়ন না ক'রে, সংসার-রহস্য অবগত না হ'য়ে তুমি কি ক'রে নিজেকে জ্ঞানী ব'লে মনে ক'রতে পার? তুমি হয়ত' আমার কথা কিংবা আমাদের দেশীয় কোনও মহাজনের বচন মানবেনা; কিন্তু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের বচন মানবেত? তোমরা প্রতি কথায় নিজেদের দেশের লোকের চেয়ে পাশ্চাত্য লোকেদের বচনের ও মতের দোহাই দাও এবং সেই সকল বচন ও মতের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক শ্রদ্ধাও দেখাও সেইজন্যে আমি তোমায় পাশ্চাত্য-মহাজনের বচন উদ্ধৃত ক'রে এ কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক মহাত্মা সক্রেটিস্ ইয়োরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনিও এই গভীর সত্য শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিও বলেছেন যে, 'The proper study of mankind is man' সত্যই—বহির্জগতে যেমন একটা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্য-প্রণালী দেখা যায়, অন্তর্জগতেও তেমনি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্য প্রণালী দেখতে পাওয়া তায়। মানুষ, অসীম অনন্ত বিশ্বের সংক্ষিপ্তসার; কাজে-কাজেই, বহির্জগতের নিয়মাবলীর অনুশীলন করা আর মানুষের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক কার্য্য প্রণালীর আলোচনা করার ফল সমতুল্য। মানব-তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে, ক্রমেতেই

সব জানতে পারবে—এই জগতের রহস্য, জগতের অনিত্যত্ব, জড়ের নশ্বর শক্তি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতি সমস্তই জানতে পারবে।"

শরৎ অবজ্ঞাভরে বলিল—"আচ্ছা বেশ, আগে মানব-তত্ত্ব অধ্যয়ন ক'রে যাই তারপর যদি বুঝতে পারা যায় যে, 'ঈশ্বর আছে' তখন না হয় বলা যাবে 'ঈশ্বর আছে'। কিন্তু এটা স্থির যে, সে 'তখন' কখনও আসবেন না।

নবীনচাঁদ বলিলেন—"দেখছি, শেষে সত্যই তুমি একটা নাস্তিক হ'য়ে দাঁড়ালে। দেখ শরৎ তুমি যে শিক্ষা পেয়ে এই রকম নাস্তিক হয়েছ, যে জড়বিদ্যার পরিচয় পেয়ে তুমি আত্মবিস্মৃত হয়েছ সেটা কিছু নয়, সেটা অতি ক্ষীণ, স্থায়ী-পরিনামহীন পদার্থ। তুমি শিক্ষিত ব'লে নিজেকে পরিচিত ক'রচ অথচ সামান্য একটা পদার্থের সামান্য শক্তি দেখে—একটা যুগ-যুগান্তর ধ'রে সুপ্রতিষ্ঠিত, সনাতন সত্যকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছ। এটা দেখছি তোমার শিক্ষার দোষ। তোমার এই ভ্রমপূর্ণ ধারণা মন থেকে দূর ক'রে দাও। আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন তাহলে নিশ্চয়ই তোমার এই ভ্রমাত্মক ধারণা দূর হয়ে যাবে। দেখ—তুমি একটা পরাধীন জাতির একজন এবং ব্যাপকভাবে এখনও কিছু তোমার জাতের মধ্যে জড়বিদ্যার আলোচনা বা উন্নতি আরম্ভ হয়নি, তুমি নিজেও কিছু আবিষ্কার ক'রে ওঠনি তবে—অন্য, অন্য স্বাধীন ও ভিন্নধর্মীয় বিদ্যা ও নানারকম বৃত্তান্ত আলোচনা ক'রে তোমার এই দশা উপস্থিত। দেখ স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সমস্তই বিভিন্ন। এক স্থানের বা এক পাত্রের পক্ষে যেটা অতীব উপযোগী অন্য স্থান বা অন্য পাত্রের পক্ষে সেটা অতীব অনুপযোগী। একের সুধা অন্যের পক্ষে

বিষ, এক ভাষার প্রশংসা অন্য ভাষায় গালিগালাজ। এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগেনা। এক ঔষধে সকল রোগ সারে না। তারপর আরও একটা বিশেষ বিবেচনা করে দেখ'—ব্যষ্টিভাবে না বলে সমষ্টিভাবে আমি তোমাকে, মানব-চরিত্রের একটা অতি গূঢ় ও প্রকৃত রহস্যের কথা বলছি। দেখ—মানুষের এক-একটা সময় এমন আসে যখন তারা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়ে! মানুষদের মধ্যে কোনও, কোনও জাতি শ্রীভগবানের কৃপায় পূর্ব্ব-সুকৃতির ফলে এক, এক সময়—বিদ্যায়, বিজ্ঞানে, অর্থে, সামর্থ্যে, যুদ্ধ-বিদ্যায় ইত্যাদি অনেক রকমে উন্নতি লাভ ক'রে সর্ব্বাঙ্গীন-উন্নতির চরম সীমায় ওঠে। সেই রকম সময় কতকটা জড়-বিদ্যা লাভ ক'রে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ক'রে কেবলমাত্র জড়ের উপাসনা ক'রতে ক'রতে জড়ভাবাপন্ন হ'য়ে, তাদের ভেতর কতকগুলি লোক একেবারে নাস্তিক হ'য়ে গিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে আর কতকগুলি লোক ঈশ্বরকে একেবারে ভুলে যায়। বিদ্যা ও জ্ঞান অনন্ত, মানুষের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র—কাজেই, জ্ঞানের ও বিদ্যার যথার্থ মর্ম্ম বুঝতে না পেরে আর নশ্বর ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হ'য়ে তারা মনে ক'রে যে ঈশ্বর ব'লে বা ঐশ্বরিক-শক্তি ব'লে কোনও পদার্থ নেই—তারা তাদের নিজের শক্তিতেই পৃথিবী পরিচালিত ক'রচে। কিন্তু যেই তারা বিপদে পড়ে, যেই তাদের শক্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ দেশে কোনও বিপদ বা অশান্তি এসে উপস্থিত হয়, অমনি তাদের সেই আত্ম-বিস্মৃত ভাব কেটে যায়। উপমা স্বরূপ ধর—আর একটা প্রবল ও শক্তিশালী জাতি তাদের দেশ আক্রমণ ক'রে মহাযুদ্ধ উপস্থিত ক'রলে। তখন প্রথমটায় তারা, তাদের বড় গর্ব্বের জড়শক্তির আশ্রয় নিয়ে তাদের আক্রমণকারী বিপক্ষদের সঙ্গে

যুদ্ধ ক'রলে। কিন্তু কিছুকাল যুদ্ধের পর যেই তারা দ্যাখে যে, তাদের জড়শক্তি কিছুতেই বিপক্ষকে পরাজিত ক'রতে পারছে না এবং সেই সঙ্গে তাদের নিজেদের ধন, জন, শক্তি, যশ সমস্তই ধ্বংস হ'য়ে যেতে ব'সেছে তখনই অমনই তারা আকুল কণ্ঠে ব্যাকুল প্রাণে ঈশ্বরকে ডাকে --দলে, দলে উপাসনা-আগারে গিয়ে নতজানু ও নত-মস্তক হ'য়ে ঐশ্বরিক শক্তি ও করুণা ভিক্ষা করে। আবার আরও মজা এই যে, ঐ সব লোকই পূর্ব্বে যে সব জাতকে---আধ্যাত্মিক-অসভ্য, কাপুরুষ, দৈববাদী প্রভৃতি বাক্য ব'লে সভ্যতা ও পুরুষকার শেখাতে গেছল'— সেই সব জাতকে তখন তারা বলে যে---"ওগো আমরা ত' এই রকম বিপদে পড়েচি দেখছ এখন তোমরাও আমাদের মঙ্গলের আর বিপদো-দ্ধারের জন্যে ঈশ্বরকে ডাক, ঐশ্বরিক শক্তি প্রার্থনা কর।"

শরৎচন্দ্র, পিতার বাক্যে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। কোনও কথা না বলিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল, তৎপরে বলিল—"আপনি যাই বলুন বাবা, জড়ের শক্তি দেখে, আর পাঁচ রকম বিবেচনা ক'রে আপনার ঈশ্বরকে মানতে প্রবৃত্তি হয়না।"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"বাপু হে সসীম জড়ের শক্তি দেখে তুমি এত চমৎকৃত হয়ে গেছ কিন্তু যে অসীম শক্তির ক্ষুদ্র এক কণা আশ্রয় ক'রে জড়ের শক্তি; সেই অসীম, অনন্ত চৈতন্য-শক্তির পরিচয় নিতে চেষ্টা কর দেখি—তাহলে আরও কতদূর চমৎকৃত হবে সেটা ভাষায় কি ব'লব? আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রে ব'লেছে যে—জড়ের ওপরে চৈতন্য। তুমি হিন্দু হয়েও হিন্দুশাস্ত্র কিছু পড়োনি, নিজের জাতীয়-বিদ্যার সঙ্গে তোমার কোনও রকম পরিচয় হয়নি তাই তুমি অপরা-বিদ্যার আপাত—রমণীয় অস্থায়ী

সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে গেছ। তুমি আর ওসব জিনিস মাথায় রেখনা। আমাদের হিন্দু-শাস্ত্র অধ্যয়ন কর'। প্রাচীন আর্য্যঋষিরা যে সমস্ত কথা বলে গেছেন সেগুলি মেনে চলতে চেষ্টা কর। যথেষ্ট হয়েছে—আর অধঃপতনের পথে তোমায় নামতে দিচ্ছিনা।"

শরৎচন্দ্র অবজ্ঞাভরে বলিল—"মাপ ক'রবেন বাবা, আর আপনার ঐ আর্য্য ঋষিদের কথা তুলবেন না। তাঁরা ঋষিলোক, বনে থাকুন; এখানে আর তাঁদের আনবেন না—সহরে এলে তাঁরা আর দুদিনও বাঁচবেন না। আচ্ছা বাবা, আপনি পাঁচটা সভ্য লোকের সঙ্গে যা'হোক মিশেছেন, আপনি কি ব'লে আমায়, হিন্দু ধর্ম্মের বই পড়তে বললেন বা আপনার বড় সাধের, পুরাতন বন্ধু ঐ সব আর্য্য ঋষিদের কথা শিখতে ও মেনে চলতে ব'ললেন ? হিন্দু ধর্ম্মের বইতে আছে কি বা আপনার ঐ সব অসভ্য পুরাতন বন্ধু আর্য্য ঋষিরা জানে কি ? তারা গভীর বনে থাকতো, ফলমূল খেতো, বন্য জন্তুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রত—হাঃ, হাঃ, হাঃ। (পিতার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিল।) বুঝলেন বাবা, এদেশে কিংবা আমাদের জাতীয়-শিক্ষার মধ্যে শিক্ষা করবার বা গ্রহণ যোগ্য কোনও জিনিষ নেই। আপনার আর্য্য ঋষিদের বচন এবং হিন্দু-ধর্ম্মের গ্রন্থ, সমস্তই কুসংস্কার, অতিরঞ্জন ও বর্ব্বরতায় পরিপূর্ণ। আপনাদের ঐ "চৈতন্যই" আপনাদের অচৈতন্য ক'রেছে তাই আপনারা—যাকে দেখতে পাচ্ছেন সেই "জড়কে" নীচে নামিয়ে দিয়ে, যাকে দেখতে পাচ্ছেন না অর্থাৎ যেটা নেই, সেই স্বকপোলকল্পিত বা গাঁজার-খেয়ালে-অনুভবিত "চৈতন্যকে" ওপরে স্থান দিচ্ছেন।"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"তুমি কি ব'লছ হে! আমাদের কথা ছেড়ে

দাও, পাশ্চাত্য জ্ঞানী, পণ্ডিতরা পর্য্যন্ত এখন আমাদের শাস্ত্রের-মতের সমর্থন ক'রছেন। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের বিরচিত হিন্দু-শাস্ত্রের উক্তিগুলি অতি সত্য, অভ্রান্ত সত্য। জড়ের ও 'অপরাবিদ্যার অস্থায়ীত্ব ও অসারত্ব উপলব্ধি ক'রে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতরা অবধি এখন, আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের প্রাচীন ও সনাতন উপদেশগুলি সত্য ব'লে মেনে নিচ্ছেন। আর তোমাদের মতন স্বজাতিদ্রোহীরা সেই সব অমূল্য জিনিষকে উপেক্ষা ও অনালোচনা ক'রে নিজের মুখে নিজেই কালী মাখছ। তুমি আজ দূরে থেকে জড়-শক্তির পরিচয় পেয়ে এত মুগ্ধ হ'য়ে গেছ যে, নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তিকে পর্য্যন্ত না মেনে "চৈতন্যের" ওপর "জড়ের" স্থান নির্দ্দেশ ক'রছ বা চৈতন্যকে একেবারেই অস্বীকার ক'রছ—কিন্তু ঐ জড়-শক্তির আলোচনাকারী, জড়-শক্তির বহু-পরিচয়-আবিষ্কারকারী যারা, সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও এখন জড়ের ওপর চৈতন্যকে স্থান দিয়েছেন। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে যে—"ব্রহ্ম বা চৈতন্যের" অতিরিক্ত পদার্থ এ পৃথিবীতে নেই; চতুর্দ্দিকে যে সব "জড়-প্রকৃতি" দেখতে পাওয়া যায় সে সব অসীম "চৈতন্যের" সসীম আভাষ মাত্র"—পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত ডেকার্টে ও বার্কলে এই মত সমর্থন করেন। এঁরা দার্শনিক ব'লে যদি এঁদের কথা ততদূর মনঃপুত না হয় তাহলে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার অলিভার লজ্ ও সার উইলিয়ম ক্রুক্‌সের কথার আলোচনা কর। এঁরা দুইজনে বৈজ্ঞানিক, জড়শক্তির আলোচনা ক'রে এবং তাতে সাফল্য লাভ ক'রে এঁদের দুইজনের জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হ'য়েছে; এঁরাও ঈশ্বর ও হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, জড়ের ওপর চৈতন্যকে স্থান

দিয়েছেন এবং তাঁদের এই মত প্রমাণিত করেছেন। হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত পরলোক সম্বন্ধে মহাত্মা কনান্‌ডয়েল যে সমস্ত তথ্য বহু সাধনার ও আলোচনার পর প্রকাশ ক'রেছেন সে সমস্ত পাঠ ক'রে মনে হয় যে, কি বিরাট, কি প্রাচীন, কি সনাতন এই হিন্দুধর্ম্ম; কত সত্য, কত অভ্রান্ত, কত সুপ্রতিষ্ঠিত এই সব প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের জ্ঞান ও মত—'ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা' বহু সাধনার পর, শিক্ষারাজ্যে বহুদূর অগ্রসর হবার পর, 'যার কতকাংশ' মাত্র জানতে সক্ষম হয় এবং হিন্দু-ধর্ম্ম অবলম্বন করবার পর, হিন্দুর আচার-ব্যবহারে জীবন যাপন করবার পর, হিন্দুর শিক্ষা গ্রহণ করবার পর,তবে 'যার সম্পুর্ণ-অংশ'জানবার অধিকারী হয় এবং জানতেও সক্ষম হয়। বাপু হে কোনও জিনিষ পরীক্ষা ক'রে না দেখে তার সম্বন্ধে এমন বিপরীত ধারণা ক'রে ব'স কেন? যারা ব্রহ্মকে মানেনা বা তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করেনা তারা এ পর্য্যন্ত কোনও প্রমাণ উপস্থিত ক'রে দেখিয়ে দিতে পেরেছে কি যে, 'ঈশ্বর নেই'! পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক এদেশীয় মহাত্মারই এইটে হচ্ছে মহৎ দোষ যে, 'জিনিষটা কি?' সেটা পরীক্ষা ক'রে না দেখে, তার সঙ্গে কোনও পরিচয় না ক'রে সেটার সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত একটা বিপরীত ধারণা ক'রে ব'সবে আর গাঁ গাঁ ক'রে চিৎকার করবে। এ রকম করাতে কি অসভ্যতার পরিচয় দেওয়া হয় না? এ ছাড়া—ওই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের ধর্ম্মের আর ধর্ম্মগ্রন্থের এত গ্লানি করে যে, ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী লোকে ততটা ক'রতে সাহস করে না।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"পিতামহাশয়, যে সকল লোক আপনার বড় সাধের হিন্দু-ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মপুস্তকের গ্লানি করেন তাঁরা ঠিক কাজই

করেন, তাঁরা আমার ধন্যবাদের পাত্র। 'যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা' যেমন আপনার হিন্দুধর্ম্ম, তার ধর্ম্মপুস্তকও তো তেমনি।"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"নিজেকে সভ্য ব'লে পরিচিত করবার চেষ্টা কর আর নিজের জাতীয়-জিনিসের অপমান কি ক'রে কর'? তোমরা এ রকম অসভ্যতার কাজ কর কিন্তু কই তোমাদের নবগুরু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতরা (শুধু পণ্ডিতরা কেন, সাধারণ লোকেও তো) এ রকম করেন না। তাঁরা, তাঁদের জাতীয়-জিনিসের অপমান বা গ্লানি কখনও তো করেন না-ই; বরঞ্চ তাঁরা—ভিন্ন-জাতি আমরা, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা ক'রে সেই সকল গ্রন্থের সত্যতা, প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আবিস্কার ক'রে দেন। আর পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর এদেশীয়রা স্ব-জাতীয় গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণ করে দেওয়া দূরে থাক, সে সকলকে গাঁজাখুরী ব'লে উড়িয়ে দিয়ে—নিজেকে সভ্য ব'লে পরিচিত করবার বৃথা চেষ্টা ক'রে আর—আরও অসভ্য ব'লে জগতের কাছে পরিচিত হয়। আমাদের অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মহা-পণ্ডিতের কি মত তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দি শোন। পৃথিবীর সর্ব্ব গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ, মহাগ্রন্থ সাহিত্য-কাব্য-অলঙ্কার-দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি প্রভৃতির চরম বিকাশ-স্থল শ্রীগীতা পাঠ ক'রে জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত ডব্লিউ, হম্বোল্ডট (W. Humto dt) সাহেব বলেছেন যে—'এই গীতা গ্রন্থে যে মহৎ ও উচ্চ ভাব আছে জগতের কোথাও তা নাই। এর চেয়ে মহৎ ও উচ্চভাব এ পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। ভারতবর্ষের এই পুস্তকখানি আমি প্রথমে যখন পাঠ করি তখন নিজেকে ধন্য মনে করে-

ছিলুম এবং মনে, মনে ভেবেছিলুম যে, আমার অদৃষ্ট কি সুপ্রসন্ন যে এই পুস্তকখানি পাঠ করবার জন্য আমি আজও বেঁচে আছি।' হায়, হায়, আমি ভুল—মহাভুল বুঝেছিলুম তাই এই সকল গ্রন্থ তোমায় না পড়িয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতে গেছলুম। পূর্ব্বে, সকলে যখন তোমার চাল-চলন সম্বন্ধে আমায় সাবধান ক'রতে গেছল' তখন আমি তাদের কারোর কথায় কর্ণপাত করিনি। তারপর গত কয়েক মাস হতে তোমার বে'চালে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়াতে আমি তোমার চাল-চলন লক্ষ্য করে যাচ্ছিলুম কিন্তু তুমি যে এতটা অধঃপাতে গেছ সেটা বুঝতে পারিনি। আজ তোমার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তুমি এ হয়েছ কি? তোমার দ্বারা, ভবিষ্যতে আমাদের কতই না জাতীয় অনিষ্ট হবে।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"বাবা, আপনি যে নেচে ওটবার মতন হ'য়েছেন। আমি হয়েছি—কি? আমাতে কি দেখতে পেলেন যাতে আপনার প্রাণে সহসা এই নর্ত্তন-স্পৃহা জেগে উঠলো?"

নবীনচাঁদ মহা আক্ষেপসূচক স্বরে বলিলেন—"দোষ আমার, দোষ আমার—আমি সঙ্গদোষে আগে বুঝতে পারিনি তাই তোমার জীবন ভিন্ন প্রকারে গঠন ক'রতে চেষ্টা করেছিলুম—যাই হোক, দোষ আমার। কিন্তু আর নয়। এ শিক্ষা তোমায় আজ থেকেই পরিত্যাগ ক'রতে হবে। আমাদের ভেতর এ শিক্ষাটা ব্যাপক-ভাবে বর্ত্তমান সময় কিছুতেই খাপ খাবেনা। এটা আমাদের ভেতর কেবলই ভেঙ্গেছে এবং একমাত্র দাস ভিন্ন আর কিছুই গড়তে পারেনি। কার্য্যে, বাক্যে, মনে দাস ক'রে দিচ্ছে। যে দিক দিয়েই দেখ—এ শিক্ষায় অল্প-শিক্ষিত থেকে

আরম্ভ ক'রে আর অধিক-শিক্ষিত অবধি অধিকাংশকেই পরিণামে পরের হুকুম তামিল ক'রতে ক'রতে জীবন কাটাতে হয়। যে দাস, পরের হুকুম তামিল ক'রতে, ক'রতে যার জীবন অতিবাহিত হয় সে নিজেরই কোনও উন্নতি বিধান করতে পারেনা তা স্বজাতীয়ের বা জগতের কি উন্নতি বিধান ক'রবে বল ? আর একটা জিনিস বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখবার বিষয়—এই পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়েই আমাদের দেশের সব জাতের লোক একবৃত্তি-অবলম্বী হয়েছে অর্থাৎ—দাসত্বকেই সার ক'রেছে—যে যার জাত-ব্যবসা পরিত্যাগ ক'রেছে। আর এই কারণেই আমাদের জাতটা অবনতির নিম্নতম স্তরে নেমে গেছে। এই মহা-অবনতির পথ রোধ করবার জন্যই আমাদের দূরদর্শী পূর্ব্বপুরুষদের বিধানানুসারে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নামে বিভাগ হয়েছে। চারটে দল, জাতীয় উন্নতির চারটে দিক আশ্রয় ক'রে জাতীয়-উন্নতি বিধান ক'রত। এ নিয়ম এখন উঠে গেছে তাই এই দুর্দ্দশাও উপস্থিত হয়েছে। এ নিয়মটা যদি থাকতো তাহলে কখনই এ রকম ভাবে সর্ব্বশ্রেণীর লোকে, একমাত্র দাসত্ব আশ্রয় ক'রতনা। কি ভয়ানক অবস্থা একবার ভেবে দেখ দেখি—একটা বিরাট জাতের অধিকাংশ লোকই কলম পিষতে লেগে গেছে; আর জীবন-ধারণের জন্য বাকী সমস্ত প্রয়োজন সরবরাহ করবার জন্য দেশে আর লোক নেই—সকলেই জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, আদা-জল খেয়ে কোমর বেঁধে, কলম নিয়ে—অন্য জাতের লাভের খাতায় হিসাব রাখছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগের নিয়ম যেদিন এদেশে ফিরে আসবে সেদিন থেকে এদেশের উন্নতিও আরম্ভ হবে। পরস্পরকে

ঘৃণা ও নির্য্যাতন করবার জন্য এটার সৃষ্টি হয়নি—জাতীয়-উন্নতি সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য আপনা-আপনি বিভাগ করে নেবার জন্য, যোগ্য-লোকে সম্মানিত হবার জন্য এবং সর্ব্ব রকমে জাতীয় উন্নতি হবেই-হবে ব'লে এর সৃষ্টি। তুমি দেখে নিও এই শ্রেণী-বিভাগের নিয়মটা আবার আমাদের দেশে ফিরে আসবে কিন্তু Via Europe এই পাশ্চাত্য-জাতিরাই এই নিয়মটা একটু রকম-ফের ক'রে সাদরে গ্রহণ ক'রে তাদের দেশে প্রচলিত ক'রবেই ক'রবে—কারণ, তাদের মতন উন্নতিশীল ও স্বদেশ-হিতৈষী জাতি এ রকম ভাল জিনিসকে কথনই উপেক্ষা ক'রবে না। তারপর, তাদের অনুকরণকারী-আমরা, আমাদের নিজস্ব জিনিসকে—'সাহেবদের দেওয়া, ওহো সাহেব-দের দেওয়া ব'লে আনন্দ ক'রে গ্রহণ ক'রব। শরৎ, তোমাকে কাল থেকে আর কলেজে যেতে হবে না; তুমি আমার ব্যবসা-বাণিজ্য দেখা শোনা কর। যে শিক্ষা পেয়ে লোকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে অমান্য করে; যে শিক্ষা পেয়ে লোকে মাথার ঠিক রাখতে পারেনা—জাতীয়-বিশিষ্টতার অধিকাংশ জিনিস পরিত্যাগ করে; যে শিক্ষা আমা-দের ভেতর কেবল ভাঙ্গতেই পারে; যে শিক্ষা তোমার মতন জীব সৃষ্টি করে; যে শিক্ষায় আমাদের সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে বিপরীত সহায়তা পাওয়া যায়; যে শিক্ষায় আমাদের ধর্ম্মের কোনও অনুশাসন নেই; যে শিক্ষায় আমাদের ধর্ম্মানুমোদিত নীতি-শিক্ষা এবং আসল-শিক্ষা পরমার্থ বিষয়ে কোনও শিক্ষা নেই সেই Godless শিক্ষা পেয়ে কোনও লাভ নেই।"

শরৎচন্দ্র বিস্ময়ভরে চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—"সে কি বাবা,

আপনি—এই মহা উন্নত ; বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে গর্ব্বিত পাশ্চাত্য-জাতির শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয় ব'লছেন ! য়্যাঁ ! ! এ শিক্ষার কি কোনও মূল্য নেই ?"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"আছে—যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে বর্ত্তমানে এর কোনও মূল্য নেই। আমাদের পক্ষে এ শিক্ষাটা বর্ত্তমানে মহা অনিষ্টকারী। এদেশে এ শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পর যে ভাবে এটাকে দেশের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে তার ঠিক বিপরীত ভাবে প্রয়োগ ক'রে অধিকারী ভেদে বিতরণ ক'রলে পরে এ শিক্ষার সার্থকতা হোত', এ শিক্ষার মূল্যও নিরূপিত হোত'। সকলকেই আগে ঘরের বিদ্যায় রীতিমত শিক্ষিত করে তারপর বাইরের বিদ্যে যদি দেওয়া হোত' এবং 'Second Language' কোনটা হওয়া উচিত'—এ বিবেচনটা করা হোত' তাহলে আর আজকে তোমার মতন লোক সৃষ্টি হোতনা এবং এ শিক্ষটার বাজার-দরও এত প'ড়ে যেতনা। এই মহা উন্নত পাশ্চাত্য-জাতির শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত কিন্তু আগে প্রাচ্য-বিদ্যায় অর্থাৎ নিজের দেশের, নিজের জাতের বিদ্যায় উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ ক'রে, এবং শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে নিজ, নিজ, জাতীয়-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে সেই শিক্ষাটা সার্থক ক'রে, তারপরে। নচেৎ যে উপায়ই অবলম্বন করা যাকনা কেন কিছুতেই আসল-জাতীয়-উন্নতি হবে না। এই একাকার-ভাব ত্যাগ করাতেই হবে। তুমি দেখ নিও শরৎ—যে জাতি-ভেদ ভারতের পরাধীনতার কারণ ব'লে নির্দ্দেশিত হয়েছে সেই জাতি-ভেদ থেকেই ভারতের মুক্তি হবে। আজ তো জাতি-ভেদ নেই বল্লেই হয়, আজতো সকল জাতই এক বৃত্তি অবলম্বন করেছে কিন্তু দেশ

তাতে উন্নতির শিখরে উঠেছে না অবনতির নিম্নতম স্তরে নেমে গেছে ? কিন্তু যদি কখনও সে শুভদিন উপস্থিত হয়, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি —স্ব, স্ব জাতীয়-বিশিষ্টতা রক্ষা করে অর্থাৎ নিজ, নিজ জাতীয়-বৃত্তি অবলম্বন করে তাহলেই দেশের উন্নতি হবে—নচেৎ কোনও মতেই নয়।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"বাবা এই জাতিভেদ, এই পরস্পরের, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও নির্য্যাতন, এই থেকেই আমাদের দেশের অবনতি। এ থেকে কি ক'রে দেশের উন্নতি বা মুক্তি—"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"পরস্পরের, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও নির্য্যাতন করবার স্পৃহাটা নীতি-শিক্ষার ও স্বজাতি-প্রীতির অভাবে হ'য়েছে। যদি সমস্ত একাকার হ'য়ে যায় আর সেই সঙ্গে নীতি-শিক্ষার ও স্বজাতি-প্রীতির অভাব থাকে তাহলে কি কোনও মহা শক্তিমান পুরুষ কখনও কোনও কালে—এই পরস্পরের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও নির্য্যাতনের স্পৃহাটা দূর ক'রে দিতে পারেন ? জাতি-ভেদ জিনিসটা সৃষ্টি হয়েছে দেশের সর্ব্ব রকম উন্নতি সাধিত হবে ব'লে—এক জাতি, ভিন্ন জাতিকে ঘৃণা ও নির্যাতন ক'রবে বলে নয়। কে কোন জাতি, সেটা টের পাওয়া যায় তার জাতীয়-বৃত্তি দেখে। তাঁত বোনে ব'লে তাঁতি—তাঁতি হ'য়েছে। কাপড় কাচে ব'লে ধোপা—ধোপা হ'য়েছে। গৃহ-নির্ম্মানের ও নিত্য-প্রয়োজনীয় অনেকবস্তু প্রস্তুত ক'রে ব'লে ছুতোর —ছুতোর হ'য়েছে। লাঠি খেলে ব'লে,প্রহরীর কাজ করে ব'লে বাগদী —বাগদী হ'য়েছে। দেশ রক্ষা ক'রে বলে, যুদ্ধ ক'রে বলে ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয় হ'য়েছে। হিসাব নিকাশ রাখে ব'লে কায়স্থ—কায়স্থ হ'য়েছে।

দেশের বাণিজ্য রক্ষা করে ব'লে বৈশ্য—বৈশ্য হ'য়েছে। লেখাপড়া শেখে, ধর্ম্মচর্চ্চা করে ; শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া শেখায়, অশক্ত ও স্বেচ্ছায়-অশক্তকে ধর্ম্মচর্চ্চা করায় ব'লে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ হ'য়েছে। এই যে পরম্পর 'হওয়া-হোয়ি' এটার আলাদা কিছু হাত, পা কখনও ছিল না, এখনও নেই। তারপর সুবিধাবাদী ও স্বার্থবাদী মানুষ, বরাবর প্রত্যেক জিনিসেরই যেমন বিকৃত অর্থ ক'রে নিয়ে সেটার অপ-প্রয়োগ করে—এটার বেলাও তাই ক'রেছে। এটাতো একটা সমাজিক বিধান ; কত বড় বড় ধর্ম্মের পর্য্যন্ত ঐভাবের বিকৃত অর্থ ও অপ-প্রয়োগ হ'য়ে আসছে। আমাদের এখন উচিত এই জিনিসটাকে বিকৃততার কবল থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে, সংস্কৃত ভাবে দেশের ওপর প্রয়োগ করা। আর দেশবাসী সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে—এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তন্তুবায়, সূত্রধর প্রভৃতির মধ্যে কেউ বড় নেই, কেউ ছোট নেই—এরা সবাই সমান। জাতীয়-উন্নতির জন্মে এদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। তবে প্রতিভার সম্মান আছেই—যে, যার নিজ নিজ বিভাগে উন্নতি লাভ ক'রবে সে সেই বিভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোক ব'লে সম্মান পাবে।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"কেন এখন বাইরের শিক্ষা আমাদের ত্যাগ করা উচিত তাতো বললেন এবং সেটা ত্যাগ ক'রে ঐ শ্রেণী-বিভাগ ক'রলে দেশের উন্নতি হবে তাওতো বললেন। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এতই যদি বুজেছেন তাহলে আমাকে এ শিক্ষা গ্রহণ করিয়েছিলেন কেন ?"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"সংস্কারের বশে আর সঙ্গদোষে। দেখ প্রথম

যখন এ শিক্ষাটা এদেশে আসে তখন নিজেদের অসভ্য জ্ঞান ক'রে সভ্য হবার জন্যে এবং এটা অর্থকরী-বিদ্যা ব'লে অনেকে সাদরে এটা গ্রহণ করে। প্রথমে এ শিক্ষাটা এর বাহ্যিক চাকচিক্যে আমাদের অনেক দেশবাসীর মনে এমন চমক লাগিয়ে দিলে যে—তাঁরা, বাঙ্গালীর ছেলের স্বদেশ-জাত বস্ত্র পরার ও স্বদেশীয় ক্রীড়া করার প্রথার ওপর পর্য্যন্ত দোষ ও অসভ্যতা দেখলেন। অনেক দেশবাসী দেশী ভাষা চর্চ্চার প্রথাতে অসভ্যতা দেখে তার চর্চ্চায় এমন ভাবে বিরত হলেন যে—বিদেশী লোক তাই দেখে দয়ার্দ্র চিত্ত হ'য়ে নোটিশ বার ক'রে আমাদের এ বিষয়ে সাবধান করিয়ে দিয়ে, আমাদের দেশী-ভাষার চর্চ্চার উপদেশ আমাদেরই দিলে। তখনও আমাদের জ্ঞান হয়নি। তারপরেও লোকে, এ শিক্ষাটা নিজে গ্রহণ ক'রত ও আত্মীয় স্বজনকে গ্রহণ করাতো কারণ এটা অর্থকরী বিদ্যা ছিল এবং এটা গ্রহণ করা বিষম সংস্কারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছল'। আমিও ঐ সংস্কারের বশে এবং আমার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গ-দোষে তোমায় ঘরের বিদ্যায় শিক্ষিত না ক'রে বাইরের বিদ্যায় শিক্ষিত ক'রতে গেছলুম। আমায়, অনেক প্রাচীন লোকে এ কার্য্যে নিরস্ত হবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, আমি কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত করিনি। আমি তখন মনে ভাবলুম যে—'এইতো আমি নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষা কিছু, কিছু পেয়েছি কিন্তু কই আমারতো মাথা বিগড়ে যায়নি।' আমি এই ভেবে তোমায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত ক'রিয়েছিলুম। কিন্তু তখন আমার ভাবা উচিত ছিল যে, আমি পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছি বটে কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমার প্রাচ্য-বিদ্যা লাভ হয়েছিল। আমি পরিণত বয়েসে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও

মহাজনের গ্রন্থ পড়েছি বটে কিন্তু তার আগে প্রাচ্য-শিক্ষায় উত্তমরূপে শিক্ষিত হ'য়ে স্বধর্মে ও স্বজাতীয় আচার-ব্যবহারে আমার একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছল তাই আমার বেশী অনিষ্ট হয়নি। আমার প্রথম পরীক্ষা সুমধুর মাতৃ-ভাষায় উচ্চারিত হয়েছিল ; পরকালের পথে উন্নতি লাভ ক'রব ব'লে, পর-ধর্ম্মকে ভয়াবহ জ্ঞান ক'রে স্বধর্ম্মে আস্থাবান হব ব'লে প্রথমে স্ব-ধর্ম্মের নীতি আমার কণ্ঠস্থ হয়েছিল তার পরে আমি ভিন্ন-ধর্ম্মের আচার, ব্যবহার রীতি নীতি কিরূপ, সেটা পাঠ ক'রেছিলুম। তাই আমার ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয় নি। এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করব, সাদরে গ্রহণ ক'রব কিন্তু তার আগে আমাদের উচিত—সমগ্রজাতকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী ক'রে কয়েকটা শ্রেণীতে বিভাগ ক'রে দেওয়া আর সর্ব্বাগ্রে প্রাচ্য-বিদ্যায় শিক্ষিত করা। স্ব, স্ব বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ ক'রে দিলে এক শ্রেণী ধর্ম্ম ও বিদ্যা শিক্ষা দেবে ও তাইতে নিজেরা শিক্ষিত হবে এক শ্রেণী মল্ল বিদ্যা শিক্ষা ক'রবে, সমগ্র জাতির স্বাস্থ ও সবলতা বিধানের দিকে দৃষ্টি রাখবে ( তাহলেই বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালীর ধন, প্রাণ, ইজ্জৎ রক্ষার জন্য পশ্চিমে-দরোয়ান রাখতে হবেনা ; গুণ্ডা ও পাঠানের লাঠি খেয়ে বিনা প্রতিশোধে ঘরের কোনে গিয়ে আঘাত-প্রাপ্ত স্থানে তেল মালিস ক'রতে হবেনা, দুর্ব্বৃত্ত লোকে রমণীদের আক্রমণ ক'রলে—'দাঁড়াও ব্যাটা লাঠি আনচি'—ব'লে পালাতে হবেনা এবং এত চটপট্ পিলেও ফাটবেনা ) ; এক শ্রেণী লুপ্ত শিল্প রক্ষা ও শিল্পোন্নতির ভার নেবে ও অধিকারী ভেদে শিক্ষা দেবে ; এক শ্রেণী বাণিজ্য—জাতির উন্নতির প্রধান উপায় বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হবে ; এক শ্রেণী হিসাব, কিতাব, নকল-করা প্রভৃতির বৃত্তি গ্রহণ ক'রবে ;

এক শ্রেণী শ্রম-জীবির বৃত্তিতে নিযুক্ত হবে ; এক শ্রেণী কৃষি-কার্য্যের বৃত্তি অবলম্বন ক'রবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবং সকল শ্রেণীর লোকই পল্লী-সংস্কার, কৃষি ও বাণিজ্য ব্যাপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংযুক্ত থেকে এগুলির উন্নতির জন্য প্রাণপণ সহায়তা ও চেষ্টা ক'রবে। আমাদের সকলেরই পল্লীগ্রামে একটা আস্তানা এবং কৃষিকার্য্যের জন্য কতকটা জমি রাখতেই হবে। তাহলেই কৃষি-কার্য্যের উন্নতি, নিজে তার ফলভোগ এবং অপরকে বাড়তি ফলভোগ করান হবে। অর্থাৎ সমগ্র জাতটারই তাহলে কতকাংশে বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হওয়া হবে এবং সমগ্র জাতটা ভেজালহীন খাঁটী আহার্য্য পেয়ে দৈহিক, মানসিক, সকল রকমেই উন্নতি লাভ করবে ; অকাল-মৃত্যু ও চির-রুগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে। যদি কখনও এই শুভদিন উপস্থিত হয়, যদি এই বিশাল জাতিটা এই রকমভাবে কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে জাতীয় উন্নতির প্রধান কটা দিক অবলম্বন ক'রে স্ব, স্ব বৃত্তি অনুসারে কাজ ক'রে তাহলে অতীতের সেই মহা-উন্নত ও গৌরবান্বিত জাতি ব'লে জগতের সম্মুখে সগর্ব্বে দাঁড়াতে এদের এক চতুর্থাংশ-শতাব্দী সময়ও লাগেনা। এই রকম ভাবে বিভক্ত হ'য়ে, স্বদেশের শিক্ষা লাভ ক'রে, স্বদেশের শিল্প-বানিজ্য-কৃসি সম্বন্ধে শিক্ষা উত্তমরূপে লাভ ক'রে আরও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, আরও উন্নতি লাভ করবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়ত' সাগরপারে গিয়ে বিদেশের শিক্ষা গ্রহণ ক'রবে। এই বিশাল পৃথিবীতে নানা উন্নত জাতি র'য়েছে, সব জাতিই সব কার্য্যে পারদর্শী ও উন্নত নয়। আমাদের দেশবাসীরা আগে নিজের দেশের বিদ্যায় শিক্ষিত হ'য়ে, নিজের ঘরের জিনিস বুঝে

নিয়ে হয়ত' দেখলে যে, 'ইংলণ্ড বাণিজ্য ব্যাপারে খুব উন্নত', তখন যাদের উপর বাণিজ্যের বৃত্তির ভার আছে তারা ঐ বিদ্যা শিক্ষার জন্য কতকগুলি যোগ্য লোককে ইংলণ্ডে পাঠাবে। যদি দেখলে যে 'শিল্প প্রস্তুত বিষয়ে জারমণী খুব উন্নত'; 'মল্ল ও কৃষি বিদ্যায় আমেরিকা খুব উন্নত', তখন আমাদের দেশের ঐ সকল বৃত্তি-অবলম্বীরা তাদের ভিতর যোগ্য লোকদের ঐ সকল দেশে, ঐ সকল উন্নত-প্রণালী আয়ত্ত করবার জন্য পাঠিয়ে দেবে। (তাব'লে, বিলাসিতা ও মদ্যপানে প্যারিস-বাসী খুব উন্নত ও পারদর্শী ব'লে অবশ্য সে বিদ্যাটা আয়ত্ত করবার জন্য কোনও শিক্ষার্থী পাঠাতে হবেনা) এই রকম ক'রে নানাজাতির বিদ্যা আয়ত্ত হবে এবং নানাজাতির পরস্পরের মধ্যে ভাবে আদান প্রদানও হবে। কিন্তু এখন যে ভাবে হচ্ছে—অর্থাৎ নিজের দেশের শিল্প, বাণিজ্য, বৃত্তি ও সর্ব্ব বিদ্যাকে ধ্বংসের পথে চালিয়ে দিয়ে পরের বিদ্যাকে লোকে আয়ত্ত ক'রতে যাচ্ছে, তাতে অবশ্য ভিন্ন জাতির সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান হচ্ছে বটে কিন্তু নিজের জাতটা ধ্বংসের পথে নেমে যাচ্ছে এবং এই আদান প্রদানের ভাবটাও উভয় পক্ষে সমান হচ্ছেনা—একপক্ষে ভিখারীর ভাব অন্যপক্ষে দানে-পরাঙ্মুখ গর্ব্বিত ধনীর ভাব দাঁড়াচ্ছে। এই যে, যাদের শিক্ষা তোমরা গ্রহণ ক'রছ তারা কি তাদের দেশের ও জাতির মুক্তির জন্য তাদের স্বদেশীয় বিদ্যা চর্চ্চা বন্ধ ক'রে দিয়ে বিদেশের বিদ্যা শিক্ষা ক'রছে? তাদের শিক্ষা তোমরা কি রকম ভাবে গ্রহণ ক'রছ? তারা যা ক'রছে তোমরা তা ক'রছ কোথায়? এই রকম বিকৃতভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ক'রেছে বলেই আজ সে শিক্ষাটা এই রকম বিকৃত ফল দিয়েছে। যদি যথার্থই তাদের শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে

তাহলে সেই দণ্ডেই সে শিক্ষা গ্রহণ করা একেবারে ত্যাগ ক'রতে। এখনও এ অজ্ঞানতা, এ মোহ কেন—অনেক দিন তো হয়ে গেল। অর্থকরী? এটা শিখলে চট্ ক'রে অর্থ হয়? কই? এর সে অর্থকরী প্রভাবই বা কোথায়? আতস্-বাজীর রোশনাই বেশীক্ষণ থাকেনা, শিশিরের জল অতি ক্ষণস্থায়ী। মাষ্টার-অফ-আর্ট পঞ্চাশ টাকা মাইনের জন্তে ছুটোছুটি ক'রে অর্দ্ধেক জীবনি-শক্তি নষ্ট ক'রে ফেলছে। যে ভুলে, আমরা চলচি সে ভুল ভাঙ্গে, ভাঙ্গো, এখনই ভাঙ্গো—নইলে গেল, গেল সব গেল।

নবীনচাঁদ এতক্ষণ বকিয়া গেলেন বটে কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইলনা। তাহা শরতের এক কান দিয়া ঢুকিয়া অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া গেল। শরৎচন্দ্র, পিতার কথাগুলি শুনিতেছিল আর মনে মনে ভাবিতেছিল যে—আজ আচ্ছা এক মুস্কিলে পড়লুম দেখছি। এ বুড়োর বকুনি যে আর থামেনা দেখছি। আচ্ছা, তুমি বোকে মরগে; আমার কলাটা। আমি তোমার কথাও শুনছিনা আর সেই মত কাজও ক'রছিনা। আমি এত পরিশ্রম ক'রে, এত কাল ধরে যা সভ্যতা-সম্মত আচার, ব্যবহার শিখলুম সেটা কি তোমার মতন অসভ্য ও নির্ব্বোধের কথায় ত্যাগ ক'রব মনে করেছ? কখনই নয়, কখনই নয়। বরং তোমার মত বৃদ্ধ-নির্ব্বোধ যা উপদেশ দেয় ঠিক তার উলটো করা উচিত। শরৎচন্দ্র এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল; তাহার পিতার বক্তব্যের শেষের দিকটা সে একেবারেই শুনিল না। নবীনচাঁদ যখন বক্তব্য শেষ করিয়া নীরব হইলেন তখন শরৎচন্দ্রও নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ভাবিল যে—আমি যদি এ সময় কিছু না ব'লে চুপ

ক'রে থাকি তাহলে বাবা নিশ্চয়ই ভাববে যে, আমি তার কথাগুলো শুনিনি—নাঃ এখন বুড়োকে চটান' হবেনা। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে যে, পূজনীয় পিতার কথা সুবোধ বালকের ন্যায় মন দিয়া শুনিতেছিল, তাহার প্রমাণ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল—"আচ্ছা বাবা, আপনি যে ব'ললেন—'পাশ্চাত্য-শিক্ষায়-শিক্ষিতরা তাদের বাপ,মার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে পড়ে; বাপ,মার কোনও কথা শোনে না'—আপনার এটা ভুল ধারণা, মহা ভুল ধারণা। এই দেখুন না কেন—আমি না হয় অশিক্ষিতা আর অগঠিত-চরিত্রা ব'লে মার কথা শুনিনা; আমি কিন্তু আপনার কথাতো সবই শুনি।"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"বাপুহে, তুমি আমার দু'একটা কথা যা শোন সেটা কি আমায় ভক্তি-শ্রদ্ধা কর ব'লে—না—আমার সম্পত্তির লোভে? আমি যদি ধনী না হতুম, আমি যদি তোমার গরীব-বাপ হ'তুম তাহলে তুমি, আমায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করা দূরে থাক—লোকের কাছে আমায় বাপ ব'লে পরিচয় দিতেনা—হয়ত বাপ বলে স্বীকারই ক'রতেনা। এ নেহাৎ এত বড় একটা সম্পত্তির লোভ রয়েছে তাই নিরুপায় হ'য়ে, অগত্যা বাপ ব'লে স্বীকার কর বা পরিচয় দাও। তোমরাত বাপকে ভক্তি কর না বা ভালবাস না; বাপের সম্পত্তিকেই ভালবাস আর ভক্তি কর। বাপ বেঁচে থাকতে থাকতেই, সে মরে গেলে, তার সম্পত্তি উড়িয়ে কি রকম ফুর্ত্তী ক'রবে তার ফর্দ্দ কর। ব্যবসা-কার্য্যে-অনভিজ্ঞ ধনী ব্যবসায়ী তার অভিজ্ঞ ও রোজগারী কর্ম্মচারীকে যেমন ভালবাসে,তোমরা বাপকে ঠিক তেমনি ভালবাস। আমরা সেকেলে অসভ্য লোকেরা কিন্তু নিজের প্রাণকে যেমন ভালবাসি আমাদের বাপকে ঠিক তেমনি ভালবাসতুম—

ইষ্টদেবতাকে যেমন ভক্তি করি বাপকে ঠিক তেমনি ভক্তি ক'রতুম—আর, এক বিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়, বাপকে যথার্থই মনে করতুম যে :—

পিতাঃ স্বর্গ, পিতাঃ ধর্ম্ম, পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরিঃ প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ ॥

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবীনচাঁদ সাধাসিধা ও সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। যৌবনে অর্থোপার্জ্জনের জন্য অনেক বিলাতী সাহেব-সুবা ও এদেশী আধা-সাহেবের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন কিন্তু কখনও জীবন-যাপন-প্রণালী পরিবর্ত্তন করেন নাই এবং স্বধর্ম্মেও আস্থা-হীন হন নাই। তাঁহার এই অসম্ভব রকম উন্নতির মূল যে ঈশ্বরের দয়া, এ কথা তিনি মনে, মনে একান্তভাবে বিশ্বাস করিতেন এবং সদা, সর্ব্বদা সর্ব্বজন সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া পরম দয়াবান শ্রীহরির মহিমা কীর্ত্তন করিতেন।

পুত্র শিক্ষিত হইবে,তিন চারিটি পাস করিবে,তাহার খুব সুনাম হইবে এই সরল বিশ্বাসে তিনি পুত্রকে শিক্ষিত করিতেছিলেন। তিনি স্বয়ং কখনও কলেজে পড়েন নাই বা কালেজীয় বিদ্যাদান-পদ্ধতির সহিত তাঁহার পরিচয়ও ছিলনা; এইজন্য এবং পুত্রের শিক্ষা-কার্য্য যাহাতে নির্দ্দোষরূপে ও ত্রুটীশূন্য হইয়া সম্পন্ন হয় সেজন্য তিনি বহু অর্থব্যয় করিতেন। উক্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য একজন বিলাত-ফেরৎ শিক্ষকও রাখিয়া দিয়াছিলেন, এ কথা আপনারা অবগত আছেন।

নবীনচাঁদ, পুত্রকে একজন আদর্শ ব্যক্তি করিবার মানস করিয়াছিলেন; এক্ষণে কিন্তু তাহার ভাব, ভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার সুখ-স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। তিনি পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া মহা ভীত

হইয়া পড়িলেন। যাহার বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়া তাঁহার মন-প্রাণ আকুল হইয়াছিল, তাহার ভিতরের ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া তিনি চক্ষে সরিষা-ফুল দেখিতে লাগিলেন ; তাঁহার স্থির, মোহিত মন এক্ষণে লোহিত সাগরের মত চঞ্চল ও তরঙ্গসঙ্কুল হইয়া উঠিল। নানা চিন্তার তরঙ্গের আঘাতে অস্থির হইয়া তিনি, প্রিয়বন্ধু ও ম্যানেজার গোবিন্দ বাবুর সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে—"আজ হইতেই শরৎকে কলেজ ছাড়াইয়া দিবেন এবং তাহার বিলাত ফেরৎ গৃহ-শিক্ষকও বিদায় প্রাপ্ত হইবে। গোবিন্দবাবু স্বয়ং প্রতিদিন শরৎকে সঙ্গে করিয়া নবীনচাঁদের ব্যবসার কার্য্যালয়ে লইয়া গিয়া, ব্যবসাসংক্রান্ত কার্য্যাবলী শিক্ষা দিবেন। নবীনচাঁদ স্বয়ং, এবার হইতে পুত্রকে নানারূপ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-বহির বাঙ্গালা-অনুবাদ পুস্তক পড়াইবেন। আর—অতি শীঘ্র একটি সুন্দরী ও সদ্বংশজাতা পাত্রী ঠিক করিয়া শরৎচন্দ্রের বিবাহ দেওয়া হইবে। তাহা হইলে শরতের সংসারের প্রতি টান হইবে এবং সেই নববধূ—তাঁহাদের শিক্ষামত—শরতের কান ধরিয়া ওঠ-বোস করাইবে ও তাহার ব্যাধি আরাম করিয়া দিবে—অর্থাৎ পিতা প্রভৃতি গুরুজনের দ্বারা যে কার্য্য হইল না, ঐ নবাগত ভাবী-বধূ স্বীয় রূপ যৌবনের প্রভাবে (on behalf of গুরুজন) সেই কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিবে, শরৎকে ঢিট্ বানাইয়া দিবে।

স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া নবীনচাঁদ এই সব মতলব ঠিক করিলেন। কিন্তু ইহা কতদূর কার্য্যে পরিণত

হইবে তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে, মনে, ভাবিলেন যে —"না বুঝতে পেরে যে ভুল ক'রেছি তার সংশোধন আমি নিজেই ক'রব। সক্ষম হবনা? নিশ্চয়ই হব। চারদিক দেখে যে রকম বুঝছি তাতে বেশ বুঝতে পারছি যে, আমাদের জাতের মধ্যে অনেক লোক ঠিক যেন ছানার তাল। এদের যখন যে ছাঁচে দেবে এরা তখন ঠিক সেই ছাঁচের আকার ধারণ ক'রবে। শরৎকে বিদেশী সভ্যতার ছাঁচে দিতেই সে সেই আকার ধরেছে। তাকে আবার যদি কোনও রকমে আমাদের দেশীয় সভ্যতার ছাঁচে দিতে পারি তাহলে সে নিশ্চয়ই তার আকার ধরবে। আমাকে একটু কড়া হ'তে হবে—নইলে যে সব যায়।" এই রকম চিন্তার পর তিনি শরৎকে কলেজ ছাড়াইয়া দিলেন এবং শরতের গৃহ-শিক্ষক যখন সেদিন অপরাহ্ণে পড়াইতে আসিল তখন তাঁহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া বলিলেন যে—"আমি ভুল বুঝে যে আশা ক'রে শরৎকে আপনার হাতে দিয়েছিলুম তার ঠিক উলটো ফল পেয়েছি। আজ থেকে আপনি বিদায় নিন। এবার আমি নিজেই শরৎকে আমাদের ধাতে-সওয়া-বিদ্যে শিক্ষা দোব।" এই কথা বলিয়া তিনি, গৃহশিক্ষক মহাশয়ের প্রাপ্য এক মাসের বেতন এবং হঠাৎ বিদায় দিলেন বলিয়া আরও এক মাসের বেতন মোট পাঁচ শত টাকা প্রদান করিলেন।

বিলাত ফেরৎ গৃহ-শিক্ষক মহাশয় একেবারে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া শরতের বৈটকখানায় আসিয়া শরতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, বলিলেন—"শরৎ তোমার বাবার অবিচারে আমায় বিদেয় নিতে হচ্ছে। তোমায়

ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হচ্চে। এখন কিছুদিন আর তোমায় দেখতে পাবনা। তবে তোমার বাবার ভাল-মন্দ কিছু হ'লে আমায় খবর দিও —আমি সে সময় তাহলে এখানে আসতে পারব। তখন আর কোনও বাধা থাকবেনা। Dont think it otherwise আমার এ কথা বলবার মানে এই যে, তোমার বাবার মৃত্যুর পর আমাকে খবর দিলে, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন ক'রতে পারব—তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও অন্তিম প্রার্থনা ক'রতে পারব।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"হ্যা নিশ্চয়ই খবর দোব। আপনি খুব উদার লোক দেখছি। বাবা আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ক'রলেন তবুও আপনি তাঁর ওপর শত্রুতা ভাব পোষণ না করে, তাঁর অন্তিম সময়ের জন্তে এরই মধ্যে থেকে শোকার্ত্ত হচ্চেন।"

গৃহ শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—"যাই হোক শরৎ তোমার সংবাদ আমায় মধ্যে, মধ্যে নিশ্চয়ই জানিও। তোমায় আমি বড়ই ভালবাসি। তোমার কুশল সংবাদ যদি মধ্যে, মধ্যে না পাই তাহলে আমার মনে বড়ই কষ্ট হবে। হয়ত আমি একটা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে প'ড়ব; এমন কি হয়ত ম'রাই যাব।" এই কথা বলিয়া চক্ষে রুমাল দিয়া শিক্ষক মহাশয় বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু ঘরের দরজা অবধি গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"দেখো শরৎ যদি তোমার কোনও কুশল সংবাদ না পাই তাহলে মনের কষ্টে আমি নিশ্চয়ই মারা যাব। দেখো শরৎ তোমার কুশল সংবাদ দিতে ভুলে গিয়ে আমায় মেরে

ফেলনা—আমার মেমসাহেবকে আর মিসি-বাবাদের অনাথ ক'রনা।"

এই কথা বলিয়া শিক্ষক মহাশয় চলিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া শরৎ বলিল—"আজ মনটা বড় খারাপ রয়েছে ; মনে করছিলুম যে একবার মাঠের দিকে ঘুরে আসা যাক আর কোনও কাফেতে গিয়ে কিছু খেয়ে আসা যাক। তা আপনি তো একদিন খাওয়াবেন ব'লে অনেক দিন থেকে Promise ক'রে রেখেছিলেন। আজ তো আপনার কাছে অনেক টাকাও হ'য়েছে। আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞামত আজ একটা ডিনার খাইয়ে দিন না।"

শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—"তার জন্যে আর কি, এতো ঘরের কথা যেদিন হোক খাওয়ালেই হ'ল। তা এবারটা থাক, এই আসছে মাস কাবারে মাইনে পেয়েই তোমায় ডিনার খাইয়ে আনব। Now ta ta, ta ta" এই কথা বলিয়া আর এক সেকেণ্ডও প্রতীক্ষা না করিয়া শিক্ষক মহাশয় সবেগে প্রস্থান করিলেন।

"এবারটা থাক, এই আসছে মাস কাবারে মাইনে পেয়েই তোমায় ডিনার খাইয়ে আনব—" এই কথাটির একটি মজার ইতিহাস আছে। শরৎচন্দ্রকে ব্যবহারিক-শিক্ষা দিবার নাম করিয়া শিক্ষক মহাশয় প্রায়ই মধ্যাহ্নে বাহির হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে জু-গার্ডেন, মিউজিয়ম, ইম-পিরিয়ল লাইব্রেরী প্রভৃতিতে লইয়া গিয়া খানিকটা এদিক-ওদিক বেড়াইয়া আসিতেন। বেশীর ভাগ কিন্তু ঐ সকল স্থানে না গিয়া

শিক্ষক ও ছাত্র চৌরঙ্গীর হোটেলে, ঢুকিয়া পড়িতেন এবং মনের সাথে কোনওদিন টিফিন. কোনও দিন বা লঞ্চ খাইতেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু ডিনার খাইবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করিত। কারণ ব্যবহারিক শিক্ষা কিছু রাত্রে দেওয়া হইবে না, এইজন্য সন্ধ্যার মধ্যেই ইহাদের বাড়ী ফিরিতে হইত সুতরাং ডিনার খাইবার অবসর পাইত না, তাই ডিনারে খাওয়ার প্রতি শরতের একটা প্রবল ঝোঁক ছিল।

ইহারা প্রথম যখন হোটেলে খাইতে আরম্ভ করে তাহার দুই, তিনবার-খাওয়ার পর, চতুর্থবার যখন একদিন ইহারা হোটেলে লঞ্চ খাইতে বসিয়াছে; সেই সময় শিক্ষক মহাশয় মনের সাথে মাংস চর্ব্বণ করিতে, করিতে বলিলেন যে—"শরৎ তুমি আমায় প্রায়ই হোটেলে খাওয়াচ্ছ, আমায়ত' একদিন তার return দেওয়া উচিত। তা এই আসচে মাস কাবারে মাইনে পেয়েই তোমায় একদিন ডিনার খাইয়ে আনব।" শরতের স্কন্ধে ভর করিয়া শিক্ষক মহাশয় প্রায়ই হোটেলে খাইতেন অথচ নিজে খরচ করিয়া শরৎকে একদিনও খাওয়াইতেন না —এটা সভ্য-সমাজের মধ্যে বড়ই অসভ্যতার কথা। তাই এই 'লজ্জা-বারণ কারণ' প্রত্যেকবার খাইবার সময় ইনি এইরূপ বলিতেন আর মাস-কাবারে মাহিনা পাইলেই একথা ভুলিয়া যাইতেন। যদি বা কোনও মাসে শরৎ এই কথা মনে করাইয়া দিত তাহা হইলে তিনি দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বলিতেন যে—"এবারটা থাক—এই আসচে মাসকাবারে তোমায় নিশ্চয়ই খাইয়ে আনব।"

একবার মাস কাবারের সময় পুনরায় এই কথা বলাতে শরৎ বলিল যে—"আপনার আর হোটেলে খাইয়ে কাজ নেই। আপনি বরং একদিন আপনার বাড়ীতে আমায় নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিন।"

বাড়ীতে যাইবার নাম শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় বিশেষ ভয় পাইয়াছিলেন। কারণ তিনি দিবারাত্র তাঁহার যে মেমসাহেবের রূপের বড়াই করিতেন এবং অপূর্ব্ব পতিভক্তির ব্যাখ্যা করিতেন সে মেম-সাহেবটি এত কালো যে, অন্যের কথা দূরে থাক—তাঁহার একান্ত প্রেমানুরক্ত ও ভক্ত স্বামী এই শিক্ষক মহাশয়ের চক্ষেও তাহা "অত্যন্ত কালো" বলিয়া বোধ হইত। আর ইহার পতিভক্তির কথা বোধ হয় এই অবধি বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইনি মধ্যে মধ্যে যখন উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তী ধারণ করিয়া, চেয়ার লইয়া স্বামীকে মারিতে তাড়া করিতেন তখন ভাগ্যবান স্বামী এই শিক্ষক মহাশয় এমন চোঁ চাঁ দৌড় মারিতেন যে, তাঁহার পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিতে তিন, চার দিন সময় লাগিত। এই কালো মেমসাহেবটিকে তিনি সাঁওতাল পরগণা হইতে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন।

শরৎকে বাড়ী লইয়া গেলে সেত' তাঁহার মেমসাহেবের যথার্থ রূপ দেখিতে পাইবে এবং তাহারই সামনে যদি হঠাৎ মেমসাহেব ঐরূপ পতিভক্তি দেখাইয়া ফেলেন—এই জন্য, বাড়ী লইয়া যাইবার নামে বিশেষ ভয় পাইয়া শিক্ষকমহাশয় বলিলেন—"তোমায় বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাওয়াব এতো খুব ভাগ্যের কথা শরৎ। কিন্তু এতে একটা বিশেষ বাধা

আছে। বাধাটা হচ্চে এই যে, তোমার মত লোককে নেমন্তন করে নিয়ে গেলে, পাঁচ রকম ভাল ভাল খানা বানিয়ে খাওয়াতে হবে অথচ আমার মেমসাহেব খালি ডাল ভাত ভিন্ন—আহা-হা: কি বলছি ছাই—আমার মেমসাহেব খালি পোলাও কারী ভিন্ন অন্য কিছু রাঁধতে পারেন না। আমার বাবুর্চী ব্যাটা আজ দু তিন বৎসর হ'ল ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছে—এখনও ফেরেনি। সেই বাবুর্চি ব্যাচারা অতি বিশ্বাসী আর পুরান লোক সেই জন্য তার স্থানে অন্য লোক রাখতে পারছিনা; তাই আমার প্রিয় মেমসাহেবকে সেই থেকে রোজ রাঁধতে হচ্চে। অথচ তিনি, সেই ডারলিং-কুল-শিরোমণি পোলাওকারী ভিন্ন অন্য কিছু রাঁধতে জানেন না তাই আমাদের বড়ই মুস্কিলে প'ড়তে হয়েছে। দিবসের সমস্ত রকম খানার সময়েই ঐ পোলাও-কারী খেতে হচ্চে। আরে Man আজ দু'তিন বৎসর ধ'রে সর্ব্বসময়ে ক্রমাগত পোলাও কারী খেয়ে, খেয়ে প্রাণটা যাবার দাখিল হ'য়েছে। আমাদের ব্রেকফাষ্টেও পোলাও কারী, টিফিনেও পোলাও কারী, ডিনারেও পোলাও কারী, সাপারেও পোলাও কারী খেতে হচ্ছে আর সেইজন্যে আমার বড়ই ভাবনা হচ্ছে। ভাবনা অবশ্য আমার জন্যে নয়—আমার মেমসাহেবের জন্যে এই ভাবনা হচ্ছে যে, এইভাবে সব সময়ে পোলাও কারী খেতে, খেতে শেষে তিনি না কোনদিন ঐ পোলাও কারী প্রসব ক'রে বসেন। আমার সেই সুইটহার্ট-সমাজ-সমুজ্জলকারিণী, ডারলিং-কুল-শিরোমণি, ওয়াইফ বংশ-গৌরবিনী, আমার হৃদয়-জমিদারীর নায়েব সেই মেমসাহেব তোমাকে

নিমন্ত্রণ করার সংবাদ সানন্দে অনুমোদন ক'রবেন কিন্তু ঐ এক বিষম মুস্কিল। সেইজন্যেই বলছি যে, ও-ছাই বাড়ীতে থাক—হোটলেই তোমায় ডিনার খাইয়ে আনবো; তবে এবারটা থাক—আসচে মাস কাবারে।"

এইভাবে আজ কয় বৎসর কাটিয়াছে। মধ্যে শরৎ একেবারে নীরব ছিল; আজ শিক্ষক মহাশয় চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া শরৎ তাঁহাকে, তাঁহার অঙ্গীকার মত, খাওয়াইতে বলিয়াছিল। কিন্তু আজও, অন্তিম মাহিনা গ্রহণের দিনও তিনি দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন যে—"এবারটা থাক—এই আসছে মাস কাবারে মাইনে পেয়েই তোমায় ডিনার খাইয়ে আনবো।"

## নবম পরিচ্ছেদ।

হরিচরণ ও মাধব নামে দুইটি যুবক শরতের সহিত আজকাল বড়ই মিশিয়াছে। ইহারা দুইজনে শরতের বাটির নিকটে বাস করে। পূর্ব্বে যখন ইহারা কিশোর বয়স্ক ছিল তখন প্রতিদিন অপরাহ্নে শরতের বাটিতে আসিয়া খেলাধূলা করিত। তারপর কিছুদিন যাবৎ ইহাদের আসা-যাওয়া বন্ধ ছিল। কালে ভদ্রে এক আধবার আসিত এবং দুই এক ঘণ্টা কাটাইয়া চলিয়া যাইত। আজ প্রায় ছয় মাস হইল ইহারা পুনরায় শরতের নিকট নিয়মিতভাবে আনাগোনা আরম্ভ করিয়াছে।

হরিচরণ ও মাধব দুইজনে সহোদর ভ্রাতা। ইহারা দুই ভাই একই বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীতে পড়িত। বাবুয়ানার দিকে দুই ভায়েরই বিশেষ ঝোঁক কিন্তু পয়সার অভাবে তাহা হইয়া উঠিত না। ইহাদের পিতা দরিদ্র, সামান্য কেরাণীর কার্য্য করেন। যা বেতন পান তাহাতে সংসার চালাইয়া ও পুত্রদের পাঠের খরচা চালাইয়া এক পয়সাও বাঁচাইতে পারেন না। বরঞ্চ—যদি কখনও সংসারের কাহারও ব্যায়-রাম হয় তাহা হইলে সে মাসে তাঁহাকে ঋণ করিতে হয়। এরূপ পিতার নিকট হইতে বাবুয়ানার সাধ মিটিবে না দেখিয়া ইহারা—এরূপ পিতার

পুত্র বলিয়া প্রায়ই প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করিত। শান্তিপুরের কালা পাড় কাপড়, খুব পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী [illegible] ং বার্ণিশ করা ভাল পম্পশু [illegible], ইহাদের সদাসর্ব্বদা পরিবার সাধ [illegible] এ সম্বন্ধে পিতার নিকট বহু অনু[illegible] করিয়াও কেবলমাত্র মোটা কা[illegible] ও মোটা কাপড়ের কোট এবং ঘোড়তলা জুতা পরিতে পাইত বলিয়া ইহারা দুই ভ্রাতাতেই, তাহাদের মাতার উপর এজন্য খুব তম্বা করিয়াও যখন এই সকল জিনিসের পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র মায়ের চক্ষের জল পাইত তখন দুই ভ্রাতাতেই সমস্বরে বলিত যে—"এঃ ও বাবাও যেমনি, মাও [illegible]মনি—দুই ব্যাটা-বেটিই সমান পাজী।"

এই জামা-কাপড়ের জন্য ইহারা মধ্যে, মধ্যে ইস্কুল ছাড়িয়া দিবার ভয় দেখাইয়া মাতাকে বলিত যে—"তুমি তো খালি ভাল ক'রে, মন দিয়ে পড়তে বল' কিন্তু তোমার এত সাধের পড়া যে বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা এ রকম ছোটলোকের-বেশে আর ইস্কুলে যাব না। ইস্কুলের বেশীর ভাগ ছেলেই ভাল কাপড়-চোপড় প'রে যায়। বিশেষতঃ বোসেদের ছেলেরা এমন সুন্দর সেজে যায় যে, মাষ্টারমা অবধি তাদের খাতির করে। আর আমরা এই রকম ছোটলোকের মতন সেজে যেতে পারব না। আমাদের এই রকম বেশের জন্যে বোসেদের ছেলেরা কত ঠাট্টা করে। আমরা ভাল কাপড়-চোপড় না পেলে আর ইস্কুলে যাব না।"

ইহাদের পিতা অন্তরাল হইতে এই সব কথাগুলি শুনিতে পাইয়া-

ছিলেন। তিনি পুত্রদের সম্মুখে, আসিয়া সক্রোধে বলিলেন যে—"যা ব্যাটারা সেই বোসেদের-ছেলেদের-বাপকে বাপ বলগে যা। আমার দ্বারা এর বেশী আর হবে না।"

এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর ইহাদের পিতৃবিয়োগ হইল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই দুই ভ্রাতায় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল। ইহাদের পিতা কিছুই জমাইতে পারেন নাই সুতরাং ইহাদের এক পয়সারও সঙ্গতি ছিল না। তার উপর আবার পিতার মৃত্যুকালীন রোগে চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা ঋণ হইয়াছিল। এক্ষণে সংসার চলা বড়ই দায় হইয়া উঠিল। একে ত' সংসারের মধ্যে যিনি উপার্জ্জনশীল ছিলেন তিনি মারা যাওয়াতে সংসারের আয় বন্ধ হইয়া গেল; তার উপর আবার ঋণের জন্য হৃদয়হীন মহাজনের তাগাদা—এটা ঠিক যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। যে ভুক্তভোগী সেই এর জ্বালা জানে, অন্যে জানে না এবং জানিবার চেষ্টাও করে না। যদি করিত তাহা হইলে আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকরা ইতর শ্রেণীর লোক হইবার জন্য লালায়িত হইয়া বড় দুঃখে বলিতেন না যে—'হায় কেন ইতরের ঘরে জন্মাইনি তাহলে লোকের দ্বারে, দ্বারে গিয়ে ভিক্ষে ক'রতে পারতুম—একটা যা-তা ছোট কাজ ক'রতে পারতুম। আমরা এমন সমাজের ভদ্রঘরে জন্মেছি যে, আমাদের দুঃখে সমাজ সাহায্য ক'রবে না অথচ আমরা ক্ষুধায় প্রাণ ফেটে গেলেও লোকের কাছে হাত পেতে ব'লতে পারব না যে, "ওগো ক্ষুধায় প্রাণ ফেটে গেল—

বড় যন্ত্রণা—দাও, দুটি ভাত, ভিক্ষা দাও।" যদি একথা ব'লতে যাই তাহলে সমাজ আমাদের অপমান ক'রবে, ছোটলোক ব'লবে, কত উপহাস ক'রবে।

হায় কবে এ দুর্দ্দশার মোচন হইবে। আমাদের সমাজ যাদের ইতর শ্রেণী বলে তারা কি কার্য্যতঃ যথার্থ ইতর? তারা জোরের সহিত রোজগার করে, মনের সুখে খায়, আরাম করে আবার সঞ্চয়ও করে। প্রায় সকলেরই কিছু না কিছু জমিজমা ও বাস্তুভিটা আছে। তাদের মধ্যে পরিবারের ভিতর একটি মাত্র লোক মারা গেলে সমগ্র পরিবারকে হঠাৎ পথের ভিখারী হইতে হয় না। তারা কেরাণী-বিদ্যা শিখিয়া সভ্য হইতে যায় নাই তাই তারা ইতর শ্রেণীর লোক হইয়াও ভদ্র-মধ্যম-শ্রেণীর লোকের অপেক্ষা সুখে থাকে এবং যদিও—তারা লেখাপড়া জানে না, অশিক্ষিত, ইতর প্রভৃতি বলিয়া—তাদের, ভদ্রশ্রেণীর নীচে রাখিয়া দিবার চেষ্টা করা হয় তবুও কিন্তু তারা—তাদের ঐ অশিক্ষিত-দোষের-গুণেই ভদ্র-শ্রেণীর অপেক্ষা ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ ভদ্রশ্রেণীকে টাকা ধার দিয়া—তাহাদের নীচে না থাকিয়া উপরে উঠিয়া পড়ে।

পিতার মৃত্যুতে হরিচরণদের সংসারের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কোনও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়—প্রত্যেকের পঁচিশ টাকা বেতনের দুইটি চাকরী ঠিক করিয়া ইহাদের দুই ভ্রাতাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ইহারা কিন্তু সে চাকরীতে সন্তুষ্ট না হইয়া তথায় গেল না। ইহাদের এইরূপ ব্যবহারে মাতা বলিলেন

যে—"তোরা যে চাকরী ক'রতে গেলিনি তা সংসার চলবে কিসে ?"

দুই ভ্রাতায় বলিল—"ও রকম পঁচিশ টাকার মাইনেতে আমাদের কি হবে ? ওতে আমাদের সিগারেটের খরচা অবধি হবে না। ও রকম ছোট চাকরী কি ভদ্রলোক করে ? অন্ততঃ দু' তিনশো টাকা মাইনে না পেলে আমরা চাকরী করব না।"

মাতা বলিলেন—"তোদের বাবা কখনও এক সঙ্গে দু' তিনশো টাকা দেখেছে যে, তোরা দু' তিনশো টাকা মাস-মাইনে চাস।"

দুই ভ্রাতার মধ্যে হরিচরণ অপেক্ষা মাধব একটু বেশী ওস্তাদ। মাধব বলিল—"মা আমরা কি তোমার যে-সে ছেলে যে, দু' তিনশো টাকা মাইনে পাওয়া আমাদের পক্ষে শক্ত হবে। কিছুদিন অপেক্ষা কর, আগে বাজারে একবার আমাদের দুই ভায়ের বিদ্যের পরিচয়টা বেরিয়ে যাক তখন দেখবে যে, সব বড়, বড় আফিসের বড়-সাহেবেরা, আমাদের দুই ভাইকে তাদের আপিসে নেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে আর আপনা-আপনির ভেতর মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে—অমন দু-চারটে বড়-সাহেব হাত-পা ভেঙ্গে বসেছে। কারণ ক'লকাতা সহরে অনেক আপিস আর তার অনেক বড়-সাহেব অথচ আমরা মোটে দুজন। কাজেই নিজের-নিজের আপিসে আমাদের দুজনকে নেবার জন্যে ঐ সব বড়-সাহেবরা আপনা-আপনির ভেতর মারামারি লাগিয়ে দেবে আর হাত-পা ভেঙ্গে ব'সবে। কিছুদিন অপেক্ষা কর মা কিছুদিন অপেক্ষা

কর, তারপর সব দেখতে পাবে। আর আমাদের মতন ছেলে গর্ভে ধারণ ক'রেছ ব'লে শীগ্‌গিরই রত্নগর্ভা ব'লে সমস্ত পৃথিবীময় তোমার নাম বেরিয়ে যাবে। তখন কিন্তু একদিন আমাদের ভাল ক'রে খাইয়ে দিতে হবে।"

মা অপেক্ষা করুন আর নাই করুন, দিন কিন্তু অপেক্ষা করিল না। সে যেমনই চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল এবং প্রতিদিন দুই বেলা আহারের সময়—"মা, ভাত দাও"—বলিয়া পুত্রযুগল আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অথচ 'ভাত কোথা হইতে আসিবে' সে ভাবনা তাহারা একবারও ভাবিল না। মা—হিন্দুর ঘরের মা আর কি করেন, তিনি তখন নিজেই চাকরীর যোগাড় দেখিতে লাগিলেন। পাড়ার একটি পরোপকার-ব্রতধারিণী বর্ষীয়সী বিধবা মহিলার সাহায্যে, ভিন্ন পাড়ার এক ধনীর বাড়ীতে একটি চাকুরী পাইলেন সেই ধনীর কন্যাকে রন্ধন ও গৃহস্থালী কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য তিনি মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পাইবেন এবং প্রতিদিন বেলা তিনটার সময় সেই ধনীর বাড়ী গিয়া সন্ধ্যা অবধি থাকিতে হইবে।

বিধবা মাতা প্রতিদিন আধ ক্রোশের উপর পথ আনাগোনা করিয়া চাকুরী করিয়া উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র দুইটী পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আর আড্ডা দিয়া খাইতে লাগিলেন।

পিতার নিকট হইতে বাবুগিরির সাধ মিটিল না দেখিয়া—পিতার মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতে হরিচরণ ও মাধব দুই ভ্রাতার শরতের

সহিত খুব মিশিয়াছিল। শরতের সহিত ইহাদের পূর্ব্বে আলাপ ছিল এবং পূর্ব্বে শরতের বাড়ীতে ইহারা খেলিতে যাইত একণে দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া পুনর্বার শরতের বাড়ী প্রতিদিন অপরাহ্নে যাইতে লাগিল এবং রাত্রি দশটা, এগারটা অবধি আড্ডা দিতে লাগিল। তারপর অত রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মায়ের নিকট ভাত চাহিত। মা সমস্ত দিন নিজের সংসারে খাটিয়া তারপর পরের বাড়ী চাকরী করিয়া ও আধ-ক্রোশের উপর পথ আনাগোনা করিয়া পুনরায় ছেলেদের জন্য রাঁধিতেন এবং তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় এত রাত্র অবধি হাঁড়ী কোলে করিয়া বসিয়া, বসিয়া ঢুলিতেন। হরিচরণ ও মাধব খাইতে বসিয়া নানারূপ লাক পক্ষাশী মারিত এবং তাহাদের কৃতিত্বের পরিচয় স্বরূপ নানারূপ আজগুবী গল্প করিত। সারাদিনের পরিশ্রমে কাতর মাতা, যদি তাহাদের এই গল্প শুনিতে শুনিতে একটু ঢুলিতেন তাহা হইলে ইহারা ভয়ানক ক্ষাপ্পা হইয়া উঠিত এবং এক ভাই অন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিত যে—"আমরা মিছে ব'কে মরছি আর নবাবের বেটি দেব্যি আরামে—চণ্ডুখোরের মতন ব'সে ব'সে ঘুমুচ্ছে। বলি ওমা-আঃ আজ কি চণ্ডু টণ্ডু টেনেছ নাকি?"

কিছুদিন এইভাবে শরতের নিকট আনাগোনা করিবার পর ইহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। হরিচরণ ও মাধবের ভাগ্যবলে শরৎ এই সময়টায় পিতার তাড়ায় কলেজ ছাড়িয়া দিল। কলেজ ছাড়িয়া দিবার পর শরৎ—হরিচরণ ও মাধবকে দিবসের অধিকাংশ সময় নিকটে রাখিত। তিনজনে মিলিয়া সারাদিন তাস, দাবা প্রভৃতি খেলিত এবং অপরাহ্নে গাড়ী করিয়া

বেড়াইতে বাহির হইত। শরতের ব্যবহৃত ভাল জামা, কাপড়, রুমাল, এসেন্স প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য ইহারা পাইত এবং ভাল, ভাল সিগারেট খাইতে পাইত।

গোবিন্দবাবু, শরৎকে ব্যবসার কার্য্য শিখাইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎ বলিল যে—"দিন কতক যাক, তারপর হবে।" এই বলিয়া সে এখন হরিচরণ ও মাধবকে লইয়া সর্ব্বদা খেলা ও গল্প করিতে লাগিল এবং আপনার অঙ্গরাগ ও সাজসজ্জায় মত্ত হইয়া খুব বাবুয়ানায় দিন কাটাইতে লাগিল। আত্মসুখে মগ্ন হইয়া কৃত্রিম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিল।"

---

# দশম পরিচ্ছেদ।

শরৎকে কলেজ ছাড়াইবার সঙ্গে, সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত নবীনচাঁদ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানাস্থানে পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল; নানা শ্রেণীর ঘটক, সদা-সর্ব্বদা তাঁহার বাটিতে গমনাগমন করিতে লাগিল। নবীনচাঁদ মনে, মনে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়াছেন যে—অচিরে পুত্রের বিবাহ দিবেন এবং তাহার পর তাহাকে রামায়ণ, মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া যতটা পারেন অন্যান্য হিন্দু-শাস্ত্র-অন্তর্গত সংগ্রন্থ সকল স্বয়ং পাঠ করাইবেন। সমুদয় বিগত ঘটনাবলীর আলোচনায় তাঁহার [illegible] দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে—পুরাকালের ভারতীয় আর্য্যগণের মহান চরিত্র ও জীবনি-কথা শরৎকে পড়াইতে পারিলেই সে অতি অবশ্যই শুধরাইয়া যাইবে; হিন্দু-সন্তানের সর্ব্বতোভাবে কি সামাজিক, কি ধর্ম্ম-জীবনে—যেমন হওয়া উচিত, সে ঠিক তেমনটি [illegible] ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া নবীনচাঁদ [illegible] প্রতীক্ষা করিতে [illegible]; কিন্তু হায়, তাঁহার অদৃষ্টে সে শুভ সময় আর আসিল না।

শরৎকে কলেজ ছাড়াইয়াই তিনি উপরোক্ত গ্রন্থ পড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল-কাম হন নাই—শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট বিশেষ জিদ ধরিল যে—"দিন কতক যাক তারপর আপনার কাছে ব'সে ঐ সব বই প'ড়ব। এখন আমার মনটা ভয়ানক চঞ্চল আর খারাপ হ'য়ে

১০

আছে, সামান্ত কিছুদিন না গেলে আমি ও সকল বইতে মন বসাতে পারব না।” নবীনচাঁদ পুত্রের এইরূপ ভাব দেখিয়া গোবিন্দবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে—“অগ্রে অবিলম্বে পুত্রের শুভ-বিবাহ কার্য্যটি নিস্পন্ন করিয়া ফেলিবেন তারপরে প্রাতঃকালে ও স্বায়ংকালে তিনি স্বয়ং, তাহাকে ঐ সকল গ্রন্থরাজি পর্য্যায়ক্রমে পাঠ করাইবেন এবং গোবিন্দবাবু, তাহাকে মধ্যাহ্নে ব্যবসার কার্য্যাবলী শিখাইবেন; তবে উপস্থিত তাহাকে, কতকগুলি বাঙ্গালী গ্রন্থকারের সামাজিক গ্রন্থ পাঠ করাইতে হইবে।” এইরূপ পরামর্শ করিয়া নবীনচাঁদ, নিকটে সাদরে আহ্বান করিয়া, শরৎকে উক্ত পরামর্শ মত বলিলেন যে—“দেখ শরৎ, এখন তুমি দু-চার দিন আমার কাছে না প'ড়তে চাও তো পোড়না। দেখ আমি মনে করছি যে, তাড়াতাড়ি বেশ ভাল একটি পাত্রী দেখে তোমার বিবাহটি দিয়ে ফেলে আমি, আমার একটা গুরুতর কর্ত্তব্য সেরে ফেলি। সেই জন্মে অতি শীগ্‌গিরই আমি, তোমার বিয়ে দোব'। তা দেখ, এই বিয়েটা হয়ে গেলেই আমার কাছে বেশ নিয়ম মত তোমায় প'ড়তে হবে। এই কটা দিন তুমি বিশ্রাম কর—তার পর বাপু, নূতন ভাবে শিক্ষা পেয়ে, তোমায় নূতন ভাবে জীবন কাটাতে হবে। আর দেখ, এই কটা দিন নেহাৎ অলস ভাবে না কাটিয়ে—তোমার অবসর মতন, হয়ত' বা খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুর বেলাটায় কিংবা রাত্রিতে শোবার আগে—তোমায় আমাদের বাঙ্গালী গ্রন্থকারদের রচিত দুই, চারিখানি সামাজিক বই পোড়তে হবে। এ সব বই প'ড়তে তোমার কোনও কষ্ট হবে না অথচ বেশ আনন্দ পাবে, শিক্ষাও হবে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা—এতে তোমার মনও প্রফুল্ল হবে আর ভবিষ্যৎ জীবনেরও অনেক

উপকার হবে। আমি গোবিন্দবাবুকে ব'লে দিয়েছি; তিনি, তোমায় আজই গিরিশ ঘোষের "বেল্লিক-বাজার" অমৃত বোসের "তরুবালা", "বাবু", "একাকার", ডি, এল, রায়ের "বহুৎ আচ্ছা," অমর দত্তর "মজা" নামের বইগুলি আনিয়ে দেবেন—তুমি আগে এইগুলি প'ড়বে। তুমি এখন যে মহাদোষের অধিকারী হয়েছ—এই বই গুলি প'ড়লে—সেই সকল মহাদোষের অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফলগুলি আগে থাকতে জানতে পেরে ভবিষ্যতের জন্যে সাবধান হ'তে পারবে। এগুলি প'ড়তে, তোমার দুই তিন দিন মাত্র লাগবে। তার পর, আরও কতকগুলি বাঙ্গলা পৌরাণিক নাটক ও তোমার, পক্ষে বর্ত্তমানে মহা উপযোগী কতকগুলি সামাজিক নাটক ও নভেল আনতে বলে দিয়েছি—সে গুলিও এই সময়ের মধ্যে প'ড়ে বেশ আনন্দের সঙ্গে তোমার অবসর যাপন কর এবং ভবিষ্যৎ-নূতন-জীবন গঠিত করার জন্য মনের ওপর তার বীজ বপন কর। তারপর তোমার বিবাহের হাঙ্গামাটা মিটে গেলে আমি নিজে—আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে তোমায় পরিচিত করাব—তোমায় মানুষ ক'রে দোব এগুলি করা চাই-ই চাই—নচেৎ বড়ই দুঃখের ও অপ্রীতিকর ব্যবস্থা আমার কাছ থেকে পাবে।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"আপনি যা, যা, বল্লেন সবই ক'রব কিন্তু ঐ বিয়ের কথাটি আমায় ব'লবেন না। আমি আপনাদের হিন্দু সমাজের অনুমোদিত অসভ্য ধরণের বিয়েটি ক'রতে পারব না; কিছুতেই পারব না—আমার সমস্ত জীবনটাকে নষ্ট করতে পারব না। আপনি আমার বিয়ের জন্যে চেষ্টা করবেন না—আমার মাথার ওপর বোঝা চাপাবেননা বাবা—এ কথা কিন্তু আমি আগে থাকতে ব'লে দিচ্ছি।"

নবীনচাঁদ সহাস্তে বলিলেন—"আরে বাপু, তোর মাথায় বোঝা চাপান কিসে হ'ল?. তুই তো আর গরীবের ছেলে নোস্ যে স্ত্রী-পুত্র তোর ঘাড়ে বোঝার সামিল হবে? সে ভাবনা তোর নেই—তোর যদি এক শতটা ছেলেও হয়—তাদের ব্যবস্থা আমি করে দিয়ে যাবো —তোর কোনও ভাবনা নেইরে পাগলা কোনও ভাবনা নেই।"

শরতের কানে, নবীনচাঁদের সব কথাগুলি গেলনা। সে নিজ বক্তব্য বলিয়াই—পিতার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই—গোঁ ভরে "গ্যাট্-ম্যাট্" করিতে করিতে চলিয়া গেল।

নবীনচাঁদ, শরতের বিবাহের জন্য "উঠিয়া-পড়িয়া" লাগিয়া গিয়াছেন। তিনি, গোবিন্দবাবু ও অন্যান্য দুই, চারিটি প্রবীন বন্ধুকে লইয়া নানাস্থানে গমন করিয়া পাত্রী দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। অবশেষে একটী পাত্রীকে তাঁহার ও অন্যান্য সকলের খুব পছন্দ হইল। এই পাত্রীটি খুব সুন্দরী ও সুলক্ষণা এবং তাঁহার পুত্রের সহিত ইহার পর্য্যায়ও মিলিয়াছে। এই সকল কারণে তিনি কন্যার পিতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বিবাহের একরূপ ঠিক করিয়া ফেলিলেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যাকালে—তাঁহার পুত্রকে দেখিতে যাইবার এবং [illegible] বসিয়া বিবাহের পাকা [illegible] কহিবার নিমিত্ত—পাত্রীর পিতাকে অনুরোধ করিয়া আসিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে নবীনচাঁদ—দুই, চারিটী প্রতিবাসী ও গোবিন্দবাবু প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট কর্ম্মচারী এবং কতিপয় প্রৌঢ় বন্ধু-বান্ধবকে লইয়া—তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন এমনসময়, পূর্ব্বকথিত পাত্রীর পিতা তিন জন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া নবীনচাঁদ, একটি

পরিচারককে—শরৎকে তথায় ডাকিয়া দিবার নিমিত্ত—আদেশ করিলেন।

সকলে সময়োচিত আলাপ পরিচয় করিতেছেন এমন সময় শরৎচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া, চোখ-মুখ সিঁটকাইয়া বলিল—"বাবা এ রকম সময় হঠাৎ আমায় ডাকলেন কেন?"

নবীনচাঁদ সহাস্যে বলিলেন—"তোমার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তোমার ঘাড় ভাঙ্গবার ব্যবস্থা করবার জন্যে তোমায় ডেকেছি।"

শরৎচন্দ্র একবার চারিদিকে চকিত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং তৎপরে পিতার দিকে চাহিয়া মহা গম্ভীর ভাবে বলিল—"ও রকম Serious ব্যাপার নিয়ে আমোদ করা ভাল নয় বাবা। কেন ডেকেছেন বলুন—দুটি ভদ্রলোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"তোমার পক্ষে আমোদ করবার দিন এসেছে, তাই আমিও আমোদ করছি। শরৎ, বাবা, আমি অনেক অনুসন্ধান করবার পর একটি সুন্দরী মেয়ের সন্ধান আজ পেয়েছি। আমি -"

শরৎ বিরক্তিভরে বলিল—"সন্ধান পেয়েছেন তো কি হবে কি?"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"এই মাসেই তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দোব।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"আমি বিয়ে ক'রব না।"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"সে কি, বিয়ে ক'রবে না কি রকম!"

শরৎচন্দ্র বলিল—"এই—এই রকম।"

নবীনচাঁদ অপ্রসন্নভাবে বলিলেন—"ও সব পাগ্‌লামী কথা ছেড়ে দাও শরৎ। বিয়ে তোমায় করতেই হবে। আমি, যে পাত্রীটিকে তোমার জন্য মনোনীত করেছি, তার অভিভাবকদের পাকা কথা দিয়েছি—

তাঁরা তোমায় দেখতে এসেছেন। ভদ্রলোক হ'য়ে ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি, সে কথার খেলাপ করা চলে না।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"আপনি যদি কথার খেলাপ না ক'রতে চান তা হ'লে আপনি নিজে বিয়ে করুন গে। আমার দ্বারা হবে না। বাবা উপযুক্ত ছেলের স্বাধীনতায় অযথা হস্তক্ষেপ ক'রবেন না।"

নবীনচাঁদ অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, ঈষৎ উচ্চৈস্বরে বলিলেন—"ও কি কথা শরৎ! ও রকম কথা ব'লে এই বুড়ো বাপের মনে কষ্ট দিওনা শরৎ—দিলে, তোমায় অনেক কষ্ট পেতে হবে। তোমায় বিয়ে ক'রতেই হবে। আচ্ছা বেশ তুমি নিজে গিয়ে না হয় সে মেয়েটিকে দেখে এসো—তারপর, যদি তাকে তোমার পছন্দ না হয় তাহ'লে আমি অঙ্গীকার ক'রছি যে এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দোব; আর অন্য একস্থানে আর একটি ভাল পাত্রীর সন্ধান ক'রে, তোমায় আগে তাকে দেখিয়ে তবে বিয়ের ঠিক ক'রব। কেমন এতে তো আর তোমার আপত্তির কোনও কারণ নেই? য়্যাঁ?"

শরৎচন্দ্র ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"আছে।"

নবীনচাঁদ বলিলেন—"এতে আবার আপত্তির কারণ কি আছে?"

শরৎচন্দ্র বলিল—"বিশেষ কারণ আছে। শুনুন—আমি কোন কিছু গোপন ক'রতে চাই না। অপ্রিয় হলেও—Frank কথা বলা খুব ভাল এবং আমি Frank কথা ব'লতে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত। আপনি বর্ত্তমানে আমার পেছুনে যে রকম ভাবে লেগেছেন তাতে আমি সোজা ভাবে সব কথা আগে ব'লছি এবং সে সকল কথা শুনে যদি আপনি প্রতিনিবৃত্ত না হন তাহ'লে—আমার আত্মহত্যা ক'রতে হবে না হয় বিলেত টিলেত কোথাও পালাতে হবে।"

নবীনচাঁদ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—"তুমি কি ব'লছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—আমি আজকাল তোমর পিছুনে লেগেছি কি? তুমি কি আমার শত্রু?"

শরৎ নিজের বাম হাতের উপর সজোরে একটি ঘুসী মারিয়া বলিল—"আপনি আমার সঙ্গে আজকাল শত্রুতা ক'রছেন কিনা বুঝতে পারছেন না? wonderfull! আপনি এতদিন আমায় একভাবে চালিত ক'রে এলেন; আমার প্রতি পশুর মতন ব্যবহার না ক'রে, আমায় শৃঙ্খলে বেঁধে না মেরে স্বাধীন ভাবে চালিয়ে এলেন; হঠাৎ আপনি গত একমাস থেকে কি রকম হয়ে গেলেন। আমায় কলেজ ছাড়িয়ে দিলেন; একজন উন্নত-চিন্তাশীল শিক্ষিত, বিলাত-ফেরৎ মাষ্টার আমায় পড়াচ্ছিলেন তাকে ছাড়িয়ে দিলেন, তারপর কতকগুলো বাঙ্গালা বই কিনা আমায় প'ড়তে হুকুম ক'রলেন, এবং শুনতে পাচ্ছি যে আমায় আপনি নাকি আবার শাস্ত্র পড়াবেন। এ সকল কি? এ সকল ব্যবহার কি ভদ্রতা ও সভ্যতা-সঙ্গত? আমি উচ্চশিক্ষা পেয়ে, সভ্য ও উন্নত হ'য়ে আবার সেই প্রাচীন বন্য-জীবনে ফিরে যাবো? উঃ Horrible! আপনি শেষে আমায় কিনা বিবাহ ক'রতে ব'লছেন; আমি তাতে সম্পূর্ণ অসম্মত হলেও আপনি জোর ক'রে আমায় তাতে প্রবৃত্ত করাতে চান। আমি কি বাঙ্গালীর ঘরের—পশুর মতন-শিষ্টভাবে-পিতৃ-আজ্ঞাপালনকারী সুবোধ বালক-সাধারণ? না, সেই ভাবে আমি শিক্ষিত হ'য়েছি, সেই রকম জীবন যাপন করবার জন্যই কি আমি অত পরিশ্রম ক'রে উচ্চ শিক্ষিত হলুম, উচ্চ প্রণালীতে, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চিন্তা করবার অধিকারী হলুম? আমি স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছি, আমার মনটা ক্রীতদাস-

ভাবাপন্ন নয়—আমার ওপর যা তা চালাকী চলবে না। আমি আপনাকে Frank কথা ব'লে দিচ্চি আমি বিয়ে ক'রব না এবং বিয়ে করবার জন্য আমি স্বাধীন জীবনের আস্বাদ পাইনি।"

নবীনচাঁদ ক্রোধে ও দুঃখে কম্পিত স্বরে বলিলেন—"ও সব স্বাধীনতার আস্বাদ, ক্রীতদাস-ভাবাপন্ন-টন্ন রেখে দাও। ও সব ঘোচাবার ব্যবস্থা আমি ক'রেচি আর শীঘ্রই ঘুচিয়ে দিচ্চি। তোমায় বিয়ে ক'রতেই হবে।"

শরৎচন্দ্র বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"এ তো বেশ আবদার দেখতে পাই। বিয়ে করতেই হবে? কেন বলুন দেখি - what do you mean by that বিয়ে ক'রতেই হবে। Dear father Please do not forget that I have attained majarity আমি আপনার নাবালক সন্তান নই যে আপনি আমার উপর স্বেচ্ছাচার ক'রবেন। আমি বুঝতে পেরেচি, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে তাই আপনি ওই সব জিনিসকে ঘোচাতে চাইচেন। take a little advice from your able and wise son—আপনার উপযুক্ত, জ্ঞানী পুত্রের উপদেশ গ্রহণ করুন আপনি Retire করুন, এ সংসার থেকে অবসর নিন। আপনার মতন লোকে সংসারে থাকলে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের উন্নতির আশা কখনও হবে না। আমি চললুম—আমায় আর এ রকম ক'রে trouble দেবেন না। দয়া ক'রে মনে রাখবেন যে আপনাদের সেই—"সেবক শ্রী, কার্য্যনঞ্চাগের"—দিন আর নেই। আমি আপনার কথায় আমার এতদিনের শিক্ষা, দীক্ষা জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিতে পারব না। আমি বিয়ে ক'রবনা।"

নবীনচাঁদ বিস্ময়ে স্তম্ভিত, স্বকৃত কর্ম্মের পরিণাম, স্ব-রোপিত কর্ম্ম-

বৃক্ষের বিষময় ফল দর্শনে ভীত, দুঃখে ও কষ্টে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিলেন—"কেন তুমি বিয়ে ক'রবে না সেটা বল; দোহাই তোমার, জোড় হাত ক'রে বলছি—কি কারণে তুমি বিয়ে ক'রতে চাওনা আমায় তা খুলে বল। তুমি কি কাউকে, বিয়ে করবার জন্ম নিজে থেকে মনোনীত করেছ, তাই আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হ'চ্চ না? খুলে বল। যদি তাই হয়; তুমি যদি কাউকে ভালবেসে থাক, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তারা যদি ভিন্ন-জাতীয়; বা ভিন্ন-ধর্ম্মী না হয়—সেখানে তোমার বিবাহ দোব।"

শরৎচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল—"বাবা ভালবাসাটা বড় সস্তা নয় যে আমি অমনই যাকে তাকে ফট্ ক'রে ভালবেসে ফেলব'। আমি বিয়ে—বিয়ে ব'লে যে জিনিসটি আছে, সেইটি ক'রব না। এ জগতে আমরা উপভোগের জন্ম এসেছি এবং আমাদের জীবনের মেয়াদটাও অতি অল্প সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই কর্ত্তব্য হচ্চে আমোদ, প্রমোদ ক'রে স্বাধীন ভাবে জীবনটাকে উপভোগ ক'রে নেওয়া। বিয়েটি হ'চ্চে এই গুলির মহা প্রতিবন্ধক আর তা ছাড়া আমার যা চেহারা সেটা পাঁচজনকে দেবার জন্ম সৃষ্ট হয়েছে। আমার এই সুন্দর, সুশ্রী রূপকে আমি কখন একজনকে (Lease) পত্তনী দিতে পা'রব না। পাঁচজনের উপভোগের জন্যে যদি এই সুন্দর রূপ বিতরণ না ক'রলুম তাহলে আমার এই রূপের সার্থকতা কি?—আমি "Public property"—সাধারণের সম্পত্তি। পাঁচজনের উপভোগের জন্যে আমি জন্মেছি। আপনি যদি জোর-জবরদস্তী ক'রে আমার বিয়ে দেন তাহলে—"Public property"—সাধারণের সম্পত্তি অপহরণ, এবং সেটা—wrongfully—অন্যায় পূর্ব্বক অপরকে Lease পত্তনি দেওয়ার অপরাধে আপনি ফৌজদারী সোপর্দ্দ

হবেন। অতএব আপনি বুঝে-সুঝে কাজ ক'রবেন। আপনি বাবা, আপনার-লোক, সেইজন্তে আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনাকে warning দিচ্ছি, আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে, বাবা Take care for your terrible future—আপনার ভীষণ ভবিষ্যতের জন্ত আপনি সাবধান হোন।"

নবীনচাঁদ বিস্ময়ে, ক্ষোভে, লজ্জায়, দুঃখে চিত্র-প্রায় নির্ব্বাক; নিশ্চল, নিস্পন্দ। সমাগত সকলেই নিস্তব্ধ। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর একে, একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। নবীনচাঁদ ও গোবিন্দবাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন।

শরৎচন্দ্র উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া আর এক মিনিটও তথায় থাকে নাই। সেইক্ষণেই সে চটাচট্ করিয়া চটি-জুতার শব্দ করিতে, করিতে নিজের বৈটকখানায় গমন করিল এবং প্রিয়-সহচর হরিচরণ ও মাধবকে লইয়া তাস খেলিতে আরম্ভ করিল; নির্ব্বিকার মনে, নিশ্চিন্ত ভাবে তাস খেলিতে, খেলিতে সে, সহচরদের নিকট গর্ব্ব করিয়া বলিল যে "ত্তাখ, আজকাল বাবা ভারী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলেন; আজ আমি এমন দু'চারটে কড়া কথা বাবাকে বলেছি আর এমন ভয় দেখিয়ে দিয়েছি যে বাবা আর কোনও দিন আমার সঙ্গে চালাকী করবার সাহস পাবে না।"

পুত্র এদিকে নিশ্চিন্ত মনে সহচরদের লইয়া তাস খেলিতেছে ও খোস-গল্প করিতেছে। পিতা ওদিকে দারুণ মনকষ্টে ছট্‌ফট্ করিতেছেন। তিনি প্রাচীন বন্ধুগণের সহস্র নিবারণ না শুনিয়া, স্বেচ্ছায়—পুত্রকে কি অমূল্য রত্ন তৈয়ারী করিয়াছেন এবং ভবিষ্যত ফল কিরূপ বিষময় ও মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি কি দশা প্রাপ্ত হইবে—এই চিন্তায় মহাভীত ও

একান্ত বিচলিত হইলেন। যাহা হউক তাঁহাকে অধিক দিন আর এ মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতে হইল না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে নবীনচাঁদ সহসা একদিন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। বড়, বড় ভাল, ভাল ডাক্তার আসিল, ঔষধ দিল কিন্তু জ্বরাক্রমণের তৃতীয় দিনে তিনি একেবারে অচৈতন্ত হইয়া পড়িলেন। বড়, বড় ডাক্তার আসিল, দামী, দামী ঔষধের ব্যবস্থা করিল কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। তিনি যে কি রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন তাহা ডাক্তাররা ধরিতে পারিল না। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, পরিবর্ত্তন মত, ঔষধ দিতে লাগিলেন। নবীনচাঁদের জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। রোগাক্রমণের পঞ্চম দিনে, তিনি একবার সহসা চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিলেন; তারপরে মস্তকের দিকে বিলম্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের পটের দিকে মাথা তুলিয়া প্রণাম করিয়া, অস্ফুট-স্বরে কি বলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিলেন —সে চক্ষু আর উন্মিলিত হইল না। পত্নী মোক্ষদাসুন্দরী ও আশ্রিত-গণকে কাঁদাইয়া নবীনচাঁদ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

———

## একাদশ পরিচ্ছেদ ।

নবীনচাঁদের মৃত্যুকালে, শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকটে ছিল না। সে তখন নিজের বৈটকখানায় বসিয়া, হরিচরণ ও মাধবের সহিত গুপ্ত পরামর্শে নিযুক্ত ছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে, পিতার অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়াছে এই কথা শুনিয়াছিল। সহচরদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া শরৎচন্দ্র, নিজের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বরাবর পিতার কক্ষে প্রবেশ করিল।

নবীনচাঁদ অচৈতন্য অবস্থায় খাটের উপর শুইয়া আছেন। মোক্ষদা-সুন্দরী বর্ণনাতীত ব্যথিত অন্তকরণে তাঁহার শিয়রে বসিয়া, তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন এবং পুরাতন ভৃত্য দীনু ও অন্য দুইটি পরিচারিকা আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় কক্ষতলে বসিয়াছিল।

শরৎচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করাতে পরিচারিকাদ্বয় ও দীনু উঠিয়া, সরিয়া দাঁড়াইল। মোক্ষদাসুন্দরী, স্বামীর শিয়র হইতে উঠিয়া তাঁহার পদতলে গিয়া বসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্রের আগমনে সকলেই মনে করিয়াছিল সে, পিতার নিকটে কিছুক্ষণের জন্য বসিবার ও তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র তথায় বসিলও না এবং কাহারও সহিত কোনও কথা না কহিয়া বরাবর পিতার শিয়রের নিকট গমন করিল ও তাঁহার মস্তকের উপাধান একটু তুলিয়া, তাহার নিম্ন হইতে লোহার সিন্দুক প্রভৃতির এক গোছা চাবি বাহির করিয়া লইয়া নীরবে বাহিরে চলিয়া গেল।

মোক্ষদাসুন্দরী খানিকটা, হতভম্ব হইয়া তথায় বসিয়া রহিলেন এবং ক্ষণপরে ধীরে, ধীরে স্বামীর শিয়রে যাইয়া পুনরায় উপবেশন করিলেন। পরিচারিকাদ্বয়, পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করিল—দীনু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কক্ষতলে চাহিয়া রহিল।

পিতার শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া শরৎচন্দ্র নিজের বৈটকখানায় প্রবেশ করিয়া একটি আলমারী খুলিয়া, তাহার হস্তস্থিত চাবির কতকগুলি রাখিয়া দিল এবং কতকগুলি চাবি বাছিয়া লইয়া নিজের পকেটে রাখিয়া দিল। তৎপরে পরিচারককে ডাকিয়া বলিল যে—"এই ঘরে আমার খাবার চট্ করে নিয়ে আয়। আর; অন্য দুজন বাবুর খাবার ক'রতে বামুনকে বলে দিয়েছিলুম—সেই দুইজনের খাবার এনে হরিচরণবাবু আর মাধববাবুকে দে। যা, শীগ্‌গির ক'রে নিয়ে আয়—অনেক কাজ আছে।"

পরিচারক প্রস্থান করিলে শরৎচন্দ্র—তথায় উপবিষ্ট হরিচরণ ও মাধবকে বলিল—"ভাখ, আজ বাবার অবস্থা বড় খারাপ,—রাত কাটবে না বোধ হয়—বৈকালবেলা ডাক্তাররা এই কথা ব'লে গেছে। আজ আর তোমরা বাড়ী যেওনা—তোমাদের নিয়ে আজ আমার অনেক কাজ আছে। আমি সন্ধ্যাবেলাই, তোমাদের খাবার তৈয়ার ক'রতে, সেইজন্য ব'লে দিয়েছি।"

এই সময় পাচক-ঠাকুর ওরফে বামুন-ঠাকুর তিনজনের খাবার লইয়া প্রবেশ করিল এবং তথায় খাবার রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল. পাচক-ঠাকুর বাহির হইয়া যাইবার সঙ্গে, সঙ্গেই দীনু মহা ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া বলিল—"বাবু, বাবু—কর্ত্তাবাবু কি রকম ক'রছেন—তাঁর শেষ সময় উপস্থিত—আপনি শীগ্‌গির আসুন।"

শরৎচন্দ্র অবিচলিত ভাবে বলিল—"আমি একটু পরে যাচ্চি—তুই যা। দেখচিস না সামনে খাবার রয়েছে—আমি খেয়েই যাচ্চি।"

দীনু অবাক হইয়া শরতের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল তৎপরে—"যদি জন্মের শোধ কর্ত্তাবাবুকে দেখতে চান তো এখনই আসুন; আর এক মিনিটও দেরী ক'রবেন না"—অতি ব্যস্তভাবে এই কথা বলিয়া দীনু অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

শরৎচন্দ্র ভ্রূক্ষেপও করিল না। নানারূপ পরামর্শ করিতে করিতে ইয়ারদ্বয়ের সহিত আহার করিতে লাগিল। মধ্যে, মধ্যে দুই একটি হাসির শব্দও শোনা যাইতে লাগিল। আহার শেষ করিয়া শরৎচন্দ্র, সহচরদ্বয়কে বলিল—"তোমরা একটু বোস'। আমি একবার বাবাকে দেখে, তারপর বাবার আফিস-ঘরে গিয়ে—টাকা-কড়ি সিন্দুকে কত মজুদ আছে, ব্যাঙ্ক বইগুলো কোথায় আছে—এই সব ঠিক করে দেখে চাবি দিয়ে আসিগে। কাউকে তো আজকাল বিশ্বাস করবার যো নেই। ও গোবিন্দবাবুই বল আর রামবাবুই বল, টাকার বেলায় সবাই সমান।"

এই কথা বলিয়া শরৎ, আপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বরাবর পিতার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল। যাইবার পথে—মাতার কণ্ঠ-নিঃসৃত উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বুঝিল যে, পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। সে পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তাহার পিতার দেহ খাট হইতে ভূমীতে নামাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার শবদেহের পদতলে, ভূমীর উপর লুটাইয়া পড়িয়া তাহার মাতা হৃদয়-ভেদী উচ্চ-শব্দে কাঁদিতেছেন। পরিচারিকাদ্বয়, মাতার দুই

পার্শ্বে বসিয়া আছে এবং ফোঁপাইয়া, ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। দীনু, তাহার মাঠাকুরাণীকে অর্থাৎ মোক্ষদাসুন্দরীকে মধ্যে মধ্যে, সান্ত্বনা বাক্যে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং নিজেও অনুচ্চ-স্বরে কাঁদিতেছে।

ক্রন্দনের স্বর কাণে প্রথম পৌঁছাইতেই শরৎচন্দ্র মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিল; এক্ষণে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সকলের এইরূপ ক্রন্দন দেখিয়া সে আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিরক্তির আতিশয্যে মুখটিকে প্যাচার মুখের মত বিকৃত করিয়া শরৎচন্দ্র মাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"মা, ওমা, আর কেঁদনা; যে গেছে সে আর ফিরবেনা—হাজার কান্নাকাটি ক'রে কেউ কখন ফেরাতে পারেনি। মিছে আর কেঁদনা।"

শরতের কণ্ঠস্বরে মোক্ষদাসুন্দরী একবার ঊর্দ্ধে মুখ তুলিলেন এবং শরৎকে দেখিয়া আরও অধিক উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমীতে পুনরায়, মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার সকরুণ ক্রন্দনে বুঝিবা পাষাণও ফাটিয়া যায়। শরৎচন্দ্র মাতার নিকট একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—"তবুও ফের কাঁদতে লাগলে। বুড়ো মাগী হ'লে, এত জানলে, তত জানলে—আর এইটা জানলে না যে, যে মরে যায় সে আর কিছুতেই ফেরে না। এই সামান্য কথাটুকু মনকে বোঝাতে পারলে না—এমন একটু মানসিক বল নেই ছাই যে এই সামান্য কথাটুকু মনকে বোঝাতে পার? নাও ওঠ, ঢের হয়েছে, আর কেঁদে কাজ নেই। পতিশোকরূপ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে তুমি আত্মবিস্মৃতা হোওনা; আত্ম-সম্মান হারিওনা। তুমি

কার পত্নী ছিলে এবং কার মা তুমি সেটা ভুলে যেওনা। গরীব, দুঃখী আর চাষা-ভূষোর মতন অমন ক'রে কেঁদনা। মা ক'রছ কি! তবুও ঐ অসভ্যতাময় কুসংস্কারপূর্ণ-কান্না কাঁদছ! চারিদিকে যে শত্রু হাসছে। ঐ শোন, মানস-কর্ণে ভাল ক'রে শোন—তোমার এই অশিক্ষিতা ও বর্ব্বরার মতন ব্যবহারে, তোমার এই সামান্ত পতিশোক জনিত গুরুতর চিৎকারে চারিদিকে শত্রুরা সব হাসছে আর ব'লছে যে—'এত বড়লোকের স্ত্রীর আর মহাসভ্য ও শিক্ষিত এত বড়লোকের মা'র মানসিক বল নেই আর কুসংস্কারে তার হৃদয়টা পূর্ণ।' মা, ওঠ, ওঠ, আর শত্রু হাসিও না; আর হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখিও না। এই সভ্যতা ও জ্ঞানালোক বিস্তারের কালে সেকালের সেই সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন-হৃদয় অবলা নারীদের মতন—পতিশোকে কাতরা হোওনা। অসভ্য, ভীল, কোল, সাঁওতাল, বা আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মতন কুসংস্কার দেখিওনা। তবুও কাঁদছ—আমার কথা শুনলে না! আমি যে এতটা বোকে মলুম এর কোনই ফল হ'ল না? তোমার কাছে যে যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো বললুম, এইগুলো যদি কলেজ স্কোয়ার কি [illegible] একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বলতুম তাহলে ধন্য, ধন্য রব [illegible] আর কতলোক যে শিক্ষা পেয়ে উদ্ধার হয়ে যেত তার আর ঠিক-ঠিকানা হোতনা। তুমি নেহাৎ গাড়ল তাই এগুলো বুঝলে না। তোমার এই গাঁ, গাঁ চিৎকারে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। এর পরে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে? ছিঃ ছিঃ এখনও কাঁদছ! এখনও কথা শুনলেনা? বর্ব্বরা, ঘোর-বন্যা, অনার্য্য-কন্যা

তুমি আমার মা হবার উপযুক্ত নও।" এই কথা বলিয়া প্রবল বায়ুতে বেতস পত্রের মত—ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে সভ্য, ভব্য, নব্য শরৎচন্দ্র, সেই কক্ষ হইতে সবেগে প্রস্থানোদ্যত হইল।

পতিশোকাতুরা হিন্দু-মহিলা মোক্ষদাসুন্দরী শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন তাই পুত্রবরের উপরোক্ত কথাগুলি তাঁহার কাণে প্রবেশ করে নাই, এই যা মঙ্গল—নচেৎ, স্বীয় গর্ভজাত পুত্রের মুখে এরূপ সময়ে এইরূপ কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই তিনি হুতাশে মারা যাইতেন।

শরৎচন্দ্র যখন উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করে সেই সময়ে তাহার কথার শেষ অংশটি সে খুব চিৎকার করিয়া বলে। তাহার চিৎকারে একবার ক্ষণিকের জন্য মোক্ষদাসুন্দরীর আচ্ছন্ন-ভাবটা কাটিয়া যায়। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া শরৎকে দেখিতে পাইয়া, আবেগভরে কাঁদিয়া বলিলেন—"ওরে বাবা শরৎরে, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'লরে। ওরে অভাগা, তোর আর আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লরে বাবা।"

শরৎ প্রস্থান করিতেছিল; মাতার এই কথা শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সরোষে বলিল—"কে তোমাকে ব'লে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। ওগো 'বুদ্ধির-ভুড়ভুড়ী, বিদ্যের-ঝুড়ি' তোমার বা আমার কোনও সর্ব্বনাশ হয়নি। বাবা যদি কিছু টাকা কড়ি না রেখে মারা যেত' তাহলে নাহয় তুমি কি সর্ব্বনাশ হ'লরে; ওরে বাবারে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'লরে ব'লে—চিৎকার ক'রতে আর আমিও হয়ত বা তাতে সায় দিতুম। বাবা যখন লক্ষ, লক্ষ টাকা রেখে মারা গেছেন তখন এতো সুখের মৃত্যু; এতে আবার সর্ব্বনাশটা কোনখানে; এতে আবার দুঃখই বা কোথায়? তুমি অশিক্ষিতা, তাই এই সুখের বিষয় দুঃখের

দুঃস্বপ্ন দেখছ। এই জন্যেই মেয়েদের বিশেষ রকমে শিক্ষিতা করা দরকার। শিক্ষা পেলে তবে হিতাহিত জ্ঞান হয়, কোনটা নিজের পক্ষে ভাল, কোনটা মন্দ—সেটা বুঝতে পারে। তুমি যদি Economics (অর্থশাস্ত্র) প'ড়তে তাহলে বুঝতে পারতে যে, বাবার মৃত্যুতে তোমার কতটা সুবিধে হয়েছে। তুমি অশিক্ষিতা, অসভ্যা তাই এ কথাটা বুঝতে না পেরে 'হাউ-হাউ' করে কাঁদছ। তুমি শিক্ষিতা আর আলোক-প্রাপ্তা হোলে নিজের এই লাভের-ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আনন্দ করতে; অন্ততঃপক্ষে—লোক দেখানর জন্য নানা রকম সু-কায়দাপূর্ণ, সভ্য-রকমের, ভদ্র-রকমের শোক ক'রতে।"

এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র, সেখানে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থান না করিয়া সভ্যতা-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সদর্পে বাহির হইয়া, তাহার পিতার আফিস-কক্ষে চলিয়া গেল। আফিস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুইচ টিপিয়া টেবিলের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র টেবিল-লাইটটি জ্বালাইয়া—পিতার ডেক্স, হাত-বাক্স, টেবিল, দেরাজ প্রভৃতির অভ্যন্তরস্থিত কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সকলের সনির্ব্বন্ধ-অনুরোধ, অনুনয়, বিনয়, সকাতর-প্রার্থনা প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া শরৎচন্দ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিল—"আজ রাত্রে কোনও-মতেই বাবার মৃতদেহ পোড়াতে দোব না। তা সে যেই কেন অনুরোধ করুক না, আজ কিছুতেই বাবার মৃতদেহ বাড়ী থেকে বের ক'রে নিয়ে যেতে দোব না।"

এই ভীষণ সংবাদে সকলে স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়া গেল। গোবিন্দ বাবু, শব লইয়া যাইবার নিমিত্ত পল্লীস্থ দুই চারিটি ভদ্রলোককে ডাকিতে গিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া বাটিতে প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত ভীষণ সংবাদ শুনিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। মাথায় হাত দিয়া খানিকটা কি ভাবিয়া তিনি—শরৎ কোথায় আছে—এই কথা পরি-চারকদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে—শরৎ তাহার পিতার অফিস-কক্ষে অবস্থান করিতেছে। এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি, সমাগত ভদ্রলোকদিগকে—ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া একেবারে দ্বিতলে উঠিয়া নবীনচাঁদের অফিস-কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, শরৎ তাহার পিতার হাত-বাক্স খুলিয়া তন্মধ্যস্থিত কাগজ-পত্র মনযোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। শরৎচন্দ্র একটি ডেস্কের সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিল।

গোবিন্দবাবু তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা.শরৎ এ কি অসম্ভব আদেশ দিয়েছ? উপায় থাকতে তোমার বাবার মৃতদেহের সৎকার ক'রতে বাধা দিও না। তিনি রাত্রের প্রথম প্রহরেই মারা গেছেন; তাঁর মৃতদেহ আজ রাত্রেই পুড়িয়ে ফেলা চাই। নইলে বাসী-মড়া ক'রে তাঁর দেহকে রেখে দিলে মহাদোষ হবে।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"দোষ হয় হবে। বাবার মৃতদেহ আজ রাত্রে পুড়িয়ে ফেললে কাল যখন তাঁর সাহেব-সুবো বন্ধু বা তাঁর সভ্য এদেশীয় বন্ধুরা তাঁর মৃতদেহের প্রতি শেষ সম্মান দেখাতে আসবে তখন আমি কি ক'রে বাবার মৃতদেহ হাজির ক'রব। সভ্য-সমাজের নিয়মানুসারে উচিত হচ্চে যে, কোনও লোক মরে গেলে তার মৃতদেহ বেশ ক'রে সাজিয়ে গুজিয়ে, গন্ধদ্রব্য মাখিয়ে অন্ততঃপক্ষে দুই তিন দিন রেখে দেওয়া—কারণ এই কয়দিনের মধ্যে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবরা তাকে শেষ-দেখা দেখে যাবে। এই সকলের পর তবে মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে এবং সে উৎসবে সকলেই যোগ দিতে অবসর পাবে। আমি, আপনাদের কথা শুনে আজ রাত্রেই বাবার মৃতদেহ যদি পুড়িয়ে ফেলি—তাহলে কাল কি পরশুদিন যখন বাবার সুসভ্য বন্ধুগণ সভ্যতা প্রকাশের জন্য আর এটিকেট্ বজায় রাখবার জন্য বাবার মৃত-দেহকে শেষ-দেখা দেখতে এসে শুনবেন যে, সে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে তখন তাঁরা কি মনে ক'রবেন। তাঁদের ঘৃণা-মাখান-বিস্মিত চক্ষু যখন নীরবে, আমার এই বর্ব্বর ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রবে তখন আমি কি উত্তর দোব। বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক—নিশ্চয়ই আসবেন। তিনি এসে যখন—'আমার এতদিনের

শিক্ষাদানের কি এই অসভ্য ফল হ'ল'—এই কথা ব'লে আমায় সুসভ্য ভর্ৎসনা ক'রবেন তখন আমি তার কি কৈফিয়ৎ দোব? না গোবিন্দবাবু এ কাজ আমি করতে পারব না। আমায় মাপ করবেন—এ রকম ভয়ানক, বিভৎস-কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

গোবিন্দবাবু অবাক হইয়া সব কথাগুলি শুনিতেছিলেন। শরৎচন্দ্রের কথা শেষ হইলে, তিনি সকাতরে বলিলেন—"শরৎ তুমি নিজেকে শিক্ষিত ব'লে, জ্ঞানী ব'লে পরিচিত কর অথচ এ কি নির্ব্বোধের মতন কথা ব'লছ। তুমি ওসব যা বললে তা অন্য সমাজে হতে পারে। হিন্দুর ঘরে কি ওসব চাল চলে? হিন্দুর ঘরে কখনও কি তিন দিন মড়া ফেলে রাখে? দোহাই তোমার এই রকম ভীষণ অন্যায় কাজ ক'রনা।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"এতে আমার কিছু অন্যায় নেই। যদি কিছু অন্যায় থাকেতো তা আপনার হিন্দুধর্ম্মের অন্যায়। আপনার অতি-প্রিয় ঐ হিন্দুধর্ম্ম ব্যবস্থা দিচ্ছে যে, বাসী মড়া ক'রনা অথচ আবার বলছে যে মড়া পুড়িয়ে ফেলবে। এ ব্যবস্থাটা গাধার মতন ব্যবস্থা হয়েছে। এই গাধার মতন ব্যবস্থার জন্যেই আমি, আপনার সাদা চুলের অপমান ক'রতে বাধ্য হ'লুম। আপনার হিন্দুধর্ম্ম যদি মৃতদেহ না পুড়িয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলবার ব্যবস্থা দিত তা হলে আমি না হয় আপনার কথায় সম্মত হ'য়ে বাবার মৃতদেহকে বাসী মড়া না ক'রে আজ রাত্রেই পুঁতে ফেলে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা ক'রে আপনাদের হিন্দুত্ব রক্ষা ক'রতুম। তারপর কাল কি পরশু যখন বাবার সভ্য বন্ধু বান্ধবরা আসত' তখন মাটি খুঁড়ে গোর থেকে বাবার মৃত দেহটা বের ক'রে ঘরে এনে সাজিয়ে রেখে সবাইকে দেখাতুম—তারপর আবার মাটিতে পুঁতে ফেলতুম। এতে

সব দিকই রক্ষা হোত। হ্যাঁ, বড় জোর—দুই, চারবার খোঁড়াখুঁড়ি আর পোঁতাপুঁতির জন্তে মৃতদেহটার ওপর খোন্তা আর কোদালের আঘাত লেগে খানিকটা কেটে যেত। তা বোধ হয় আপনার জানা আছে যে, মরা মানুষের গায়ে আঘাত লাগলে তার কোনও কষ্টই হয় না। আপনি যান, যান—আপনার হিন্দুধর্ম্মের বিধানদাতাদের এই মূর্খমীর কথা ভেবে এখনও এই হীন ধর্ম্ম আশ্রয় ক'রে আছেন ব'লে অনুতাপ করুনগে। ওঃ কি অন্যায় কথা বল দেখি—'গোর দেওয়া হবে না, পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথচ লোকে শেষ-দেখবার জন্তে অবসর পাবে না, —তখনই পুড়িয়ে ফেলতে হবে; দুই একদিন ঘরে রাঁখলে বাসী মড়া হবে—মহা অন্যায়, মহা দোষের কথা। আরে বাবু যদি পোড়াবারই ব্যবস্থা দিলি তাহলে—লোকে যাতে দু'চারদিন ঘরে মড়া রাখতে পারে তার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত ছিল। ও বাসী মড়ার ফ্যাচাঙ তোলা উচিত ছিল না। আর যদি বাসী মড়ার ফ্যাচাঙই তুললি তা হলে গোর দেবার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত ছিল। ওঃ কি ভয়ানক এই ব্যবস্থা ওঃ কি ঘোর মূর্খতা।" শরৎচন্দ্রের কথা শুনিতে, শুনিতে গোবিন্দবাবু মহা উত্তেজিত হইয়া যাইতেছিলেন। তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—"তবে কি কোনও উপায় নেই? তোমার জন্মদাতা পিতাকে, আমার প্রিয়তম বন্ধু ও স্নেহময় মনিবকে একান্তই কি বাসী মড়া হ'তে হবে? আমি তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়—আমার এই অনুরোধটি রাখ। দোহাই তোমার, আমার এই"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া গোবিন্দবাবু আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া গেল; দুই চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল।

শরৎচন্দ্র ঈষৎ শ্লেষের সহিত, বলিল—"এঃ আপনি দেখছি মেয়েমানুষেরও অধম। কথা কইতে, কইতে বুড়ো মিন্সে প্যান্‌-প্যান্‌ ক'রে কেঁদে ফেললেন যে। আচ্ছা মুস্কিলে পড়লুম দেখছি। ও,—শুনছেন ও গোবিন্দবাবু, আমি শেষ এক কথা বলে দিচ্ছি, শুনুন। দেখুন, আমি মনে করেছিলুম যে, সকলকে শেষ দেখবার সুযোগ দেবার জন্যে বাবার মৃত দেহটা তিনদিন বাড়ীতে রাখব। তা এখন আপনার অনুরোধে আমি এই পর্য্যন্ত ক'রতে পারি যে, আজই কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে চিঠি লিখে জানিয়ে দোব যে, তাঁরা যেন কাল দুপুর বারটার মধ্যে এখানে এসে বাবার মৃত দেহকে শেষ দেখে যান। তারপর কাল বেলা একটার সময় বাবার দেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে দোব। কিন্তু একটা কথা, আমাকে যদি বাবার মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যেতে হয় তাহলে আপনারা কিন্তু ঐ হরিবোল, হরিবোল ব'লে গাঁ-গাঁ শব্দে চিৎকার ক'রতে পারবেন না। কারণ, আপনাদের ঐ হরিবোল, হরিবোল রব শুনলে আমার বড়ই অস্বস্তি বোধ হয়, বুকের ভেতরটা গুব্‌ গুব্‌ ক'রে ওটে। হ্যাঁ আরও এক কথা, আমি শ্মশানে যাবো, কিন্তু দিনের আলো থাকতে, থাকতে শ্মশান থেকে ফিরে আসতে হবে, অন্ধকার হ'য়ে গেলে আমি আর এক মিনিটও সেখানে থাকব না—তা সে বাবার দেহের সৎকার হোক আর নাই হোক। আমি সব কথা আগে থাকতে বলে দিচ্ছি; এই সব বুঝে কাজ করবেন। যান, এখন যান; আমায় প্রস্তুত হতে দিন, আগামী কাল সকল লোকের কাছে শোক প্রকাশ করবার জন্যে আমায় প্রস্তুত হোতে দিন।"

গোবিন্দবাবু চীৎকার শব্দে বলিয়া উঠিলেন—"এ আমি কি শুনটি;

এই সব পাপ কথা শোনবার জন্যে আমি এখনও বেঁচে আছি। বন্ধু, প্রভু স্বর্গ থেকে দেখ, তুমি কি রত্ন স্বেচ্ছায় তৈরী ক'রে গেছ, একবার দেখ। শরৎ তুমি এ সব বলছ কি! তোমার বাপ এই মাত্র দেহ রেখেছেন আর তুমি তাঁর জন্তে শোক দুঃখ না করে এ কি—"

গোবিন্দবাবুর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। দুঃখে, ক্ষোভে, ঘৃণায় তিনি আর মাথার ঠিক রাখিতে পারিলেন না। সদ্য মৃত প্রিয় বন্ধুর ও প্রতিপালক প্রভুর মৃত দেহের পরিণাম দেখিয়া তিনি বিচলিত হইলেন। দুঃখ, বিরক্তি ও নিস্ফল-ক্রোধের আবেগে তাঁহার সমগ্র দেহ কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষু তারকা কপালে উঠিয়া গেল। তিনি সবেগে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া, ঊর্দ্ধ মুখে স্বর্গগত প্রভুর উদ্দেশে কি বলিতে গেলেন কিন্তু তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি ঐরূপ অবস্থায় থর্-থর্ করিয়া কাঁপতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্র সহসা গোবিন্দবাবুর এই ভাবান্তর দেখিয়া একটু ভীত হইল। সে ভীত ও বিস্মিত চিত্তে, গোবিন্দবাবুর উক্ত প্রকার অবস্থা দেখিতে, দেখিতে দেখিল যে—গোবিন্দবাবু ঊর্দ্ধ মুখে ও ঊর্দ্ধ হস্তে থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে, কাঁপিতে, দুই একবার মাথা নাড়িয়া অবশেষে গোঁ, গোঁ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি ঘোর লাল হইয়া উঠিয়াছে এবং মাথার সমস্ত চুলগুলি খাড়া হইয়া রহিয়াছে। সহসা একবার তাঁহার মুখ-নিঃসৃত গোঙানি-রব থামিয়া গেল এবং তাঁহার ঠোঁট দুইটি নড়িয়া উঠিল বটে কিন্তু কোন কথা বাহির হইল না—দুই, তিন বার নড়িয়াই থামিয়া গেল এবং তিনি পূর্ব্বের মত অবস্থায় আরও বেশী জোরে গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন।

এই দৃশ্যে শরৎচন্দ্র মহা ভীত হইয়া উঠিল এবং সে কেমন একটা অস্বাভাবিক অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল। "গোবিন্দবাবুর ঐ রকম অবস্থা হঠাৎ কেন হ'ল" এই কথা ভাবিতে গিয়া চকিতে তাহার মনে হইল যে, "তাহার পিতার প্রেতাত্মা গোবিন্দবাবুর দেহে ভর করে নাইত? বোধ হয় করিয়াছে নচেৎ গোবিন্দবাবুর হঠাৎ এ রকম ভূতে-পাওয়ার-অবস্থা হবে কেন?" চকিত মধ্যে যেইমাত্র তাহার মনে এই কথা উদিত হইল অমনই তাহার অন্তর শিহরিয়া উঠিল। সে তখন তাহার সেই 'সর্ব্বদা গ্যাড্-ম্যাড্ উচ্চারণ করা মুখে মামুলী ও পৈতৃক বুলি 'বাবারে-মারে' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া সেই ঘর হইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। সে, যে চেয়ারের উপর বসিয়াছিল সেই চেয়ারের উপর তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সম্মুখে অবস্থিত ডেকস্‌টি অতিক্রম করিবার মানসে, সেই চেয়ারের উপর হইতে সবেগে লম্ফ প্রদান করিল। ভয়ের মাত্রাধিক্যে তাহার লম্ফের-বেগের মাত্রাটাও আধিক্য প্রাপ্ত হইয়াছিল সেইজন্ত এত মাত্রাধিক্য বরদাস্ত করিতে না পারিয়া তাহার দেহ বেচারা সামাল দিতে অক্ষম হইয়া উল্টাইয়া পড়িল—শরৎচন্দ্র সম্মুখস্থ দেয়ালের নিকট ঘাড়-মাথা গুঁজড়াইয়া পড়িয়া গেল ও তাহার মস্তকটি সজোরে দেয়ালে ঠুকিয়া গেল।

এই ভাবে পড়িয়া যাওয়াতে শরৎ বেশ জোরে আঘাত পাইল কিন্তু সে আঘাতকে গ্রাহ্য না করিয়া সে পড়িয়া গিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাহিরে পলাইবার মানসে দরজা লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে উদ্যত হইল।

শরৎচন্দ্রের এই অস্বাভাবিক চিৎকারে এবং পতন শব্দে গোবিন্দবাবুর চমক ভাঙ্গিল; তাঁহার সেই আত্মবিস্মৃত-ভাবটা কাটিয়া গেল। তিনি চমক ভাঙ্গিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন যে, শরৎ তাড়াতাড়ি কক্ষতল হইতে উঠিয়া সেই ঘর হইতে সবেগে বাহির হইয়া যাইতেছে। শরৎকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া তিনি মনে ভাবিলেন যে, 'আমি যদি শরতের ছুইটি পা ধরিয়া ভিক্ষা চাই তাহা হইলে সে আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে'। এই কথা চকিতে চিন্তা করিয়াই, শরতের ছুই পা ধরিবার নিমিত্ত তিনি ছুই হস্ত বিস্তার করিয়া পলায়নমান শরতের দিকে সবেগে অগ্রসর হইলেন।

সজোরে ভূমে পতিত শরৎচন্দ্র ভূতের ভয়ে—আঘাত-নিবন্ধন-বিষম-যন্ত্রণাকেও উপেক্ষা করিয়া এবং গাত্রের ধূলা পর্য্যন্ত না ঝাড়িয়া যেইমাত্র সেই ঘর হইতে পলাইবার জন্ত দ্বার লক্ষ্য করিয়া সবেগে ছুটিয়া পাঁচ ছয় পদ অগ্রসর হইয়াছে, অমনই দেখিল যে, গোবিন্দবাবু ভীষণ মূর্ত্তীতে, ছুই হাত বিস্তার করিয়া তাহার দিকে সবেগে অগ্রসর হইতেছেন। এই দৃশ্ত দেখিয়া শরৎচন্দ্র মনে ভাবিল যে, 'তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া তাহার মুণ্ডটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্ত ভূতে-পাওয়া-গোবিন্দবাবু ঐ রকম ভাবে অগ্রসর হইতেছে।' ভূতের ভয়ে সভ্য ও শিক্ষিত শরৎচন্দ্র পলাইতে গিয়া এইরূপ ভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়া আরও ভীত হইয়া আরও জোরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা লজ্জায় পলায়ন করিল। সে ছুই একবার য্যাঁ, য্যাঁ করিয়া একটা অস্পষ্ট কথা উচ্চারণ করিয়া সেইস্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তাহার চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া নিম্নতল হইতে কয়েকজন পরিচারক

এবং শরতের সহচরদ্বয় হরিচরণ ও মাধব তথায় ছুটিয়া আসিল। গোবিন্দ-বাবুর আদেশে তুইজন পরিচারক এক ঘটি জল ও একখানি পাখা লইয়া আসিল এবং শরতের মুখে, চোখে জল ছিটাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শরতের লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে চক্ষু মেলিয়া পিট্-পিট্ করিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। তাহাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া গোবিন্দবাবু সময়োপযোগী হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"জয় ভগবান, এই যে চোখ চেয়েছ। কি হয়েছিল বাবা তোমার? হঠাৎ এ রকম মূর্চ্ছা গেলে কেন?"

শরৎ শ্লেষ সহকারে এবং একটু মুখ ভ্যাঙ্গচাইয়া বলিল—"কি হয়েছিল বাবা তোমার! ন্যাকা আর কি, যেন কিছুই জানেন না। আপনার জন্তেই তো আমার এই দশা হোল'—আর আপনি জেনে শুনে ন্যাকা সাজছেন!"

গোবিন্দবাবু বলিলেন—"রাম, রাম—কি ব'লছ বাবা তুমি! আমি তোমার—"

শরৎচন্দ্র বলিল—"যাক আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। আপনার মনস্কামনা তো পূর্ণ হয়েছে। যান, এখন উদ্যোগ আয়োজন করুনগে যান; বাবার মৃতদেহ এখনই পুড়িয়ে আসা যাক। আপনি সব ঠিক-ঠাক ক'রে যাবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যাবেন।"

গোবিন্দবাবু এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া আর তথায় দাঁড়াইলেন না। স্বচ্ছন্দমনে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। পরিচারকগণ তাঁহার অনুগমন করিল। শরতের সহসা এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া

গোবিন্দবাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত ও বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন ; কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। শরৎচন্দ্র ধীরে, ধীরে উঠিয়া বসিল এবং হরিচরণ ও মাধবকে ডাকিয়া লইয়া, তিন জনে তিন খানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শরৎ পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া সহচরদ্বয়কে দুইটি দিয়া নিজে একটি ধরাইয়া লইয়া বলিল—"ছাখ বড়ই মুস্কিলে প'ড়ে আমায় বাধ্য হ'য়ে আজই বাবার মৃতদেহ পোড়াবার অনুমতি দিতে হ'ল। বাধ্য হ'য়ে ঐ সব অসভ্য রীতিগুলো পালন ক'রতে হ'ল। বাবা তো সভ্য ছিলেন না তাই আমি যে কেন তাঁর মৃতদেহ দুই তিন দিন রেখে দিতে চাইছিলুম তার মর্ম্ম বুঝলেন না। তিনি নেহাৎই সেকালে, অসভ্য লোক ছিলেন তাই আমাদের আজকালকার সভ্য রীতি-নীতিগুলো তাঁর পছন্দ হ'ল না—তাই ঐ গোবিন্দবাবুর ঘাড়ে ভর ক'রে আমায় একবার ভয় দেখিয়ে গেলেন। তা দেখ "যস্মিন দেশে যদাচার"—ও ভূতকে ঘেঁটিয়ে কাজ নেই, সে যে রকম চাইচে সেই রকমই করা যাক। দেখ যদি 'অসভ্য-মানুষ' হোত তাহলে না হয় তাকে বুঝিয়ে, সুঝিয়ে আজকালকার এই নবযুগের-উপযোগী-জ্ঞান দান ক'রে সভ্য ক'রে তুলতুম—এ 'অসভ্য-ভূত', একে সভ্য করি কি ক'রে?"

হরিচরণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"আপনার বোধ হয় মনের ভুল হ'য়ে কি দেখতে কি দেখেছিলেন।"

শরৎচন্দ্র মহা কুপিত হইয়া বলিল—"হাঁ মনের ভুল বই কিরে মূর্খ্য। যদি সেখানে তখন থাকতে তাহলে ব্যাপার বুঝতে পারতে। অন্য জায়গা থেকে সকলেই ওরকম 'মনের ভুল ব'লে' সাহস দেখাতে পারে।

আমি কি একটা গাধা যে, ঠিক না বুঝে, মনের ভুলে অমনই যা, তা একটা ভেবে নিয়েছি। এখন ওসব কথা যাক, তোমাদের সঙ্গে বিশেষ একটা পরামর্শ আছে, শোন।”

এই কথার পর তিনজনে মিলিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিল। শরৎচন্দ্র কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিল, ঐ দুই ভ্রাতায় পর্য্যায়ক্রমে তাহার উত্তর করিল; এইভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা ও তর্কাতর্কির পর শরৎচন্দ্র বলিল—“তোমরা যা বল্লে আমারও মনের ইচ্ছে তাই। আমি এ কথা আগে থেকে ভেবেও রেখেছি। যে রকম ব্যাপার দাঁড়াল তাতে আমি বাবার মৃতদেহের সৎকার আর শ্রাদ্ধশান্তি প্রভৃতি কাজ ঠিক নিয়ম মত ক’রে যাবো। এখন একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু তারপর একেবারে চিরদিনের মতন নির্ভাবনা হওয়া যাবে। শ্রাদ্ধ-শান্তি সব ঠিক নিয়ম মত হ’য়ে গেলে তখন আর ভূতের ভয় থাকবে না।”

হরিচরণ বিজ্ঞের মতন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—“নিশ্চয়ই না। মানুষ মরে গিয়ে প্রথমটায় ভূত হ’য়ে একটু-আধটু এদিক-ওদিক ঘোরে বটে কিন্তু শ্রাদ্ধ-শান্তি হ’য়ে গেলে তখন একেবারে এ তল্লাট ছেড়ে চলে গিয়ে হয় স্বর্গে ব’সে মাল্-টাল টেনে অপ্সরীদের সঙ্গে প্রেমালাপ করে, আর না হয়তো নরকে গিয়ে সেখানকার কাজ-কর্ম্ম বিনা-মাইনেয় করে আর যম-দুতদের চোখে ধুলো দিয়ে কি করে কাজে ফাঁকি মারবে, সেই মতলব আঁটে। দেখুন, এখন এই কটা দিন আপনি হিন্দুয়ানী মতে সব ক্রিয়া কর্ম্ম সেরে ফেলুন তাহলেই আপনার বাবার প্রেতত্ব মোচন হয়ে যাবে। তখন আপনি মনের সাধে বিলিতী-চাল চালুননা—কোনও মিঞা বাধা দিতে আসতে পারবে না।”

শরৎচন্দ্র সভয়ে বলিল—"হ্যাঁ, হাজার অসভ্যতা হ'লেও—উপস্থিত, বাবার মৃত্যুর জন্যে যে, যে বিধান, হিন্দুশাস্ত্রে আছে, একটা বামুনের কাছ থেকে জেনে নিয়ে, ঠিক মতন পালন ক'রে যাব। নইলে আজ যেমন গোবিন্দবাবুর ঘাড়ে ভর ক'রে বাবা আমায় মেরে ফেলতে আসছিল সেই রকম রেগে-মেগে যদি আবার কোনও দিন আসে তাহলে আমার বিলেতী-চা্ল একবারে ভাত হয়ে যাবে। ও হিন্দুধর্ম্ম বল ; তার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি যাই বল, সবেতেই ঘৃণা দেখাতে আর গালাগাল দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু এই মড়া-সংক্রান্ত কোনও কাজে আমি বাবা এক তিলও বেচা্ল দেখাতে বা কোনও রকম বিরুদ্ধ-কথা ব'লতে রাজী নেই। বাবা যতদিন ভূত থাকবে ততদিন আমি বাধ্য হয়ে এই সব বর্ব্বরতাময় নিয়ম পালন ক'রে যাব। তারপর এই সব শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ চুকে গেলে বাবা যখন আর ভূত থাকবে না তখন এই সবের চার গুণ শোধ দোব—ভূত হয়ে জোর ক'রে আমাকে দিয়ে এই সব বর্ব্বরতাময় হিন্দুয়ানীর কাজ করিয়ে নেবার ফল খুব ভাল ক'রে জানিয়ে দোব। তখন বাড়ীতে বসে রোজ দু'বেলা মুরগী—মুরগী শুধু—গরু পর্য্যন্ত খাবো ; সে সময় বাবা আমার কি ক'রতে পারে তা বুঝবো।"

মাধব সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"কিছুই ক'রতে পারবে না। এখন না হয় ভূত হ'য়ে আছেন ব'লে ভয় করা হচ্চে—তখন আর ঘোঁড়ার ডিমের কিসের ভয় ? তখন আপনি বাড়ীতে বসেই, শুধু মুরগী, গরু কেন —কচ্ছপ, ব্যাঙ, ছুঁচো, ইঁদুর, টিক্‌টিকি, গিরগিটী, এমন কি ইঁদুর-মাটী, আরসোলার-নাদী পর্য্যন্ত খান না ; আপনার বাবার, বাবারও ক্ষমতা হবেনা যে, তখন আপনার কোনও অনিষ্ট করে।"

শরৎচন্দ্র বলিল—“এখন ওসব কথা থাক। এখন চল ও-পাপ বিদেয় করে আসা যাক। বাবাকে টপ্ করে পুড়িয়ে আসা যাক চল।”

হরিচরণ একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল—“তাই চলুন। যখন এরকম হ্যাঙ্গাম উপস্থিত হোল তখন আর সভ্যতা বজায় রেখে কি ক'রে ওই মড়া বাড়ীতে রাখা যায় বলুন। আচ্ছা সাহেবেরা তো পাঁচ, সাত দিন ধ'রে বাড়ীতে মড়া ফেলে রাখে; কই তাদের তো এ রকম হ্যাঙ্গামায় প'ড়তে হয় না।”

মাধব মুরুব্বীয়ানা-চালে তাড়াতাড়ি বলিল—“তারা রাখবার প্রক্রিয়া জানে তাই তাদের কোনও হ্যাঙ্গামায় প'ড়তে হয় না। সাহেবদের কাছ থেকে এবার আমাদের ওই প্রক্রিয়াটা শিখে নিতে হবে; কি বলেন বাবু? আপনার বাবার মৃত্যুতে ঠেকে শেখা গেল। তাই যাক, তাঁর বেলায় যা হবার হ'য়ে গেল; এবার আপনার মা যখন মারা যাবেন তখন তাঁর বেলায় সে প্রক্রিয়াটা কাজে লাগান যাবে।”

শরৎ ব্যস্ত ভাবে বলিল—“না, না, ওসব প্রক্রিয়া-ফ্রক্রিয়া শিখে কাজ নেই। ও মড়া সংক্রান্ত কোনও কাজে আর কোনও বেচাল চালব না—এই নাকে কাণে খৎ। আমার প্রাণটাই যদি চলে যায়—তাহলে আর আমার চাল চালবার অবসর কোথায় পাব।”

শরতের কথা শেষ হইতেই মাধব কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় গোবিন্দবাবু আসিয়া তাহাদের ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

— ——

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তারপর ?—তারপর শরতের পিতাঠাকুর ৺নবীনচাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়মিতরূপে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তারপর তাঁহার শ্রাদ্ধও একরূপ নিয়ম মত হইল বটে কিন্তু তাহা দেশী ও বিলাতী ভাবে মিশ্রিত হইয়া একটা খিচুড়ীভাবাপন্ন হইয়া সম্পন্ন হইল। এ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজন হইল, দরিদ্র-নারায়ণদের ভাল করিয়া বিদায় দেওয়া হইল এবং কতক নিমন্ত্রিতকে আসন পাতিয়া ও পাতা পাতিয়া দেশী খাদ্য খাওয়ান হইল আবার কতক নিমন্ত্রিতকে চেয়ার টেবিলে বসাইয়া বিদেশী খাদ্য খাওয়ান হইল। একদিন হরিনাম সংকীর্ত্তন হইল আবার আর একদিন শরৎচন্দ্রের ভূতপূর্ব্ব গৃহ-শিক্ষক ও তাহার স্বর্গীয় পিতার জন কয়েক নব্য, ভব্য, সভ্য বন্ধুগণ মিলিত হইয়া পিয়ানো বাজাইয়া গান ও উপাসনা করিলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু সংকীর্ত্তনেও যায় নাই এবং ঐ উপাসনায়ও যোগদান করে নাই। যাহা হউক মোটের উপর নবীনচাঁদের শ্রাদ্ধ বেশ সমারোহ সহকারে হইয়া গেল। পাড়ার পাঁচ জনে বেশ সুখ্যাতিও করিল; সংবাদপত্রেও ইহার সুখ্যাতি বাহির হইল। তবে দুই এক জন নেহাৎ ঠোঁটকাটা লোক ঐ খিচুড়ী-ভাবের কথাটা ভয়ে ভয়ে উত্থাপন করাতে অন্য কয়েকজন ব্যক্তি তাহাদের একটু ধমকাইয়া দিয়া বলিলেন যে—“ও রকম নিয়ম আজকাল সমাজের ভেতর চলে গেছে; ওতে কোনও দোষ নেই। আজকাল শুধু শ্রাদ্ধে কেন, বিয়ে, উপনয়ন,

অন্নপ্রাশনে সবেতেই হিন্দুধর্ম্মেরও আচার-ব্যবহারের আশ্রয় নেওয়া হয় আবার মুসলমান ও খৃষ্টান-ধর্ম্মেরও আচার-ব্যবহারের আশ্রয় নেওয়া হয়। এতে আর দোষ কি ? আজকালকার এই নব-শিক্ষার দিনে এই রকম ক'রলে তবেতো ভ্রাতৃভাব দেখান হবে—তবেতো উদারতা দেখান হবে।"

এই কথা শুনিয়া প্রথমোক্ত-শ্রেণীর ঠোঁটকাটা লোকেরা ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া গেল কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন লোক চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা খুড়ো যদি তাই হবে তাহলে যাদের কাছ থেকে এই নব-শিক্ষা পেয়েছ কই তারা তো এ রকম খিচুড়ীর কাজ করে না। বরঞ্চ তাদের কাছে গিয়ে, তাদের বিবাহ প্রভৃতি কোনও অনুষ্ঠানে তাদের ধর্ম্মের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের আচার ব্যবহার মেশাতে বল দেখি, তাহলে তারা মারের চোটে তোমার ঐ ভ্রাতৃভাবকে, অভাবে দাঁড় করিয়ে দেবে। আর সেই রকম হলে তবে যদি উপযুক্ত হয়।"

ঠোঁটকাটা লোকের এই কথার উত্তরে ঠোঁটওয়ালা বাবুরা কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মুখ হইতে কেবল বাহির হইল—"য়্যাঁ? য়্যাঁ?"

এখন কিছুদিন ইঁহারা এইরূপ "য়্যাঁ—য়্যাঁ" করিতে থাকুন, আসুন আমরা, আমাদের উপাখ্যানের অনুসরণ করি।

আপনারা প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত 'শরৎচন্দ্রের চুল কামান পর্ব্বের' কথা বোধ হয় ভুলেন নাই ? ভূতের ভয়ে শরৎচন্দ্র, তাহার পিতার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যের প্রথমটায় বেশ নিয়ম পালন করিয়া যাইতেছিল। 'কোনও অনিয়ম করিলে পাছে তাহার পিতা ভূত হইয়া আসিয়া তাহার ঘাড়টি

মটকাইয়া দেন তাহা হইলে তাহার এত বড় সম্পত্তিটা ভোগ করা হইবে না এবং প্রাণটাও যাইবে' এই ভয়ে সে, সমস্ত নিয়ম পালন করিবে বলিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল এবং এমনকি তাহার অত সাধের চুল গুলিকে অবধি কামাইয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময় সেই পদ্ম-পুরাণাচার্য্য ও পাতালখণ্ডতীর্থ পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং উপযাচক হইয়া বিধান দেওয়াতে সে—তাহা শাস্ত্র-সম্মত সুতরাং আশঙ্কার কোনও কারণ নাই—এই ভাবিয়া তবে সে বিধান গ্রহণ করিয়াছিল। এবং পুরোহিত মহাশয়ের নিকট, ঐরূপ বিধান লওয়ার সন্ধান পাইয়া, সে মধ্যে মধ্যে পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিয়া, তাহার যে সব কার্য্যে অসুবিধা বোধ হইত, সেই সকল কার্য্য হইতে বিরতির জন্য বিধান ক্রয় করিতে চাহিত। পুরোহিত মহাশয়ও তাঁহার নিজের প্রাপ্য-গণ্ডা বজায় রাখিয়া তবে বিধান বিক্রয় করিতেন। অর্থাৎ যে সকল কার্য্য বাদ দিলে তাঁহার নিজের কোনও আর্থিক ক্ষতি নাই সেই সব কার্য্যের বেলা তিনি তাহা বাদ দিবার অনুমতি দিতেন কিন্তু যে সকল কার্য্য বাদ দিলে তাঁহার পাওনা-গণ্ডা বাদ যায় তিনি সে সকল কার্য্য বাদ দিবার অনুমতি দিতেন না এবং 'তাহা বাদ দিলে বড়ই অমঙ্গল হইবে' এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।

নবীনচাঁদের মৃত্যুর পর এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের ভিতর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে নাই। নবীনচাঁদ অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; শরৎচন্দ্র মনের আনন্দে তাহা ভোগ করিতেছে। নবীনচাঁদের বিলাতী কাপড়ের কারবার পূর্ব্বে যেরূপ চলিত এখন তাহা অপেক্ষা আরও ভাল চলিতেছে। কারণ দেশে এখন

এই দ্রব্যের চাহিদা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে হইয়াছে এবং পিতার মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র এই ব্যবসায়ে—গোবিন্দবাবুর পরামর্শে—আরও অনেক টাকা ঢালিয়াছে। এখন একমাত্র এই বিলাতী কাপড়ের কারবার হইতে তাহার মাসিক, সমস্ত খরচা বাদে, প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা আয় হইত; ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা ছিল এবং দুইখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী ও কিছু টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল। এই সমস্ত হইতে মাসিক প্রায় বারশত টাকা আয় হইত। ইহাদের ব্যবসায়ের আয়ই বেশী, ভাড়াটিয়া-বাড়ী প্রভৃতি হইতে সামান্য আয়ই হইত। ইহার কারণ এই যে নবীনচাঁদ যত উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহার বেশীর ভাগ বরাবরই ব্যবসাকার্য্যে ঢালিয়াছেন; অন্য ব্যাপারে অতি সামান্যই দিতেন। তিনি অগ্রে ব্যবসাটাকে বাড়াইতে চাহিতেন পরে বিষয় সম্পত্তি বাড়াইবার সঙ্কল্পকে মনে স্থান দিতেন।

নবীনচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার সাংসারিক বিলি-ব্যবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাটিতে একজন বৃদ্ধ সরকার ছিল, সেই বাটির সব কার্য্য দেখিত এবং গোবিন্দবাবু ব্যবসার সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেন।

শরৎচন্দ্র খায়, ঘুমায়; সহচরদ্বয়কে লইয়া গল্পগুজব করে; তাস, দাবা খেলে এবং মধ্যে মধ্যে থিয়েটার দেখিয়া এবং নাটক, নভেল ও খবরের কাগজ পড়িয়া দিন যাপন করে। শরৎচন্দ্রের কোনও ভাবনা নাই, দিব্য আরামে দিন কাটিতেছে। ভাল ভাল পোষাক পরিয়া, নানারূপ সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়া, গাড়ী জুড়ী চড়িয়া ও পরচর্চ্চা করিয়া বেশ আনন্দেই আছে। শরৎচন্দ্রের বিলাসিতা এখন চরমে উঠিয়াছে। মাসিক পাঁচ ছয় হাজার টাকার কমে এখন আর তাহার খরচ চলে না।

শরৎচন্দ্রের মাতা মোক্ষদাসুন্দরী এখন পূজা, অর্চ্চনা ও দান, ধ্যান করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছেন। নানারূপ বার-ব্রত করিয়া ও তদুপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ-ভোজন, দরিদ্র-নারায়ন ভোজন করাইয়া ও অর্থ বস্ত্র, তৈজস-পত্র প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য দান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার ও মনের যথার্থ তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। তিনি যে কেবল এই সকল কার্য্য লইয়াই ছিলেন, তাহা নহে। প্রয়োজনাতিরিক্ত দাস, দাসী, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মনী প্রভৃতি থাকিতেও তিনি সংসারের সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি, অন্তঃপুর-কর্ত্রীর কর্ত্তব্য ঠিকমত পালন করিতেন। পরের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতেন না।

তাঁহাদের বাটির অন্দর-মহলে একটি নাতিবৃহৎ কক্ষ পুরবাসীদের দ্বারা "ভাঁড়ার-ঘর" নামে অভিহিত হইত। সেই ঘরে সংসারের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্যই থাকিত। তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানাদির পর সর্ব্বাগ্রে এই ঘরে আসিয়া নিত্য-প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য নিজের হাতে বাহির করিয়া দিতেন। তারপরে পূর্ব্ব-কথিত ঠাকুর-ঘরে গিয়া নিজের পূজার্চ্চনা করিতেন এবং তৎপূর্ব্বে শ্রীরাধা কৃষ্ণের নিত্য-সেবার যোগাড় নিজ হস্তে করিয়া দিতেন। পরের উপর ঠাকুর সেবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না—থাকিতে পারিতেন না।

ইহা ব্যতীত, বার-ব্রত উপলক্ষে যখন যেমন প্রয়োজন পড়িত তখন তদনুরূপ কর্ম্ম করিতেন। বাটির সকলের আহারাদির ও সুখস্বচ্ছন্দতার সংবাদ নিজে লইতেন এবং প্রতিদিন দুইবার পুত্রের আহারের সময় তাহার নিকটে বসিয়া খাওয়াইতেন; তা—ইয়ারকি দেওয়া সমাপন করিয়া

পুত্রের খাইতে আসিতে যত বেলা হউক বা যত রাত্রিই হউক এবং তিনি নিজে যতই কেন পরিশ্রান্ত থাকুন না।

সারাদিবসের কার্য্যের পর সন্ধ্যাকালেও, তিনি আলস্যে না কাটাইয়া —পুরাণপাঠ শ্রবণ করিতেন। একজন সু-ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নানারূপ ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং মোক্ষদাসুন্দরী ও তাঁহার দুই বিধবা ভগ্নী এবং—এমন কি তাঁহার ন্যায় পুণ্যবতী মহিলার সংসর্গের গুণে—বাটীর দাসী প্রভৃতি অন্তঃপুরস্থ সকলেই সেই পাঠ শ্রবণ করিতেন।

মোক্ষদাসুন্দরী বর্ত্তমান অবস্থায় একরূপ বেশ সুখেই ছিলেন কিন্তু একটি পুত্রবধূর অভাবের জন্য তাঁহার মনে একেবারেই সুখ ছিল না। এতদিন এক রকম কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি এ অভাবটা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন। তাঁহার সংসারে ভাঁড়ারনী, ব্রাহ্মণী, চাকরাণী প্রভৃতি অনেকেই ছিল, কিন্তু তাঁহার আপনার-লোক বলিতে কেহই ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার নিজ হাতে পাতা সংসার তাঁহার নিকট খাঁ, খাঁ করিতে লাগিল। এই সময় পুত্র শরৎচন্দ্রের বিবাহ দিয়া একটি নব বধূর মুখ দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণে বড়ই আগ্রহ হইতে লাগিল।

তাঁহার মনের বড় সাধ যে, তিনি শরতের বিবাহ দিয়া একটি সুন্দরী ও সদ্বংশসম্ভূতা কন্যাকে আনিয়া তাহাদের সংসার নূতন করিয়া পাতিয়া দেন এবং কিছুদিন পরে পৌত্রমুখ দর্শন করিবার পর তিনি এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামে বাস করিয়া তথায় জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া অবশেষে মৃত্যুর পর একেবারে মোক্ষলাভ করেন। তাঁহার মনের সাধ কিন্তু এখনও, সেই পূর্ব্বেকার মতন,

মনেই রহিয়া গেল। সহস্র অনুরোধ ও বিবিধ প্রকারেরর বিধিমত চেষ্টা সবই বিফল হইল। শরৎচন্দ্র বিবাহ করিতে রাজী হইয়া ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি হইতে রাজী হইল না। সে পূর্ব্বেকার মতন এখনও সেই Public property হইয়াই রহিল।

মোক্ষদাসুন্দরীর পিতৃকুলেও বড় একটা কেহ ছিল না। কোনও একটী ক্ষুদ্র পল্লিগ্রামে তাঁহার বাপের বাটি। সে বাটীতে বর্ত্তমানে পুরুষমানুষ কেহই নাই। মোক্ষদার দুইটি বিধবা খুড়তুতো বোন তথায় বাস করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহাদের দুইজনের কথা মোক্ষদাসুন্দরীর মনে পড়িল। তিনি স্বয়ং গোবিন্দবাবুকে তথায় পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার সেই খুড়তুতো বোন দুইটিকে নিজের কাছে আনাইয়া লইলেন।

মোক্ষদাসুন্দরী ভগ্নী দুইটিকে নিজের কাছে আনাইয়া অনেকটা সোয়াস্তি পাইলেন। তাঁহার শূন্য প্রাণটার কতকটা স্থান যেন পূর্ণ হইল। ইহাদের সহিত সুখ-দুঃখের কথা কহিতে পারিয়া, প্রাণের ব্যাথা জানাইতে পারিয়া তাঁহার দুঃখময় মনে কিঞ্চিৎ শান্তি হইল। মোক্ষদাসুন্দরী সংসারের কার্য্যে মনও দেন, সকলের সহিত বেশ হাস্যালাপও করেন কিন্তু তবুও তাঁহার মনটা যে সদা-সর্ব্বদাই একটা দুঃখে ও হুতাশে আচ্ছন্ন এটা সকলেরই চক্ষে পড়িয়া যায়। এবং সে দুঃখটি যে তাঁহার একমাত্র পুত্রের জন্য এটাও সকলেই জানে। তাঁহার ভগ্নী দুইটি আসিবার কিছুদিন পরে, একদিন পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিবার পর মোক্ষদাসুন্দরী, তাঁহার ভগ্নী দুইটির সহিত নির্জ্জনে বসিয়া খানিকক্ষণ কি পরামর্শ করিলেন এবং তৎপরদিন প্রাতঃকালেই একখানি পত্র লিখিয়া, সে পত্রটি সর্ব্বাগ্রে

এবং নিজ হস্তে ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিবার জন্ত, বাটির বৃদ্ধ সরকারের নিকট হুকুম পাঠাইলেন।

পত্রখানি পাঠাইবার পর হইতে মোক্ষদাসুন্দরীকে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল বোধ হইতে লাগিল।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তীর্থরাজ হরিদ্বারের ভিতর যাইয়া আরও দুই, তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যাইলে গঙ্গাতীরে, লোক-বিরল পর্ব্বতের পাদদেশে জনৈক মহাপুরুষ বাস করেন। স্থানীয় সকল লোকেই এই মহাপুরুষকে জানে, তাঁহার অলৌকিক যোগ-প্রভাব ও ধর্ম্মবলের কথাও জানে। কিন্তু, এই সন্ন্যাসী যে কতদিন হইতে এইস্থানে বাস করিতেছেন, সে কথা কেহই বলিতে পারেনা। সকলেই বলে যে, তাহারা তাহাদের পিতৃ-পিতামহের মুখ হইতে শুনিয়াছে যে—তাঁহারাও এই সন্ন্যাসীকে তাঁহাদের জ্ঞান-বিকাশের সময় হইতেই ঐ স্থানে দেখিয়া আসিতেছেন।

আমাদের নবীনচাঁদও, জীবদ্দশায় একবার তীর্থপর্য্যটন মানসে বাটী হইতে বাহির হইয়া অনেক তীর্থ ঘুরিয়া যখন হরিদ্বারে আসেন; তখন স্থানীয় লোকের মুখে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্যজনক কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে যান।

নবীনচাঁদ শান্তি ও ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। সঙ্গে কেবলমাত্র স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী ও একটি পরিচারক এবং একটি পরিচারিকা মাত্র লইয়াছিলেন। খুব ধূমধাম ও বাহ্যিক আড়ম্বর না করিয়া, বেশ সাধাসিধা ভাবে বাটি হইতে বাহির হইয়াছিলেন।

উক্ত মহাপুরুষের কথা শুনিবার পরই তাঁহার চরণ দর্শন মানসে তৎক্ষণাৎ তাঁহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের সঙ্গে

সাক্ষাতের পরে এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতোপম কথাবার্ত্তা শুনিবার পরে নবীনচাঁদ, তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অবশেষে এক শুভদিনে ও শুভযোগে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তারপর দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এতদিনের মধ্যে নবীনচাঁদ আর একবার মাত্র শ্রীগুরুর শ্রীচরণ দর্শন মানসে এখানে আসিয়াছিলেন এবং দুইবার, দুইটি বিপদে পড়িয়া গুরুদেবের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া, পত্রযোগে শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে মোক্ষদাসুন্দরী বিপদে পড়িয়া, বহুদিন পরে আবার শ্রীগুরুকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। এইস্থানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল এই যে, এই মহাপুরুষকে কোনও পত্র লিখিতে হইলে তাঁহার শিষ্যগণ, হরিদ্বারস্থ জনৈক ধনবান ব্যক্তির নিকট সেই পত্রখানি পাঠাই-তেন। এই ধনবান লোকটিও এই মহাপুরুষের শিষ্য। তাঁহার নিকট—গুরুদেবের নামীয় পত্র আসিলেই, তিনি স্বয়ং সেই পত্র লইয়া গিয়া মহাপুরুষের চরণ প্রান্তে দিয়া আসিতেন।

মহাপুরুষের নিকট দুই, চারিজন সন্ন্যাসী-শিষ্য অবস্থান করিত এবং অনেকগুলি যোগ-শিক্ষার্থী-শিষ্য প্রতিদিন আগমন করিত। এতদ্ব্যতীত জ্ঞান-প্রার্থী, উপদেশ-প্রার্থী, দর্শন-প্রার্থী প্রভৃতি অনেক লোক সময়, সময় আসিত। একদিন প্রাতঃকালে যোগ-শিক্ষার্থী শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন যে—"তোমরা আমার নিকট তিনদিন এসোনি।"

গুরুদেবের মুখে সহসা এই কথা শুনিয়া শিষ্যবর্গ সকলেই বিস্মিত হইল। কারণ তাঁহার মুখে এরূপ কথা, ইহার পূর্ব্বে আর তাহারা কখনও শোনে নাই। উপদেশ-দানে বা শিক্ষা-দানে ইঁহার, কোনও দিনই ক্লান্তি বা বিরাম ছিল না।

সেইদিন অপরাহ্নে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষতলে বসিয়া মহাপুরুষ নানারূপ শাস্ত্রকথা কহিতেছিলেন। তাঁহার নিকটে সমস্ত শিষ্যবর্গ ও দুই, চারিজন নবাগত ব্যক্তি বসিয়াছিলেন; এমন সময় মোক্ষদাসুন্দরী-প্রেরিত সেই পত্রখানি তাঁহার নিকট পৌঁছিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি শিষ্য-বর্গকে বলিলেন যে—"আমি আজই এস্থান ত্যাগ ক'রে কলিকাতা অভিমুখে যাবো।"

গুরুদেবের মুখে এই সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনিয়া শিষ্যবর্গ বড়ই বিস্মিত হইল। কারণ—গুরুদেবকে এইস্থান ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে, তাহারা কখনও দেখে নাই। তাহারা বিস্ময়ভরে পরস্পরে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

মহাপুরুষ, শিষ্যগণের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"গ্যাখ—এতদিন কোথাও যাবার প্রয়োজন হয়নি তাই কোথাও যাইনি। কিন্তু আজ একটি বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে, তাই কলিকাতায় যাবো।"

মহাপুরুষের কথায় শিষ্যদের বিস্ময় দূর হওয়া দূরে থাক, তাহাদের বিস্ময়ভাব আরও বাড়িল। "প্রয়োজন? তাহাদের গুরুদেবের প্রয়োজন?" এ কথাটি তাহাদের মনে বড়ই আশ্চর্য্যভাবের সঞ্চার করিল।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর মহাপুরুষ বলিলেন—"গ্যাখ, তোমাদের মতন স্নেহভাজন আমার একটি শিষ্য, কোনও বিপদে প'ড়ে বড়ই সকাতরে

আমায় আহ্বান ক'রেছেন। তাঁর মনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি তাঁদের বাটিতে একবার উপস্থিত হ'লেই তাঁর সমস্ত বিপদ ও অশান্তি দূর হ'য়ে যাবে। এ জগতে অতি দুষ্প্রাপ্য, অমূল্যরত্ন যে বিশ্বাস, আমি সেই বিশ্বাস নষ্ট ক'রতে চাই না। সেই জন্যে আমায় কলিকাতায় যেতেই হবে। আজই সন্ধ্যার পর আমি এ স্থান থেকে যাত্রা ক'রব।"

সেইদিন সন্ধ্যার পরই মহাপুরুষ সেইস্থান ত্যাগ করিলেন। তৎপরে কলিকাতায় উপনীত হইয়া তিনি শরৎচন্দ্রের বাটিতে পদধূলি দান করিলেন।

বাহুল্যভয়ে এইস্থানে পূর্ব্ব-কথার পুনরুক্তি না করিয়া সংক্ষেপে পর-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম।

মোক্ষদাসুন্দরী গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, গলার কাপড় দিয়া প্রণাম করিয়া—তাঁহার মত যোগী-সন্ন্যাসী যে যোগ,তপ ছাড়িয়া এবং অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া, কেবলমাত্র পরের কল্যাণার্থ এতদূর আসিয়াছেন, সেজন্য ভক্তিসহকারে প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। তৎপরে সময়োচিত দুই, চারিটি কথার পর মোক্ষদাসুন্দরী, তাঁহার বিপদ ও অশান্তির সমস্ত কথা শ্রীগুরুর চরণে নিবেদন করিলেন।

মহাপুরুষ সমস্ত কথা শুনিয়া, অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া, বলিলেন—"সকলই অদৃষ্ট মা—তুমি আমি তার কি ক'রব বল?"

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন—"বাবা আপনার দয়া হলেই আমার ছেলে ঠিক ভাল হবে। আমার একটি মাত্র ছেলে; আমার সকল আশা, ভরসা সুখ, শান্তি সবই ওই ছেলের ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু ঐ ছেলে আমাদের ইচ্ছার ঠিক বিপরীত ভাবে চলছে। ভিন্ন-ধর্ম্মীর আচারে,

ব্যবহারে নিজের জীবন কাটাচ্ছে। এ জগতে কেবল মাত্র নিজেরই সুখ নিজেরই আরাম সার করেছে। সে, এই অগাধ বিষয়ের মালিক হয়েছে, সে মনে করলে কত সৎ কাজ করতে পারে, কত লোকের ভাল করতে পারে কিন্তু সে সবে তার একদম মন নেই। গরীব, দুঃখী এসে দুঃখ জানালে, তাদের কিছু দেওয়া দূরে থাক, তাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাক উল্টে তাদের পুলিশে দিতে চায়। কোনও রকম ভাল কাজে তার মন নেই, কেবলমাত্র নিজের বিলাসিতা আর হীন-সুখের দিকে মন আছে। আর সে, আমার একটি মাত্র ছেলে তার বিয়ে হবে তবে আমার স্বামীর বংশ বজায় থাকবে' এই ইচ্ছাই এখন আমার প্রাণের অর্দ্ধেকটা স্থান অধিকার করে আছে ; এর জন্য তাকে আমি কত অনুরোধ করেছি, কত দুঃখ জানিয়েছি, মা হয়ে তার হাতে পর্য্যন্ত ধরেছি কিন্তু কিছুতেই ওকে রাজী ক'রতে পারিনি। এই কথার উত্তরে কতকগুলো এমন অশ্রাব্য কথা বলে—তা আর আপনাকে কি ক'রে ব'লব।" ইত্যাদি, ইত্যাদি শরৎচন্দ্র ঘটিত সমস্ত কথা বলিয়া মোক্ষদা-সুন্দরী করজোড়ে, গুরুর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

শ্রীগুরু বলিলেন—"তাইত বড়ই বিপদের কথা ; তা মা আমি সন্ন্যাসী মানুষ ; আমি এর কি ক'রব বল ? আমি তো আর তোমার পুত্রের বিয়ের ঘটকালী ক'রে একটি সুলক্ষণা কন্যা অন্বেষণ ক'রে দিতে পারি না। কিংবা, আমার এমনও সময় নেই যে আমি কিছু কাল যাবৎ দিবারাত্র ওর সঙ্গে থেকে ওকে সৎপথে নিয়ে আসি। আমায় মা বৃথা কেন ডেকে আনলে ?"

মোক্ষদাসুন্দরী ভক্তিভরে বলিলেন—"আপনার দ্বারাই আমার বিপদ

সাক্ষাতের পরে এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতোপম কথাবার্ত্তা শুনিবার পরে নবীনচাঁদ, তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অবশেষে এক শুভদিনে ও শুভযোগে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তারপর দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এতদিনের মধ্যে নবীনচাঁদ আর একবার মাত্র শ্রীগুরুর শ্রীচরণ দর্শন মানসে এখানে আসিয়াছিলেন এবং দুইবার, দুইটি বিপদে পড়িয়া গুরুদেবের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া, পত্রযোগে শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে মোক্ষদাসুন্দরী বিপদে পড়িয়া, বহুদিন পরে আবার শ্রীগুরুকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। এইস্থানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল এই যে, এই মহাপুরুষকে কোনও পত্র লিখিতে হইলে তাঁহার শিষ্যগণ, হরিদ্বারস্থ জনৈক ধনবান ব্যক্তির নিকট সেই পত্রখানি পাঠাইতেন। এই ধনবান লোকটিও এই মহাপুরুষের শিষ্য। তাঁহার নিকট—গুরুদেবের নামীয় পত্র আসিলেই, তিনি স্বয়ং সেই পত্র লইয়া গিয়া মহাপুরুষের চরণ প্রান্তে দিয়া আসিতেন।

মহাপুরুষের নিকট দুই, চারিজন সন্ন্যাসী-শিষ্য অবস্থান করিত এবং অনেকগুলি যোগ-শিক্ষার্থী-শিষ্য প্রতিদিন আগমন করিত। এতদ্ব্যতীত জ্ঞান-প্রার্থী, উপদেশ-প্রার্থী, দর্শন-প্রার্থী প্রভৃতি অনেক লোক সময়, সময় আসিত। একদিন প্রাতঃকালে যোগ-শিক্ষার্থী শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন যে—"তোমরা আমার নিকট তিনদিন এসোনা।"

সাক্ষাতের পরে এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতোপম কথাবার্ত্তা শুনিবার পরে নবীনচাঁদ, তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অবশেষে এক শুভদিনে ও শুভযোগে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তারপর দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এতদিনের মধ্যে নবীনচাঁদ আর একবার মাত্র শ্রীগুরুর শ্রীচরণ দর্শন মানসে এখানে আসিয়াছিলেন এবং দুইবার, দুইটি বিপদে পড়িয়া গুরুদেবের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া, পত্রযোগে শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে মোক্ষদাসুন্দরী বিপদে পড়িয়া, বহুদিন পরে আবার শ্রীগুরুকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। এইস্থানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল এই যে, এই মহাপুরুষকে কোনও পত্র লিখিতে হইলে তাঁহার শিষ্যগণ, হরিদ্বারস্থ জনৈক ধনবান ব্যক্তির নিকট সেই পত্রখানি পাঠাই-তেন। এই ধনবান লোকটিও এই মহাপুরুষের শিষ্য। তাঁহার নিকট—গুরুদেবের নামীয় পত্র আসিলেই, তিনি স্বয়ং সেই পত্র লইয়া গিয়া মহাপুরুষের চরণ প্রান্তে দিয়া আসিতেন।

মহাপুরুষের নিকট দুই, চারিজন সন্ন্যাসী-শিষ্য অবস্থান করিত এবং অনেকগুলি যোগ-শিক্ষার্থী-শিষ্য প্রতিদিন আগমন করিত। এতদ্ব্যতীত জ্ঞান-প্রার্থী, উপদেশ-প্রার্থী, দর্শন-প্রার্থী প্রভৃতি অনেক লোক সময়, সময় আসিত। একদিন প্রাতঃকালে যোগ-শিক্ষার্থী শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন যে—"তোমরা আমার নিকট তিনদিন এসোনা।"

বাবু। তোমার মনিব, ওই শরৎবাবু, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যে রকম হাত-পা খেঁচছিল আর দাঁত-মুখ খিঁচোচ্ছিল তাতে আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে, ও বাবুকে শেয়ালে কামড়েচে। আমাদের দেশে সেদিন একটা লোককে শেয়ালে কামড়েছিল, সে লোকটা শেয়ালে কামড়াবার পর থেকে প্রথমটায় ঠিক ওই রকম খেঁচতে লাগলো আর দাঁত-মুখ খিঁচোতে লাগলো; তারপর তিন, চারদিন বাদে "হুক্কা হুয়া" ক'রে শেয়াল ডাকতে, ডাকতে মরে গেল। তুমি দেখে নিও মেজখুড়ো, তোমার বাবুও তিন, চার দিন, বড় জোর পাঁচ, সাত দিনের মধ্যে ওই রকম "হুক্কা হুয়া" ক'রে শেয়াল ডাকতে, ডাকতে মরবে। বাপরে! চাকরী আমার মাথায় থাক; শেষটা কি চাকরীর জন্যে পৈত্রিক প্রাণটা খোয়াব। ও শালার রোগে যাকে কামড়াবে সেই মরবে।; তোমার বাবু শেষকালে কোনওদিন যদি শেয়ালের মাথায় আমায় ঠেসে এক কামড় মারে তা.হলে আমাকেও ওই রকম "হুক্কা হুয়া" ক'রে মরতে হবে।"

এই কথা শুনিয়া দীনুতো হাসিয়া আকুল। সে হাসিতে, হাসিতে বলিল—"ওরে পাড়াগেঁয়ে ম্যাড়া, ও বাবুকে শেয়ালে কামড়াবে কেন রে? ও বাবু টেরি বাগাবার সময় রোজই ওই রকম করে।"

নূতন-চাকরটি বলিল—"হ্যাঁ রোজই ওই রকম করে। পাড়াগেঁয়ে লোক ব'লে কি আমায় একেবারে বাঁদর মনে কর নাকি? সুস্থ শরীরের সহজ মানুষ কি কখনও ঐ রকম করে খেঁচতে থাকে নাকি। দরকার নেই আমার চাকরীতে—।" এই কথা বলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

দীনু অতি ব্যস্তভাবে বলিল—"আরে শোন, শোন; আমার কথাটাই শোন।" আর শোন—সে ব্যক্তি ততক্ষণে এক দৌড়ে পগার পার।

ঠিক এই রকম নয়; কিন্তু এই রকম ধরণের ঘটনা মধ্যে, মধ্যে ঘটিত। একদিনের একটা ঘটনার কথা আপনাদের শুনাইয়া রাখিলাম। এখন এইবার; যে কথা হইতেছিল, সেই কথার সূত্র ধরা যাক।

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ ধরিয়া ঐরূপভাবে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইবার পর; ধীরে ধীরে আয়নার নিকট হইতে একটু সরিয়া গিয়া পোষাক পরিতে লাগিল। কামিজ, পরিয়া কলার ও নেকটাই পরিতে প্রায় পনের মিনিট কাটিয়া গেল। তারপর কোট পরিয়া আবার আয়নার সম্মুখে আসিয়া, মাথায় Rigaud'এর খানিকটা Lotion ঢালিয়া দিল। তারপর একখানি রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে তাহার বড় প্রিয় এবং বিলাসী ধনীগণের অতি প্রিয় Coty'র এক শিশি এসেন্সের প্রায় অর্দ্ধেকটা রুমালে ঢালিয়া দিল এবং বাকী অর্দ্ধেকটা পোষাকে ঢালিয়া দিল। এইরূপ ভাবের সাজগোজ প্রতিদিনই হয়। ইহাতে কত অর্থ অপব্যয়িত হয়! এক, একটা স্যুট্ দেড়শত হইতে সাড়ে চার শত টাকা মূল্যে প্রস্তুত হইয়াছে এবং দুই, চারিবার ব্যবহারের পর তাহা আর ব্যবহৃত না হইয়া বাক্সজাত হয় ও অবশেষে নষ্ট হইয়া যায়। একখানি Paiseley রুমাল কিনিতে পাঁচ, ছয় টাকা ব্যয় হয় এবং এক শিশি এসেন্স তের টাকা হইতে ত্রিশ টাকা অবধি মূল্যে ক্রীত হয়। দেশে কত লোক না খাইতে পাইয়া মারা যায়, অর্থাভাবে কত লোক এক বেলাও পেট ভরিয়া নুন-ভাত খাইতে পায় না; আর ধনী শরৎচন্দ্রের—অন্য সব ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র এসেন্স, রুমাল, লোসন, সাবান আর সিগারেটের জন্য প্রতিদিন একশত টাকার উপর খরচ হয়। হায় রে হৃদয়হীন ধনী শরৎচন্দ্র।

যাহা হউক, পোষাক পরিয়া, এসেন্স মাখিয়া মুখে খুব খানিকটা

পাউডার মাখিয়া শরৎচন্দ্র মুখটাকে সাদা করিবার চেষ্টা করিয়া, সিঁতা কাটিয়া ফেলিল। তারপর আরসীতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে, দেখিতে—নিজের রূপে নিজেই মোহিত হইয়া গেল। নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে, দেখিতে সহসা তাহার মনে হইল যে, তাহার বন্ধুগণ সর্ব্বদাই বলে যে,—'শরৎবাবু অতি রূপবান, তাহার রূপ দেখিলে স্ত্রীলোক দূরের কথা পুরুষ অবধি পাগল হয়।' এই কথা স্মরণ হওয়াতে শরৎচন্দ্রের মন গর্ব্বে ভরিয়া গেল; তাহার চ্যাপটা নাকটা ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব, একটু ফুলিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে তাহার সহচর-যুগল হরিচরণ ও মাধব সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। তাহারা দুই ভ্রাতায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, শরৎ-চন্দ্রকে তদবস্থায় দেখিয়া, পরস্পরে একটু মুচকি-হাসি হাসিয়া, চোখে চোখে ইসারা করিল। জ্যেষ্ঠ হরিচরণ, শরৎকে বলিল—"বাবু অত ক'রে আরশীতে মুখ দেখবেন না—শেষটায় কি নিজের রূপে নিজে মোহিত হ'য়ে গিয়ে, নিজেই নিজের প্রেমে পড়ে যাবেন।"

হরিচরণের কথা শুনিয়া মহা আনন্দিত হইয়া শরৎচন্দ্র বলিল—"হ্যাঁ তুমিও যেমন; আমার চেহারা কি এতই ভাল নাকি? যে, যে দেখবে সেই প্রেমে পড়ে যাবে?"

হরিচরণ খুব দৃঢ়স্বরে বলিল—"নিশ্চয়ই। এ কথা শুধু আমি কেন, জগতের সকল লোকেই বলে।"

হরিচরণের কথা শেষ হইতে না হইতেই তাহার কনিষ্ঠ সহোদর মাধব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"সত্যি বাবু আপনার রূপ যথার্থই মুনিমনোহর। আপনার এই সুন্দর চেহারা, আপনার এই মুনিমনোহর রূপ দেখে,

আমাদেরই যখন স্ত্রীলোক হোতে ইচ্ছে ক'রে তখন না জানি স্ত্রীলোক-দের মনে কি হয়!"

এই কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্র মহা খুসী হইয়া গাল ভরিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার দেখাদেখি হরিচরণ ও মাধবও জোর করিয়া ও চেষ্টা করিয়া হাসিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র এইরূপ ভাবে হাসিতে' হাসিতে সহসা—একেবারে সহসা, মহা গম্ভীর হইয়া গেল এবং নিকটস্থ চেয়ারে হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া; একটী হাত বুকের উপর রাখিয়া, অন্য হাতটি গালের উপর দিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় কি চিন্তা করিতে লাগিল।

শরৎকে হাসিতে হাসিতে সহসা ঐরূপভাবে গম্ভীর হইতে দেখিয়া, তাহার সহচরদ্বয় একটু ভীত হইয়া মনে করিল যে, তাহারা হয়ত অজ্ঞাতে, শরতের মনঃপূত নয় এমন কোনও কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সেই জন্য শরৎ বিরক্ত হইয়া ঐরূপ গম্ভীর মূর্ত্তী ধারণ করিয়াছে। এই মনে করিয়া হরিচরণ বিনা কারণে শরতের কোটের ধুলা ঝাড়িতে, ঝাড়িতে বলিল—"বাবু, আনন্দ ক'রতে, ক'রতে আপনি হঠাৎ অমন গম্ভীর হ'য়ে গেলেন কেন? আমরা কি না জেনে কোনও অন্যায় কথা ব'লে ফেলেছি, যার জন্যে আপনি রাগ করে উঠলেন।"

শরৎচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দুই হাত বক্ষে রাখিয়া, বিজ্ঞের ন্যায় গম্ভীর ভাবে বলিল—"তোমাদের কথার আমার রাগ হয়নি বটে তবে বড় ভাবনা হয়েছে। দ্যাখ, আমার রূপ দেখে যদি একসঙ্গে পাঁচ, ছয়জন মেয়ে মানুষ আমায় ভালবেসে ফেলে তখন আমার কি দশা হবে?"

হরিচরণ বলিল—"আজ্ঞে তখন আপনার একাদশ বৃহস্পতির-দশা হবে। প্রেমের পক্ষে স্ত্রীলোক কি রকম জানেন? মুড়ীর পক্ষে কচি শশা যেমন—ঠিক তেমনি। আপনার সে দশা যখন হবে তখন আপনি মিলন-নুন মাখিয়ে পাঁচ ছয়টি কচি শশা দিয়ে প্রেম-মুড়ী চিবুতে থাকবেন।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই একচোট হাসিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র এরূপ উচ্চৈঃস্বরে এরূপ প্রচণ্ড হাসি হাসিল যে, তাহার সেই হাস্য-রবে; নিকটবর্ত্তী দুই চারিখানি বাটির ছোট, ছোট ছেলেমেয়েরা মহা-ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। সে সময় জনৈক গোয়ালা—"দুগ্ধে কতখানি জল দিয়াছে এবং তাহাতে কত লাভ করিবে—"এই কথা এক মনে ভাবিতে, ভাবিতে মাথার উপর এক বালতী দুগ্ধ লইয়া, শরতের কক্ষের সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া যাইতেছিল। সেই গোয়ালা বেচারা ঐ রকম অন্যমনস্ক ভাবে যাইতে, যাইতে সহসা, শরতের সেই ভীষণ ও প্রচণ্ড হাসির শব্দে "বাপরে" বলিয়া চমকাইয়া উঠিল এবং সঙ্গে, সঙ্গে তাহার মস্তকের উপরিস্থিত দুগ্ধের বালতী সবেগে ও সশব্দে উলটাইয়া পড়িয়া, দুগ্ধ সমেত রাস্তার উপর গড়াইতে লাগিল।

সহসা যে কি হইয়া গেল, তাহা গোয়ালা ব্যাচারা প্রথমটায় বুঝিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া ভ্যাবা-গঙ্গারামের মতন দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল এবং মহা আপ-শোষের সহিত ও নিষ্ফল-ক্রোধের সহিত বলিল—"ওঃ কোন্ শালা হাসলেরে! শালা নিশ্চয়ই মামদোর ছ্যানা কিংবা পেত্নীর পুষ্যিপুত্তর—

নয়ত মানুষের বাচ্ছা কখনও ওরকম ক'রে হাসতে পারে।" এইরূপ ধরণের নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে, করিতে গয়লার-পো শূন্য বালতী তুলিয়া লইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিল।

এদিকে ঘরের ভিতর বাবুদের হাসি থামিতে না থামিতে, একটি চাকর একটি ট্রেতে করিয়া চা, বিস্কুট, টোষ্ট করা রুটি, ডিমের পোচ্ প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল। শরৎচন্দ্র, সহচরদ্বয়কে লইয়া মনের সাধে সেই সকল দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। তৎপরে শরৎচন্দ্রের আদেশে সেই চাকরটি শরতের বড় প্রিয় সিল্কটিপটুড আবহুল্লা নামক ইজিপসিয়ান সিগারেটের বাক্স আনিয়া হাজির করিল। শরৎচন্দ্র ও তাহার সহচরদ্বয় সেই সিগারেট লইয়া উপর্য্যুপরি ধূমপান করিতে লাগিল। এই সিগারেটের জন্য শরতের প্রতিদিন বাইশ টাকা খরচ হইত।

একটি সিগারেট টানিতে, টানিতে শরৎচন্দ্র, সহচরদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ছাখ হরিচরণ আর মাধব, এক কাজ ক'রলে হয় না—দিন কতক বেড়িয়ে এলে হয় না? বাবা মারা যাবার পর থেকে মা প্রায়ই ব'লত যে—দিন কতকের জন্যে কলকেতা ছেড়ে মাকে তীর্থদর্শন করিয়ে আনতে, তা আমি এতদিন রাজী হইনি; ভাবতুম যে কলকেতা ছেড়ে কোথায় বিদেশে, বিদেশে ঘুরে ম'রব। তা ছাখ এখন ভাবছি যে, দিন কতক ঘুরে আসা যাক্। মন্দ কি, বেশ নতুন রকমের স্ফূর্ত্তী হবে। একটা টুরিষ্ট-কার ভাড়া ক'রে নোয়া যাবে—ও তীর্থদর্শন, ফীর্তদর্শন ও সব কিছু নয়—তবে হ্যাঁ, নানান দেশ ভ্রমণ ক'রে আসা যাবে।"

দেশ ভ্রমণের কথা শুনিয়া হরিচরণ ও মাধব আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। তাহারা কিছু বলিবার পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র বলিল—"ছাখ, আজ

খাবার সময় দুপুরবেলা মা কের আমায় অনেক ক'য়ে—তীর্থভ্রমণে নিয়ে যাবার কথা ব'লছিল। তা আমি এক রকম রাজী হয়েছি বটে কিন্তু তখন বললুম যে—হরিচরণ আর মাধব যদি আমার গাইড্ হয় তাহলে আমি এখনই যেতে রাজী আছি।"

একে দেশ-ভ্রমণে যাওয়া তার উপর টুরিষ্ট-কারে, শরতের মতন খোরচে লোকের সঙ্গে। এই চিন্তায় দুই ভ্রাতার মনে আনন্দিত হইয়াছিল। শরতের কথা শেষ হইতে না হইতেই হরিচরণ অতীব আনন্দের আবেগে বলিয়া উঠিল—"বাবু আমরা, আপনার গাইড্ হতে খুব রাজী—আপনি এখনই দেশ-ভ্রমণে চলুন। আপনি যদি দয়া ক'রে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যান তাহলে আপনার গাইড্ হওয়া কি ভাগ্যের—আমরা আপনার গারজেন্, আপনার গ্র্যাণ্ড-ফাদার অবধি হতে রাজী আছি।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"তা'হলে তোমরা যেতে রাজী ?"

দুই ভ্রাতায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"রাজী, রাজী, খুব রাজী; একশোবার রাজী, হাজারবার রাজী।"

শরৎচন্দ্র বলিল "দ্যাখ আজ হল শুক্রবার; শনি, রবি, সোম তিন দিন মাঝে থাক, মঙ্গলবার দিন এখান থেকে বেরুনো যাবে। এই তিন দিনের মধ্যে সব যোগাড়-যন্ত্র ক'রে নিতে হবে। আর হরিচরণ, আমি একখানা টেলিগ্রাম লিখে দিচ্ছি; তুমি কাল সকালে উঠেই এখানা নিজে হাতে পোষ্ট আফিসে নিয়ে গিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রবে। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমেই কাশীতে যাবো। বাবার বন্ধু একজন কাশীতে থাকেন, তিনি সেখানকার একজন বড় ব্যবসাদার আর খুব বড়লোক। আমি তাঁর কাছেই এই তারখানা পাঠাচ্ছি।" এই

কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র একটি ব্লটিং প্যাডের ভিতর হইতে একখানি টেলিগ্রাফ-ফরম্ বাহির করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া দিল :—

ভৈরবপ্রসাদ দোবে কাশী।

মাকে লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইতেছি কাশীতে সাতদিন থাকিব একটি ভাল বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিবেন বুধবার সকালের মেলের সময় ষ্টেশনে লোক পাঠাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ
৺নবীনচাঁদ ঘোষের পুত্র
কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ লেখা সমাপ্ত করিয়া, সেখানি হরিচরণের হাতে দিয়া শরৎচন্দ্র বলিল "ভাখ, প্রথমে কাশীতে যাবো। সেখানকার সব দেখে শুনে যাবার সময় বাবার ঐ বন্ধুর কাছ থেকে একজন বেশ এক্সপার্ট লোক নিয়ে নোবো—সে আমাদের সব পশ্চিমের ভাল, ভাল দেশ দেখিয়ে, আনবে।"

ইহার পর আরও অনেক কথাবার্ত্তা ও পরামর্শ হইবার পর, তিনজনে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। বাড়ীর ফটকের সম্মুখে জুড়ী ওয়েলারযুক্ত একটি উঁচু ধরণের বৃহৎ ল্যাণ্ডো দাঁড়াইয়াছিল। তাহাতে আরোহণ করিয়া তিনজনে বেড়াইতে চলিলেন। বাবুরা বেড়াইবার নাম করিয়া বাহির হইলেন বটে কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের আর বেড়ান হইল না—বেড়ান হইল বাবুর অশ্ব ও অশ্বিনীর।

বাবুর গাড়ী, গড়ের মাঠ দিয়া গিয়া, ইডেন গার্ডনের দক্ষিণ ফটকের

সম্মুখ দিয়া গিয়া বাঁয়ে মোড় ফিরিয়া গঙ্গার ধার দিয়া বরাবর দক্ষিণ মুখে চলিয়া গেল। বাবুর হইল সিগারেটের ধূম চাক্না দিয়া খানিকটা বায়ু ভক্ষণ আর বাবুর অশ্ব ও অশ্বিনীর হইল—যথার্থ ভ্রমণ ও তৎফল শারীরিক ব্যায়াম।

—————

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত ৺কাশীধাম। সম্মুখে সর্ব্বপাপ-নাশিনী জননী গঙ্গা—সলিলরূপিনী ব্রহ্মময়ী—প্রবাহিতা। এই কাশী-ধামের ধনী অধিবাসী ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভৈরবপ্রসাদের সংবাদ লইতে আপনারা এইবার পুণ্যতীর্থ কাশীধামে আসুন। আশা করি আপনারা ভৈরবপ্রসাদ দোবে মহাশয় ও তাঁহার কন্যা লছমী এবং তাঁহার মনোনীত, ভাবী-জামাতা' অযোধ্যানাথকে ভুলিয়া যান নাই। "ভৈরবপ্রসাদের, কন্যাকে শিক্ষিতা করিবার প্রয়াস ও অযোধ্যাকে ভাবী জামাতা নির্ব্বাচন করিবার বিবরণ এবং ভৈরবপ্রসাদের লাঠির কৃপায় কি করিয়া লছমী ও অযোধ্যা, তাঁহাকে লুকাইয়া, প্রেমালাপ করিত এবং অবশেষে একদিন সেই লাঠিগাছটি ছিল না বলিয়া ইহারা কিরূপ ভাবে ধরা পড়িয়া যায়" ইত্যাদি ইত্যাদি কৌতুকময় কাহিনী বোধ হয় আপনাদের মনে আছে।

একদিন প্রাতঃকালে ভৈরবপ্রসাদ তাঁহার সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে একখানি বড় কুশন্ চেয়ারে দুই পা তুলিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছেন, এবং এক লোটা, গঙ্গাজলে প্রস্তুত গরম চা পান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কিঞ্চিৎ দূরে একটি ছোট টেবিলের কাছে, লছমী ও অযোধ্যা দুইখানি ছোট কুশন্ চেয়ারে বসিয়া—কাপে করিয়া চা পান করিতেছে এবং নিবিষ্টচিত্তে নানারূপ গল্প, অস্ফুটস্বরে করিতেছে।

ভৈরবপ্রসাদের নিত্য আহারাদি করিবার অদ্ভুত রীতি ও দৈনিক

জীবন-যাপন করিবার অপরূপ প্রণালীর কথা বোধ হয় মনে আছে? আর তাঁহার সেই বিশাল উদরের ও বিরাট বপুর কথা বোধ হয় মনে আছেই। এতদিন উত্তম ছাতু ও ঘিউ খাইয়া তাঁহার সেই বিশাল ভুঁড়িটি আরও বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে।

তাঁহার সেই বোম্বাই জালার মতন বিশাল ভুড়িটি সম্মুখ দিকে উঁচু করিয়া, একখানি বড় চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া, কাপড়ের খুট দিয়া সেই লোটাটি দুই হস্তে ধরিয়া ভৈরবপ্রসাদ লোটাস্থ চা পান করিবার জন্য, লোটাটি মুখের নিকট লইয়া গেলেন কিন্তু লোটাটি গরম হইয়া যাওয়ার দরুণ চা পান করিতে পারিলেন না। গরম চা পূর্ণ সেই লোটা অর্থাৎ ঘটি, মুখে অল্পমাত্র ঠেকিতেই ঠোঁটে আঁচ লাগিতেছে; ভৈরব-প্রসাদ সেই জন্য দুই চারিটি ফুৎকার দিয়া আবার পান করিতে গেলেন কিন্তু পুনরায় ঠোঁটে আঁচ লাগিল। দুই একবার এইরূপ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে ভৈরবপ্রসাদ রাগিয়া উঠিলেন। তিনি এইবার রাগের চোটে সেই ঘটিটিকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, তাঁহার সেই মোটা গাল ফুলাইয়া খুব বড় বড় করিয়া চার পাঁচটি ফুৎকার দিয়া, টপ্ করিয়া ঘটিতে মুখ দিয়া সজোরে খানিকটা চা খাইয়া ফেলিলেন। ওই ভয়ানক গরম চা ঐরূপভাবে টপ্ করিয়া খাইয়া ফেলাতে ভৈরবপ্রসাদের ওষ্ঠাধর ও মুখের ভিতরটায় ভয়ানক আঁচ লাগাতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার হাত ও সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠাতে ঘটি হইতে চল্‌কাইয়া উঠিয়া অনেকটা গরম চা তাঁহার সেই বিশাল উদরের উপর পড়িয়া গেল। ভৈরবপ্রসাদ হস্তস্থিত ঘটিটি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং "জান্ গিয়ারে," "বাপরে জান্ গিয়ারে" বলিয়া তিড়িং-

মিড়িং করিয়া লাফাইতে লাগিলেন ও দুই হাত দিয়া পেট চাপড়াইতে লাগিলেন।

লছমী ও অযোধ্যা একমনে গল্প করিতেছিল। ভৈরবপ্রসাদের ষণ্ডের ন্যায় চিৎকারে এবং বানরের ন্যায় উলম্ফনে চমকিত ও বিস্মিত হইয়া তাহারা ছুটিয়া নিকটে আসিল এবং ব্যাপার বুঝিয়া, দুইজনে ভৈরবপ্রসাদের দুই হাত ধরিয়া "কিছু কিছু নয়; একটু গরম চা পোড়ে গেছে, সামান্য আঁচ লেগেছে মাত্র, এখনই সেরে যাবে"—প্রভৃতি বলিয়া ভৈরবপ্রসাদকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। ভৈরবপ্রসাদ চিৎকার করিয়া "ওরে বাবারে বড় জালা কর্‌ছেরে; জলে জলে জলছেরে" এই কথা বলেন আর সম্মুখ দিকে এক একটি প্রচণ্ড লম্ফ দেন। লছমী ও অযোধ্যা, তাঁহার দুই দিকে অবস্থান করিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিয়া সজোরে টানিয়া, অতি কষ্টে কোনও রকমে তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া রাখেন। কিছুক্ষণ এইরূপ লাফা-লাফি ও টানাটানির পর সেই বৃহৎ ড্রয়িং-রুমের মধ্যস্থলে গিয়া সেই ঘরের প্রবেশ দ্বারের দিক পিছন ফিরিয়া সকলে দাঁড়াইলেন। ভৈরবপ্রসাদ ওইভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিশাল উদরে "আ-ফু, আ-ফু," করিয়া বড় বড় ফুৎকার দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আদেশে লছমী ও অযোধ্যা ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার উদরে আস্তে আস্তে ফু দিতে লাগিল।

ঠিক এমনি সময় একটি ছোকরা টেলিগ্রাফ-পিওন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তিনটি লোকই পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কি করিতেছে। পিওনটী অল্পক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল তৎপরে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইল। ভৈরবপ্রসাদ একমনে নিজে ফু দিতেছেন এবং "আঃ ঠাণ্ডা হচ্ছে; দাও লছমী জোরসে ফু দাও, অযোধ্যা ফু দাও, কৃপণতা

ক'রনা ফঁু দাও" এই কথা বলিতেছেন; এমন সময় পিওনটী তাঁহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার হস্তস্থিত একখানি টেলিগ্রাম, ভৈরবপ্রসাদের সম্মুখ দিকে আগাইয়া দিতে যাওয়াতে সেটী হঠাৎ ভৈরবপ্রসাদের পৃষ্ঠে ঠেকিয়া গেল। টেলিগ্রামখানি হঠাৎ তাঁহার অঙ্গে লাগাতে ভৈরবপ্রসাদ মহা ভীত ও চমকিত হইয়া, অযোধ্যা ও লছমীকে দুই হাতে ধাক্কা দিয়া "আরে মায়ীরে" বলিয়া চেঁচাইতে, চেঁচাইতে সম্মুখ দিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে পিওন বিস্মিত হইয়া "হুজুর একঠো তার্ আয়া, হুজুর একঠো জরুরী তার্ আয়া" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া গেল এবং তার্খানি তাঁহার সম্মুখদিকে আগাইয়া ধরিল।

পিওনের কথায় আকৃষ্ট হইয়া ভৈরবপ্রসাদ পিছন ফিরিয়া পিওন ও টেলিগ্রাম দেখিয়া অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন কিন্তু সেই পিওন বেচারার উপর মহা গরম হইয়া বলিলেন—"তুম্ হামকো এয়সা চমক্ লাগায় দিয়া কেঁওরে বদমাস্?"

বিস্মিত পিওনটী কি যে উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল—"হুজুর হাঁমতো, হামতো, হামতো তার্—"

নিকটে পতিত সেই প্রিয় ও সদা-সর্ব্বদার সহচর লাঠি-গাছটি তুলিয়া লইয়া ভৈরবপ্রসাদ মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া লাঠিটী দুই চারিবার ভূমিতে সজোরে ঠুকিয়া, অবশেষে লাঠির ডগা দিয়া পিওনের পেটে একটী খোঁচা দিয়া বলিলেন—"চুপ-চাপ খাড়া কাহে; বোলো, জলদী বোলো—কাহে হামকো এয়সা চমক্ লাগায় দিয়া। আবতক্ হামরা ছাতিকা অন্দর এইসি তেইসি করতা হ্যায়।"

পিওন বেচারা ভয়ে ভয়ে পুনঃপুনঃ সেলাম করিয়া টেলিগ্রামখানি সম্মুখে আগাইয়া ধরিয়া বলিল—"মাফ কিজিয়ে হুজুর; কসুর হো গিয়া! এই তার্ লিজিয়ে।"

ভৈরবপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলিলেন—"দেও।" টেলিগ্রামখানি লইয়া সহি করিয়া দিয়া পিওনকে বলিলেন—"যাও, যাও, চলা যাও।" পিওন চলিয়া গেল।

খাম ছিঁড়িয়া টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া ভৈরবপ্রসাদ মহা আনন্দিত হইলেন। তিনি হঠাৎ দুই হাত তুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"ছাখ, ছাখ এই তার্টা পড়ে দেখ—আমার একজন মহা-বন্ধুর ছেলে আমার কাছে আসছে।" এই কথা বলিয়া তিনি টেলিগ্রামের কাগজখানি অযোধ্যার হাতে দিলেন। অযোধ্যা তাহা পাঠ করিয়া লছমীকে পড়িতে দিল। ভৈরবপ্রসাদ আপন মনে অস্ফুটস্বরে কি বকিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে লছমীর হাত হইতে টেলিগ্রামের কাগজটী লইয়া ভৈরবপ্রসাদ আবার সেটী পাঠ করিয়া, মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"টেলিগ্রাম-প্রেরক কে জান? সে হচ্চে আমার মহা ভালবাসার ও উপকারী বন্ধু নবীনচাঁদ বাবুর একমাত্র পুত্র শরৎচন্দ্র। আমাতে আর শরতের পিতাতে ভয়ানক ভালবাসা আর বন্ধুত্ব ছিল। আমরা আগে অনেকদিন ধরে দুজনে মিলে মাল-পত্রের লেন্-দেন্ ক'রতুম। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর পুত্র শরৎচন্দ্র যখন আমার সেই বন্ধুর পত্নীকে নিয়ে এখানে —আমার দেশে আসছে তখন, আমি বেঁচে থাকতে তারা এখানে এসে ভাড়াটে বাড়ীতে থাকলে, আমার বড় দুর্নাম হবে। অযোধ্যা তুমি নিজে

বুধবারে ষ্টেসনে গিয়ে এই সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলবে আর খুব খাতির ক'রে তাদের এইখানে নিয়ে আসবে।"

অযোধ্যা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। ভৈরবপ্রসাদ উপরোক্ত কথাগুলি পুনরায় বুঝাইয়া বলিয়া বলিলেন—"দেখো কোনও রকমে তাদের যেন অখাতির না হয়। তুমি খুব সমাদরের সহিত তাদের, আমার এই বাড়ীতে নিয়ে আসবে।"

এই কথাগুলি বলিয়া, যে চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন সেই চেয়ারের পায়ার নিকট পতিত খড়ম জোড়াটী পায়ে পরিয়া, ভৈরবপ্রসাদ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য দরজার নিকট আসিয়া দেখেন যে, সেই টেলিগ্রাফ-পিওনটী দরজার কাছে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া ভৈরবপ্রসাদ বেলে-বেগুনে চটিয়া উঠিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া বলিলেন—"কোন্ বখত্ তুমকো চলা যানে বোলা অউর আব্ তক্ তুম বৈঠা হ্যায়? চোরিকা মতলব হ্যায়—না?"

সহি লইবার পর, ভৈরবপ্রসাদের আদেশে পিওন যখন চলিয়া যাইতেছিল সেই সময় ভৈরবপ্রসাদকে, টেলিগ্রাম পড়িয়া আনন্দ করিতে দেখিয়া, কিছু বখ্‌সিস্ পাইবার আশায় সে, ঘরের বাহিরে দরজার কাছে বসিয়াছিল। এক্ষণে ভৈরবপ্রসাদের আদেশে ঘরে ঢুকিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"হাম কোম্পানীকা নোকর্—চোরি করেগা কাহে? আপ্‌কো আচ্ছা খবর্ আয়া ওহি বাস্তে কুছ বখসিস তো মিলনা চাহিয়ে।" এই কথা বলিয়া সে ভৈরবপ্রসাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল।

ভৈরবপ্রসাদ, তাহার প্রসারিত হস্তের উপর লাঠির একটি ঘা মারিয়া

বলিলেন—"তুম চমক্ লাগায় দেকে হামকো ঘাব্ড়ায় দিয়াথা, অউর আভি বখ্সিস্ মাংতা ?"

একে কোম্পানীকা নোকর, তার উপর আবার—এখানে প্রথমে আসিয়া, একরূপ বিনাদোষে, অত ধমক্-ধামক্ খাইয়াছে। এখন—বখসিস্ দেওয়া দূরে যাক—পরিবর্ত্তে চোর-বদনাম। পিওনটি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। সে এ'কে ছোকরা তার উপর আবার পশ্চিম দেশীয় লোক। কোনওরূপ দ্বিধা না করিয়া সে বলিল—"আরে জী তুম্ এতনা মোটা হোকে লেড়কাকা মাফিক ঘাবড়ায় গিয়া, ইসমে হামারা কসুর কেয়া ?"

মোটা লোককে মোটা বলিলে সে কিরূপ ভয়ানক রাগিয়া উঠে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। ভৈরবপ্রসাদকে মোটা না বলিয়া যদি শালা বলিত তাহা হইলে বোধ হয় পিওনের উপর তিনি এত চটিতেন না। ভৈরবপ্রসাদ তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া, লাঠি লইয়া পিওনকে মারিতে উগ্যত হইলেন। পিওনটি আর পশ্চাতে না চাহিয়া একেবারে লম্বা দৌড় দিল। ভৈরবপ্রসাদ, তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পিছনে তাড়া করিলেন এবং ঘর হইতে বাহির হইয়া মর্ম্মর-প্রস্তর-মণ্ডিত বারান্দায় পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার খড়ম পিছলাইয়া গেল, তিনি "ওঁক্" করিয়া একটা শব্দ করিলেন এবং সবেগে একটি আছাড় খাইলেন। পিওন ততক্ষণে বারান্দা, বাগান, সদর দরজা পার হইয়া রাজপথে পড়িয়া, দৌড়ের মাত্রা দ্বিগুণ করিয়া দিল।

"উঃ" "আঃ" প্রভৃতি শব্দ করিয়া ভৈরবপ্রসাদ উঠিলেন এবং চাকর-বাকরদের ডাকিয়া—দৌড়াইয়া গিয়া পিওনকে ধরিতে এবং মারিতে,

মারিতে তাঁহার নিকট আনিতে, আদেশ দিলেন। তাহারা সব ছুটিয়া চলিয়া গেল। ভৈরবপ্রসাদ পুনরায় ঘরে গিয়া চেয়ারের উপর বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে খুব হাঁক-ডাক করিতে করিতে চাকর-বাকরেরা ফিরিয়া আসিল এবং বলিল যে—"তাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও সেই দুর্দ্দান্ত পিওন ব্যাটাকে ধরিতে পারিল না।"

ভৈরবপ্রসাদ সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"তোরা এতগুলো লোক মিলে, একটা লোককে ধ'রতে পারলি না? অকর্ম্মার-ধাড়ী ব্যাটারা সব। আজ সবাইকে ডিস্‌মিস্ ক'রব।"

চাকরেরা বলিল—"হুজুর আমাদের কোনও দোষ নেই। আমরা পিওনটাকে একেবারে দেখতেই পেলুম না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে যে কোন্ দিকে চলে গেল আমরা তা কিছুই দেখতে পেলুম না।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"সে কিরে ব্যাটারা এমন দিনের আলোয়, এই কাট্-ফাটা রোদ্দুরে তোরা তাকে দেখতে পেলিনি। বুঝেছি, সব ব্যাটার এক সঙ্গে চোখ খারাপ হয়ে গেছে। যাও, তোমাদের এবার আর ডিস্‌মিস্ করলুম না। কিন্তু শোন অযোধ্যা, এই সব ব্যাটার মাইনে কেটে প্রত্যেককে একখানা ক'রে চশমা কিনে দাও।"

---

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"বেনারস-ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্‌" বা "সিকরোল্‌" রেল ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্‌মের উপর একটি ক্ষুদ্র জনতা, রেলের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছে। অদ্য বুধবার; শরৎচন্দ্রের প্রতীক্ষায়, ভৈরবপ্রসাদের ভাবী-জামাতা অযোধ্যা সাগ্রহে পায়চারী করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে "হুস্‌-হুস" শব্দে ট্রেণ আসিয়া থামিল। চারিদিকে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। আযোধ্যা মনে, মনে ভাবিল যে—"আমি তো শরৎচন্দ্র, ফরৎচন্দ্র কাউকে চিনি না; এখন এই ভিড়ের মধ্যে আমি কি ক'রে তাকে খুঁজে বার করি? আচ্ছা এক কাজ করা যাক—এন্‌জিনের কাছ থেকে আরম্ভ ক'রে গার্ডের গাড়ী অবধি ঘুরে দেখি, তা হলেই সন্ধান পেয়ে যাবো। এই ভাবিয়া অযোধ্যা এন্‌জিনের দিকে চলিয়া গেল।

শরৎচন্দ্র একখানি টুরিষ্ট-কারে ভ্রমণ করিতেছিল। রেলওয়ে নিয়মানুসারে তাহার অধিকৃত সেই টুরিষ্ট-কার্‌ বা সেলুন-কার্‌খানি একেবারে সব পিছনে অর্থাৎ গার্ডের গাড়ীর পিছনে জুড়িয়া দেওয়া ছিল। ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই শরৎচন্দ্র, মাতা ও মাসীমাতাদ্বয় এবং সহচর-যুগলকে লইয়া প্ল্যাটফর্‌মে নামিয়া পড়িয়া সহচরদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল— "ত্যাখ, আমাদের অন্য সব মাল-পত্র এখন কিছুই নামিয়ে কাজ নেই কারণ আমার জন্যে ওই গাড়ীটা এইখানেই কেটে রাখবে। মা আর মাসীমাদের লেডিস্‌ ওয়েটিংরুমে বসিয়ে রেখে, চল আগে আমরা

রিফ্রেস্‌মেণ্ট্‌রুমে গিয়ে কিছু খেয়ে নি।" এই কথা বলিয়া বিশ্রামাগারে স্ত্রীলোকদের বসাইয়া শরৎচন্দ্র সবান্ধবে রিফ্রেশমেণ্ট্‌রুম বা ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। শরৎচন্দ্র যখন ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়াছে—অযোধ্যা তখন ট্রেনখানির মাঝামাঝি-বরাবর-গাড়ীতে শরৎচন্দ্রকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

শরৎচন্দ্র সাহেবী পোষাক পরিধান করিয়া খুব কায়দা করিয়া সশব্দে পা ফেলিতে, ফেলিতে ভোজনাগারে আসিয়া একখানি টেবিল অধিকার করিয়া বসিল। তাহার সহচর হরিচরণ ও মাধব, তাহার অনুকরণে পা ফেলিতে ফেলিতে আসিয়া সেই টেবিলের অন্য পার্শ্বস্থ দুইখানি চেয়ার টানিয়া বসিল। আজ ইহারা দুইজনেও সাহেব সাজিয়াছে।' শরৎচন্দ্র ইহাদের জন্য কতকগুলি সাহেবী পোষাক আনাইয়া দিয়াছে। প্রথমে সাহেবী পোষাক পরিতে পাইয়া ইহাদের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু তাহাদের এ আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। পোষাক পরিবার কিছুক্ষণ পর হইতেই ইহারা দুইজনে বিষম অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বাটি হইতে বাহির হইয়া হাবড়া ষ্টেশন অবধি কোনও রকমে উপস্থিত হইয়া ইহারা আর থাকিতে পারিল না; শরৎকে বলিল যে, "এ পোষাক পরিয়া তাহাদের বড়ই কষ্ট হইতেছে অতএব এখনই ইহা খুলিয়া ফেলিতে চায়।" শরৎচন্দ্র বলিল—"না তা হ'তে পারে না একেবারে কাশীতে গিয়ে বাসায় পৌঁছে তারপর পোষাক খুলবে। নইলে বড়ই অসভ্যতা প্রকাশ পাবে।" অবশেষে বহু কথা কাটাকাটির পর শরৎচন্দ্র বলিল যে—"ট্রেণ ছেড়ে দিলে তার পরে পোষাক খুলবে তারপর আবার কাল সকালে কাশীতে নামবার সময় পোষাক পরবে।"

এ আদেশ তবু মন্দের ভাল—কোনও রকমে কষ্ট সহ্য করিয়া ইহারা ট্রেণ ছাড়া অবধি অপেক্ষা করিয়া রহিল এবং ট্রেণ হাবড়া ত্যাগ করিলে ইহারা পোষাক ছাড়িয়া বাঁচিল এবং মনের সাধে সর্ব্বাগ্রে একবার সর্ব্বাঙ্গ চুলকাইয়া লইয়া তারপর অন্য কাজ করিল।

শরৎচন্দ্রের আদেশে অদ্য মোগল-সরাই ষ্টেশন হইতে আবার ইঁহাদের সেই সাহেবী-পোষাক পরিতে হইয়াছে এবং অস্বস্তির চোটে ইহাদের প্রাণ ত্রাহি-মধুসূদন ডাকিতেছে। ট্রেণ হইতে নামিয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া শরৎচন্দ্র—তিনটি "ছোটা হাজরী" আনিতে বয়্‌কে আদেশ করিয়া, হরিচরণকে বলিল—"রেলে বেড়ানটা কি রকম লাগল?" হরিচরণ বলিল—"সুন্দর, অতি সুন্দর। কিন্তু বাবু এই সাহেবী-পোষাকটার জন্যে প্রাণটা বড় আই-ঢাই ক'রচে।"

মাধব বলিল—"ট্রেণে বেড়ানর সমস্ত আনন্দ এই এক ঘোঁড়ার ডিমের পোষাকের জন্যে একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেল। পোষাকটা খুলে ফেলতে পারলে, যেন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। এই কাটের মতন শক্ত কলার প'রে আমার ঘাড়ে যা ব্যাথা হয়েছে তাতে অন্ততঃ পক্ষে তিনজন লোককে দিয়ে—তিন দুগুণে ছয় সের তেল মালিস ক'রলে তবে যদি এ ব্যাথা যায়। উঃ তারওপর এই গ্যালিস্—ওঃ, কলারটা আমার মুণ্ডুটাকে ঠেসে চেপে ধ'রে ওপর দিকে ঠেলে দিচ্চে; আর গ্যালিস্‌টা কাঁধের ওপর ক'সে চেপে বসে গিয়ে দেহটাকে নীচের দিকে টানচে, এ দুয়ের মাঝখানে প'ড়ে আমার হতভাগ্য প্রাণ বেচারী—টাগ্-অব-ওয়ারের দড়ির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।"

শরৎচন্দ্র চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া বলিল—"চুপ, চুপ। ওসব

কথা এখন বন্ধ কর। কেউ যদি শুনতে পায় তো আমাদের নেহাৎ অসভ্য ঠাওরাবে।"

মাধব একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল—"আরে মশাই আপনি তো বলছেন চুপ কর কিন্তু প্রাণটা যে কিছুতেই চুপ ক'রতে চাইছেনা। এ শালার টানাটানির কষ্ট যদি বা সহ্য হয় কিন্তু চুলকুনীর কৃষ্ট কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারছি না। এই ঘোঁড়ার ডিমের পোষাকে আল্‌কুসির গুঁড়ো মাখান আছে কিনা জানি না, কিন্তু এটা পোরে অবধি বুক পিঠ, কোমর, উরোত, পা, হাত সব চুলকুচ্চে; এদিকে কিন্তু পোষাকের এমনি মহিমা যে, চুলকুনীর চোটে সর্ব্বাঙ্গ কুট্-কুট্ ক'রে উঠলেও চুলকোবার যো নেই। হাত থাকতেও ঠুঁটোর মতন চুপ ক'রে ব'সে এই নিদারুণ চুলকুনীর কষ্ট সহ্য ক'রতে হবে। ওহো—হো—হো—ওঃ গেছিরে, গেছিরে, আবার চুলকে উঠেছেরে। এতক্ষণ অন্য পাঁচটা কথায় এক রকম ভুলেছিলুম; এই চুলকুনীর কথা মনে হ'তে আবার সেই রকম চুলকে উঠলো। ওহো-হোঃ পিটটা চুলকুচ্চে, বড্ড-চুলকুচ্চে, গেছিরে বাবা—" এই কথা বলিয়া মাধব আর বাবুর অনুমতির অপেক্ষা করিল না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া, সেই কক্ষের দেয়ালের উপর নিজের পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া খুব জোরে রগড়াইতে লাগিল। তাহার কাল কোটের উপর দেয়ালস্থিত চুণ লাগিয়া খানিকটা সাদা হইয়া গেল। ভোজনাগারে অবস্থিত সকলেই হোঃ-হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শরৎচন্দ্র তাহার উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং সরোষ-কটাক্ষে তাহাকে নীরবে ভৎর্সনা করিল বটে; কিন্তু তাহার কলাটা

সে মনের সাধে দেয়ালের উপর পিঠ রগড়াইয়া—"আঃ বাঁচলুম"—ইত্যাদি বলিতে, বলিতে দিব্য সপ্রতিভ ভাবে চেয়ারে আসিয়া বসিল।

তিনটি "ছোটা হাজরী" যথা সময়ে উপস্থিত হইল। খাদ্য দ্রব্য আসিতেই মাধব ও হরিচরণ দুই মিনিটের মধ্যে সব খাদ্য নিঃশেষ করিয়া দিল। শরৎ যখন সবে মাত্র একটি ডিমের পোচ খাইয়া, খানিকটা চা পান করিয়া আবার আর একটি ডিমের পোচ খাইবার নিমিত্ত মুখে তুলিয়াছে ; হরিচরণ তখন খাওয়া শেষ করিয়া একটি সিগারেট প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। সিগারেটে আর একটি টান দিয়া সেটি ফেলিয়া দিয়া, টেবিল হইতে ন্যাপ্‌কিন্ তুলিয়া লইয়া হরিচরণ খুব জোরে, জোরে ঘসিয়া নিজের মুখ মুছিল। মুখ মুছিতে, মুছিতে টেবিলের উপরস্থিত "ভিনিগার" ও "সশের" শিশির উপর হঠাৎ তাহার নজর পড়াতে সে ন্যাপ্‌কিন্‌টি রাখিয়া দিয়া টেবিলের উপর হইতে টপ্ করিয়া "সশের" শিশিটি তুলিয়া লইয়া ছিপি খুলিয়াই, এক হাত দিয়া শিশিটি ধরিয়া নিজের মাথার উপর খানিকটা "সশ" ঢালিতে লাগিল এবং অন্য হাত দিয়া তাহা মাথার উপর থাব্‌ড়াইয়া দিতে লাগিল।

এই বিসদৃশ ব্যাপারে সেখানকার সকলে, এমন কি খানসামাগণ পর্য্যন্ত হাসিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র একে মাধবের ব্যবহারে মহা লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়াছিল এক্ষণে হরিচরণের কাণ্ডে—সকলের সম্মুখে আবার এইরূপ ভয়ানক লজ্জা পাওয়াতে—ভয়ানক রাগিয়া উঠিল। সে রাগে অধীর হইয়া—কোনও কথাটি না বলিয়া—হরিচরণের হাত হইতে সেই "সশের" শিশিটি সজোরে কাড়িয়া লইয়া, সম্মুখ দিকে সবেগে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। একটি বৃহৎ কাচ-নির্ম্মিত-সো-কেস-আলমারীতে

নানারূপ বিলাতী মদ্যের বোতল সাজান ছিল—শরৎচন্দ্রের হস্ত-নিক্ষিপ্ত "সশের" শিশিটি সবেগে সেই সো-কেস-আলমারীর উপর পড়িল এবং সশব্দে একখানি বৃহৎ কাচ ও কয়েকটি মদের বোতল ভাঙ্গিয়া গেল।

ভোজনাগারের অধ্যক্ষের মুখের হাসি ছুটিয়া পলাইল। তিনি আরক্ত লোচনে, ভ্রূকুটি করিয়া শরতের নিকট উপস্থিত হইয়া—তাহাদের পুলিসের হস্তে দিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। শরৎ কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে আড়াই শত টাকার নোট লইয়া অধ্যক্ষের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"মশাই রাগ ক'রবেন না। আপনার যা ক্ষতি হয়েছে তার দ্বিগুণ টাকা আমি আপনাকে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ দিচ্ছি—দয়া ক'রে গ্রহণ করুন আর এটাকে একটা দৈবদুর্ঘটনা ব'লে মনে ক'রে নেবেন।"

নগদ করকোরে আড়াই শত টাকা পাইয়া অধ্যক্ষ একগাল হাসিয়া শরতের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"অন্য লোক হ'লে আমি তাকে নিশ্চয়ই পুলিসে দিতুম কিন্তু আপনার মতন সম্ভ্রান্ত লোকের বেলায় অন্য কথা। তা অনুগ্রহ ক'রে যখন এসেছেন তখন আর এক পেয়ালা ক'রে চা খেয়ে যান।"

শরৎচন্দ্র পুনরায় সবান্ধবে চা পান করিল। চা পান করিতে, করিতে হরিচরণকে বলিল—"দেখদেখি তোমার গাধামীর জন্যে আমার আড়াই—আড়াইশো টাকা মিছিমিছি বেরিয়ে গেল।"

হরিচরণ বলিল—"আপনি ও টাকা ফেরৎ নিন বাবু। ও ম্যানেজার আমাদের কিছুই ক'রতে পারবে না—আমি মারের চোটে সব ঠাণ্ডা ক'রে দোব।"

শরৎ বলিল—"থাক্ আর বীরত্বে কাজ নেই। পুলিসে দেবার নাম শুনে তখন তো ভয়ে কাঁপছেলে। আচ্ছা তুমি হঠাৎ "সশ্" মাখতে গেলে কেন ?"

হরিচরণ বলিল—"আরে মশাই ও গুলো যে খালি সাজিয়ে রেখেছে—খদ্দেরে মাখলে যে, ওরা চোটে যায় তা কি ক'রে জানব বলুন। আমি মনে করলুম যে "রেসে বেড়িয়ে রাত্রিতে ঘুম না হ'লে মাথা ধরলে লোকে ওইগুলো মেখে মাথা ঠাণ্ডা ক'রবে—এই জন্মে ওই শিশিগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছে।" এই ভেবে আমি ওই শিশি থেকে খানিকটা মাথায় মেখেছিলুম—এতে যে এত হ্যাঙ্গাম হ'তে পারে তা জানতুম না।"

শরৎ বলিল—"সে কি হে—ওগুলো যে খাবার জিনিস; তুমি মাথায় মাখতে গেলে কোন আক্কেলে।"

হরিচরণ বলিল—"ওহো তাই বটে, তাই এত গোলমাল—ওগুলো খাবার জিনিস ? আরে মশাই আপনি বাড়ীতে সব ওই রকম শিশিতে ওই রকম রঙ্গের জিনিস নিয়ে মাথায় মাখেন না, আমি তাই মনে ক'রে ওটা মাথায় মাখ্‌তে গেছলুম।"

শরৎ বলিল—"আরে মুর্খ আমি তো বাড়ীতে যা মাথায় মাখি সেগুলো হচ্চে ( Lotion ) লোসান। যাক, এখন এস; আর ওরকম মুর্খতা ক'র না।

অধ্যক্ষের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনজনে ভোজনাগার হইতে বাহির হইল। আসিবার সময় মাধব আপন মনে বলিল—"বাবু যা মাথায় মাখেন সেটা হ'ল লোসান। আমরা তো জানি বাবা, ঘা ধুতে হ'লে লোসান দিয়ে ধুতে হয়।"

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অযোধ্যানাথ ষ্টেশনের ভিতরে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও শরৎচন্দ্রের কোন সন্ধান পাইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে ট্রেণখানি ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অযোধ্যা বাহিরে চলিয়া আসিয়া একবার অনুসন্ধান করিল এবং যে সকল যাত্রী সহরের ভিতর যাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নিকট—"মোশাই কি কালকাতা হোতে আসছেন—আপনার নাম কি শোরোত বাবু"—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কিন্তু শরতের কোনও সন্ধান পাইল না! যাহাকেই উক্ত কথা জিজ্ঞাসা করে সেই-ই তাহার উত্তর না দিয়া তাহাকেই আবার একটা প্রশ্ন করিয়া বসে। কেহ বলে যে—"তুমি কি পুলিসের গোয়েন্দা?" কেহ বলে যে—"তুমি কি বাইজীর দালাল?" অযোধ্যা বিরক্ত হইয়া ষ্টেশনের ভিতর চলিয়া গেল। সেখানে কোনও যাত্রীকে দেখিতে না পাইয়া পুনরায় ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া আসিয়া বাটী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল যে, তিনটী লোক ষ্টেশনের ওভার-ব্রীজ বা 'লাইন পার হইবার পুলের' উপর দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাদের মধ্যে একটি লোক তাহার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোককে কি বলিতেছে।

ভোজনাগার হইতে বাহির হইয়া শরৎচন্দ্র একবার ষ্টেশনের ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া সেই ওভার-ব্রীজের উপর আসিয়া হরিচরণকে সম্বোধন

করিয়া বলিল—"আমাদের, খেতে গিয়ে দেরী হওয়াতে ভৈরব বাবুর লোক ফিরে গেছে ; এখন কি করা যায় ? আমি তো এখানে কখনও আসিনি, তার বাড়ীও চিনি না।"

হরিচরণ বলিল—"চলুন গাড়ীভাড়া করা যাক—গাড়োয়ানকে ঠিকানা ব'লে দিলে সে বোধ হয় ঠিক নিয়ে যেতে পারবে।"

এইরূপ কথা কহিতে, কহিতে অগ্রসর হইয়া পুলের নীচে, অযোধ্যাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া শরৎচন্দ্র বলিল—"দেখ ঐ যে একটা লম্বা তাল-পাতার-সেপাইয়ের মতন লোক, পায়জামা পোরে আর খুব জব্বর পাগড়ী মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ লোকটার কাছে গিয়ে ভৈরব প্রসাদ বাবুর বাড়ীর খোঁজ নাও দেখি। লোকটাকে দেখলে ভদ্রলোক আর পয়সাওলা লোক ব'লে মনে হয়—ও বোধ হয় ঠিক সন্ধান দিতে পারবে। আর দেখ, বেশ বিনয়ের সঙ্গে, ভদ্রতার সঙ্গে কথা বোলো ; নেহাৎ অসভ্যতা ক'র না। ওখানে যেমন কেলেঙ্কারী করে এলে, সে রকম কিছু ক'রে কাশী সহরে যেন আমার নাম ডুবিও না।"

হরিচরণ—"যে আজ্ঞে—"বলিয়া একটু দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া অযোধ্যার নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রথমে খুব লম্বা একটা সেলাম করিয়া বলিল—"এঃ, এঃ ভাই লটপটু সিং, হামকো একোটা কথার উত্তর দয়া করে দেগা ?"

অযোধ্যা সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কেয়া-বাৎ বোলো।"

হরিচরণ তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িতে, নাড়িতে বলিল—"কি মুস্কিল, বাত কেয়া ? বাত নয়, বাত নয়, বরঞ্চ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বোলনে

পারতা। তা বরং একটু আধটু আছে। হাঁ সেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারানেকা বাস্তে আর বায়ু-ভক্ষণকা বাস্তে এই প্রদেশমে আয়া। কিন্তু সে জন্তে তুমকো হাঁকা ডাকা নেই। হামরা একটা অন্য—"

অযোধ্যা তাহাকে মাতাল মনে করিয়া, ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। হাতের শীকার পলায় দেখিয়া হরিচরণ মহা ব্যস্তভাবে ঈষৎ উচ্চস্বরে বলিল—"ও, ও ভাই লটপট্টু সিং তুম বুঝি ডাক্তার? হামারা ব্যায়রামকা কথা বোলা নেই ব'লে রাগ ক'রে চলে যাতা? তা ভাই একান্তই যদি গোঁসা করকে চলে যাবে তাহলে হিঁয়াকা একোটা বড়া লোককো বাড়ী কাঁহা, বোলকে যাও।"

একজন বড় লোকের বাড়ী খুঁজিতেছে শুনিয়া গমনোদ্যত অযোধ্যা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কোন বড়া আদমী, নাম বোলো।"

হরিচরণ বলিল—"তুম্, ভৈরব প্রসাদ—ভৈরব প্রসাদ, আহা কি যে ছাই ভুলে যাচ্চি; হাঁ, হাঁ তুম, ভৈরব প্রসাদ মেড়ুয়াবাজীকা বাড়ী জানতা?"

অযোধ্যা সাগ্রহে বলিল—"আপ্ কেয়া কালকাতাসে আতে হেঁ?"

হরিচরণ সগর্ব্বে বলিল—"হাঁ-হেঁ। তুম্ কি সেই মেড়ুয়াবাজীকা মোসাহেব?"

অযোধ্যা সবিনয়ে বলিল—"হাঁ, হাম আপকো তাঁবেদার।"

হরিচরণ, আপ্যায়িতের ভাব দেখাইয়া বলিল—"তা ভাই তাঁবেদার, হাম, তুমকো চিনতে না পেরে যদি দু একোটা ধৃষ্টতার কথা বোলে থাকি তো হামাকে মাফ্ কোরো ভাই।" এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ সেলাম করিল।

অযোধ্যাও পুনঃ পুনঃ সেলাম করিতে করিতে বলিল—“আরে ও কেয়া বাৎ—আপ হামকো মাফ্ কিজিয়ে, আপ হামকো মাফ্ কিজিয়ে—হামতো, আপকা গোড়কা ময়লা।”

হরিচরণ দাঁত মুখ খিঁচাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—“আরে ভাই হামিও, তোমার বাড়ীর নর্দ্দমার শ্যাওলা, উনুনকা কয়লা, গরুকা গয়লা—”

দুইজনে কিছুক্ষণ ধরিয়া সেলাম বিনিময়ের পর, শরতের নিকট উপস্থিত হইল এবং আলাপ পরিচয়ের পর সকলে মিলিয়া, ভৈরবপ্রসাদের প্রেরিত কোতোয়ালী-জুড়ীতে চড়িয়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল।

———

## বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভৈরবপ্রসাদ মধ্যাহ্নের আহার সমাপনান্তে তাঁহার ড্রয়িং রুমের মধ্যস্থলস্থিত তাকিয়া বেষ্টিত ঢালা-বিছানার উপর চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। এবং গড়গড়ার নল মুখে লাগাইয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। তিনি শরতের আগমন প্রতীক্ষায় বিশেষ উৎকণ্ঠিত রহিয়াছেন এবং মধ্যে, মধ্যে চার, পাঁচটা পান লইয়া এক সঙ্গে মুখের ভিতর ফেলিয়া দিতেছেন ও গাল ফুলাইয়া 'চপৎ চপৎ' শব্দ করিতে করিতে পান চিবাইতেছেন। তাঁহার কন্যা লছমী, নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া পশমের গেঞ্জি বুনিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ অতীত হইবার পর অযোধ্যা একটু দ্রুতপদে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"আপনার বন্ধু-পুত্র এসেছে।"

"এসেছে—"এই কথা বলিয়া মহা আনন্দিত ভাবে ভৈরবপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনি দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর হইতেই—শরৎচন্দ্র আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ভৈরবপ্রসাদ একগাল হাসিয়া বলিলেন—"এস, এস বাবা। এই বাড়ী, ঘর, দোর, জানলা, সার্সী, খাট, পালঙ, টেবিল, চেয়ার, হারমণিয়ম, পিয়ানো, গ্রামোফোন, সব তোমার নিজের ব'লে জানবে। এ সব নিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই ক'রবে। তোমার ইচ্ছে হয় তো এ সব ভেঙ্গে ফেলে দিও; আর না হয়তো এ সব রেখে দিও—বুঝলে? তোমার স্বর্গগত পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন।" এই কথা বলিয়া তিনি, দুই হাত দিয়া শরৎকে জড়াইয়া ধরিলেন।

ঈষৎ মস্তক অবনত করিয়া শরৎ বলিল—"আপনি আমার প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন আর সৌজন্যপূর্ণ সম্ভাষণ জানবেন। আপনাকে আমি পিতার মতই দেখব।"

ভৈরবপ্রসাদ আনন্দে গলিয়া গেলেন। তিনি আনন্দে গদগদ হইয়া বলিলেন—"বড় আনন্দ দিলে বাবা—প্রাণে বড় আনন্দ দিলে।" এই বলিয়া তিনি শরতের চিবুকে হাত দিয়া, সেই হাতটী চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার সেই বিশাল হস্ত বিস্তার করিয়া শরতকে তাঁহার বিশাল উদরের উপর চাপিয়া ধরিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

ভৈরবপ্রসাদ শরতের অপেক্ষা অধিক লম্বা ছিলেন, এই জন্ম শরৎ একটী লম্ফ দিয়া উচ্চে উঠিয়া—"Dady, Dady, Dear Dady—" বলিতে বলিতে ভৈরবপ্রসাদের গালে একটি প্রচণ্ড চুমু খাইল। ভৈরব প্রসাদের গালে খুব খানিকটা থুতু লাগিয়া গেল। স্নেহের চুম্বনে থুতু লাগিয়া গেল এই জন্ম তিনি কিছু বলিতে পারেন না এই ভাবে অথচ ঘৃণায় নাক মুখ সিঁটকাইয়া, এক হাতে গাল মুছিতে, মুছিতে এবং অন্য হাত দিয়া লছমীকে দেখাইতে, দেখাইতে বলিলেন—"শরৎ, এইটি—এইটি আমার একমাত্র কন্যা লছমী। খুব শিক্ষিতা, নব্য-ভাবে দীক্ষিতা, সমস্ত রকম কুসংস্কার থেকে সযত্নে রক্ষিতা—এক কথায়, এক কথায়—আমি একে ঠিক—"

ভৈরবপ্রসাদের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, শরৎচন্দ্র দ্রুতপদে লছমীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহার কোলের উপর পতিত তাহার হাতখানি তুলিয়া লইয়া করমর্দ্দন করিতে, করিতে বলিল—"আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে বড্ড সুখী হ'লুম আর নিজেকে

অতীব ভাগ্যবান মনে ক'রলুম।" এই কথা বলিয়া শরৎ ধপাস্ করিয়া লছমীর পাশের চেয়ার খানিতে বসিয়া পড়িল।

শরৎচন্দ্র বসিবার পর ভৈরবপ্রসাদ সেই ঢালা বিছানার উপর যাইয়া বসিলেন এবং অযোধ্যাকে নিকটে বসাইলেন। দুই, চারিটা পান মুখে দিয়া খুব হাত, মুখ নাড়িতে, নাড়িতে ভৈরবপ্রসাদ—শরতের পিতার সম্বন্ধে নানারূপ পুরাতন গল্প বলিতে লাগিলেন। শরৎ গল্প শুনিতে শুনিতে মধ্যে মধ্যে—"হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিতেছে বটে কিন্তু তাহার মনটা সম্পূর্ণরূপে লছমীর বিষয় চিন্তা করিতেছে এবং তাহার দৃষ্টিও, বেশীর ভাগ লছমীর দিকেই নিবদ্ধ রহিয়াছে।

শরৎ সবেগে আসিয়া হঠাৎ তাহার হাত তুলিয়া করমর্দ্দন করাতে এবং তাহার গাত্র ঘেঁসিয়া ওইরূপ ভাবে বসাতে লছমী অতীব লজ্জা ও কেমন এক রকম অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। অথচ নব-সভ্যতার খাতিরে হঠাৎ উঠিয়াও যাইতে পারিতেছিলনা। এক্ষণে হঠাৎ—দূরে টেবিলের উপরস্থিত পশমের গোলার উপর—নজর পড়াতে, সে পশম লইবার অছিলায় সেই টেবিলের কাছে উঠিয়া গিয়া পশমের গোলাটি তুলিয়া লইল এবং ঐ টেবিলেরই পার্শ্বস্থিত কতকগুলি চেয়ারের মধ্যে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সেই গেঞ্জি বুনিতে লাগিল এবং মধ্যে, মধ্যে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে শরতের দিকে চাহিয়া, তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মুচকি-হাসি হাসিতেছিল।

শরৎচন্দ্র মহা ক্ষুণ্ণভাবে ভৈরবপ্রসাদের সহিত দুই একটি বাজে আলাপ করিয়া বলিল—"আপনার বিদূষী কন্যার সঙ্গে দু' চারটে, শিক্ষা সম্বন্ধে আলাপ করা যাক। এমন শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গ, যখন ভাগ্যগুণে

পেয়েছি তখন সে শুভ-অবসর ত্যাগ করা উচিত নয়।" এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র টপাক্ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া সেই টেবিলের নিকট চলিয়া গেল এবং লছমীর পার্শ্বের চেয়ারে তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল— "আপনার মতন রূপবতী, গুণবতী মহিলার সঙ্গে আলাপ ক'রতে এলুম— বুঝলেন ? আপনার পিতামহাশয়ের কাছে শুনলুম যে, আপনি অনেক পাশ্চাত্য লেখকের বই প'ড়েছেন। আচ্ছা, আলেকজ্যাণ্ডার ডুমার লেখা, আপনার কেমন লাগে ?

আরক্তমুখী লছমী মৃদুস্বরে বলিল—"এঁর কোনও বই আমি পড়িনি!"

ইহাদের এইরূপ ভাবের দুই চারিটী কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। শরতের এইরূপ ব্যবহারে অযোধ্যা কিন্তু মহা বিরক্ত হইল; সে মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া উঠিল। সে ভৈরবপ্রসাদকে চুপি চুপি বলিল— "আপনার বন্ধু-পুত্রের এ কি রকম ব্যবহার! আপনি লছমীকে অন্দরে যেতে বলুন।"

ভৈরবপ্রসাদ ধীরভাবে বলিলেন—"কেন—ও, এটিকেট-বিরুদ্ধ কোনও কিছু করেনিতো। ওর সঙ্গে লছমীকে Introduce ক'রিয়ে দিলুম— আর ও তার সঙ্গে আলাপ ক'রবে না ? নব্য-চালে বিশেষ দক্ষ, ব'লে আমার সুনাম আছে; লছমীকে এখন অন্দরে যেতে ব'ললে, আমার সুনামে আঘাত পড়বে। তুমিওতো নব্য-চাল ভালবাস, তুমিওতো এই রকম ভাবের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী—তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। ছিঃ, ছিঃ।"

অযোধ্যা মুখে আর কোনও কথা বলিতে পারিল না; কিন্তু তাহার বুকের ভিতর ঘোড়-দৌড় হইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"আচ্ছা তোমার মার, আমার স্বর্গগত-প্রিয়তম-বন্ধুর পত্নীর যে এখানে আসবার কথা ছিল, কই তিনি এলেন না তো?"

শরৎচন্দ্র তাচ্ছিল্যভাবে বলিল "সে এসেছে তো। আমার দুই মাসীও এসেছে—তারা সব গাড়ীতে ব'সে রয়েছে। আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আগে এলুম, তারপর—"

ভৈরবপ্রসাদ ব্যস্তভাবে বলিলেন—"য়্যাঁ সে কি কথা! তাঁরা সব গাড়ীতে বসে রয়েছেন কি! চল, চল, তাঁদের নিয়ে আসি চল। চল্ মা লছমী আমার সঙ্গে চল্।"

শরৎ বলিল—"আপনি যান। আমি আর যেতে পারি না। আমি ততক্ষণ আপনার এই গড়গড়াটায় একটু তামাক খাই। এই বলিয়াই গড়্গড়ার নলটি মুখে দিয়া শরৎ, ধূমপান করিতে লাগিল।

ভৈরবপ্রসাদ ব্যস্তভাবে বলিলেন—"আহা-হা কর কি, কর কি! যাঃ গড়্গড়াটা মেরে দিলে? তা যাকগে, ওটা ব'দলে ফেলব এখন।"

শরৎ উপহাসের-হাসি হাসিয়া বলিল—"আপনার ঐ সব কুসংস্কার আছে নাকি? আমি তো শুনেছি যে, আপনি একজন সভ্য ও শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত লোক। আমি, আপনার গড়্গড়াটা টেনে তাহলে আপনার জাত মেরে দিয়েছি বলুন—হাঃ, হাঃ, হাঃ।"

ভৈরবপ্রসাদ একটু হাস্য করিলেন মাত্র। তাহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া, লছমী ও অযোধ্যাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

শরৎচন্দ্র এতদিন কেবল, পুস্তকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা পড়িয়াছিল এবং দূর হইতে স্বাধীনা-স্ত্রীলোকদের দেখিতে মাত্র পাইয়া-

ছিল। কখনও কোনও স্বাধীনতা ও আলোক-প্রাপ্তা যুবতীর সহিত মেলামেশা করিতে পায় নাই। এক্ষণে লছমীকে দেখিয়া, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, তাহার চাল-চলন দেখিয়া সে কেমন এক রকম ভ্যাবাচ্যাকা মারিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, সে যেন—এতদিনকার ভোগ করা পুরাতন পৃথিবী ছাড়িয়া আজ কোনও নূতন পৃথিবীতে আসিয়াছে। শরতের মনে বরাবরই বড় সাধ যে, সে স্বাধীন প্রেম করিবে; আজীবন স্বাধীন ও সভ্য প্রেমের সমুদ্রে স্বাধীন ও সভ্য ভাবে সন্তরণ করিবে। আজ, বহুদিন পরে, তাহার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে মনে করিয়া সে আনন্দে অধীর হইল। লছমীকে দেখিয়া সে, মনে মনে স্থির করিল যে, "এই লছমীকেই আমার প্রথম প্রেমের সঙ্গিনী ক'রব। এ রকম শিক্ষিতা, সভ্যা না হ'লে কি বিয়ে ক'রে সুখ হয়। এর সঙ্গে প্রথমে দিনকতক কোর্টসিপ ক'রব তারপর একে বিয়ে ক'রব। এ রকম স্ত্রীলোক পেলে আমি একশোবার বিয়ে ক'রতে রাজী আছি। এর সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমি সুখীও হব। লছমীকে প্রথমবার দেখেই আমি ভালবেসে ফেলেছি। ভৈরবপ্রসাদ যে রকম শিক্ষিত ও নব্য ধরণের সভ্য তাতে সে কখনই আমার সঙ্গে লছমীর বিয়ে দিতে আপত্তি করবে না। আর লছমীও যে আমায় ভালবেসে ফেলেছে সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। আমার এই সুন্দর রূপ, এই সুন্দর চেহারা দেখে কোন্ স্ত্রীলোক আমায় না ভালবেসে থাকতে পারে? আমার রূপ দেখে কত শালা পুরুষের মুণ্ডু ঘুরে যায়; ও তো সামান্ত একটা স্ত্রীলোক। আমায় যদি লছমী 'ভালবেসে' না ফেলবে

তা হ'লে ঐ অল্পক্ষণ মাত্র আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ বার আমার দিকে আড়-চোখে চেয়ে দেখছিল কেন? আমার কথার উত্তর দেবার সময় অমন মুচকি-হাসি হাসছিল কেন? যখন এই ঘর থেকে চলে যায় তখনও ফিরে, ফিরে আমার দিকে চেয়ে দেখতে, দেখতে যায়। এ সমস্তই প্রেমের লক্ষণ—আমি কি কিছু বইতে পড়িনি যে, এ সব বুঝতে পারব না। আহা-হা লছমীরে—"এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং লছমীর পরিত্যক্ত উলের গোলা এবং প্রায়-সমস্ত-বোনা-গেঞ্জিটি তুলিয়া লইয়া তাহাতে দুই চারিটি চুম্বন করিল। দুই চারিটি চুম্বনের পর তাহা একবার বক্ষে চাপিয়া ধরিল এবং সেটিতে পুনরায় যেই চুম্বন করিতে যাইবে অমনই অযোধ্যা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অযোধ্যাকে সহসা প্রবেশ করিতে দেখিয়া, শরৎচন্দ্র সেই উলের গেঞ্জিটি দেখিয়া যেন চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া এবং এইরূপ ভাবে ঐ গেঞ্জিটি দেখিতে দেখিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"বাঃ, বাঃ, ইয়ে খাসা চিজ হ্যায়; অতীব সুন্দর দ্রব্য হ্যায়। যো আদমী—ওহো-হো I mean যো আদমিনী এই খাসা চিজঠো কুরুস্‌কাটি দেকে বোনা হ্যায়, সে নারী কুলে ধন্যনি, তার জন্ম সার্থকনি, তার বোনা কৃতার্থ-নি। মিষ্টার অযোধ্যানাথ বাবু, এই সুন্দর, সুঠাম, সুবোনা গেঞ্জিটি প্রথমে কোনও International Exhibition (আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে) পাঠিয়ে দেবেন; তাহলে পৃথিবীময় আমাদের জাতির একটা সুনাম বেরিয়ে যাবে। তারপর এটিকে মিউজিয়মে পাঠিয়ে দেবেন; তারা—"আদর্শ শিল্প" ব'লে এটিকে সযত্নে রক্ষা ক'রবে, রক্ষা ক'রতে গৌরব বোধ ক'রবে, রক্ষা ক'রে গৌরবান্বিত হবে।"

এই সব দেখিয়া অযোধ্যার পিত্তি জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে, এ সকল কথার কোনও উত্তর, না দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"আপ ইধার আইয়ে, ভৈরবপ্রসাদ বাবু, আপকো অন্দরমে বোলাতেহেঁ।"

শরৎ এক মুখ হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, আমাকে অন্দরমে বোলাতেহেঁ—তা চলুনহেঁ, আমি আপকো পশ্চাদ্ভাগমে, পশ্চাদ্ভাগমে যাচ্চি হেঁ।"

## একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভৈরবপ্রসাদের উদ্যান-বাটীর দুই প্রান্তের প্রাচীরের নিম্ন দিয়া দুইটী লাল কাঁকর দেওয়া রাস্তা—উদ্যানের মধ্যস্থিত অট্টালিকার সম্মুখ হইতে আসিয়া—একেবারে সদর ফটকে রাজপথে মিশিয়াছে। দক্ষিণ প্রান্তের রাস্তার পার্শ্বে ফোয়ারা ও নানারূপ ফুলের গাছ সাজান আছে এবং বাম প্রান্তের রাস্তার পার্শ্বে একটী সুন্দর ও সুপরিস্কৃত, শ্যামল-তৃণরাজি-শোভিত মাঠ। সেই মাঠের উপর লছমী, তাহার সঙ্গিনীদের লইয়া টেনিশ খেলিতেছে। লছমীর সঙ্গিনীদের কথা আমাদের পুস্তকের প্রথমাংশে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে সুতরাং বাহুল্য ভয়ে তাহার আর পুনরুক্তি করিলাম না। লছমীদের খেলা খুব জমিয়া গিয়াছে। তাহার বিপক্ষ-পক্ষরা তিনটী Love Game'এ হারিয়া, খুব জোর খেলা আরম্ভ করিয়াছে কারণ সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই—এই সময়ের মধ্যে যদি তাহারা কিছুও প্রতিশোধ দিতে পারে।

শরৎচন্দ্র, আজ তের দিন হইল কাশীতে রহিয়াছে। কাশীতে সাত দিন থাকিবার কথা হইলেও সে, কাশী ত্যাগ করে নাই। লছমীর রূপমোহে ও তাহার নব্য ধরণ-ধারণ ও কামদার-মোহে শরৎচন্দ্র একেবারে মজিয়া গিয়াছে। লছমীর প্রেম-সাগরে পড়িয়া সে একেবারে নাকানি-চোবানি খাইতেছে। লছমীকে বিবাহ করিবার জন্য সে পাগলের মতন হইয়া উঠিয়াছে। যত দিন যাইতেছে ততই তাহার—লছমীকে পাইবার নেশা

বাড়িয়া উঠিতেছে। এই কয়দিন সে নানান ছুতায়, যখন-তখন লছমীর নিকট উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিত কিন্তু—এক মধ্যাহ্নকাল ও রাত্রি নয়টা, সাড়ে-নয়টা ভিন্ন—সে লছমীর সঙ্গ-সুখ পাইত না। কারণ সকালে ও সন্ধ্যাকালে লছমী, অযোধ্যার কাছে পড়াশুনা করে এবং বৈকালে, সঙ্গিনীদের লইয়া টেনিশ খেলে কিংবা তাহাদের বাটীতে বেড়াইতে যায়। মধ্যাহ্নকালে যদি বা লছমীর দেখা পাওয়া যায়, সে সময় ভৈরবপ্রসাদ ও অযোধ্যা তাহার কাছে থাকে। আর রাত্রে ভৈরবপ্রসাদ যখন বন্ধু-বান্ধব লইয়া তাস খেলা ও গল্প গুজব করেন সেই সময় একবার—তাও সন্ধ্যা-কালীন পাঠাদি সমাপনের পর লছমী মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য—সেইখানে যাইয়া বসে। লছমীকে একাকিনী পাইবার জন্য শরৎ বহু চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হওয়া দূরে যাক পরিবর্ত্তে বরং অযোধ্যার ভ্রূকুটী-ভঙ্গে তাহাকে সন্ত্রাসিত হইতে হইয়াছে। শরতের মনে দৃঢ় ধারণা যে, তাহার রূপে লছমীও মোহিত হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু স্ত্রী-সুলভ লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়া মুখ ফুটিয়া কিছু ব্যক্ত করিতে না পারিয়া—তাহারই মতন ছট্‌ফট্ করিতেছে। এখন যদি একবার ইহাদের দুইজনের নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইয়া যায় তাহা হইলে দুইজনে পরস্পরের প্রতি প্রেম-জ্ঞাপন করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলে এবং অযোধ্যাকে কি ভাবে তাড়ান হইবে, সেই মতলব আঁটে। শরৎচন্দ্র দিবারাত্র এই চিন্তায় মগ্ন। শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে কোনও সময়ই এ চিন্তার আর বিরাম নাই। অপরাহ্নে সেইরূপ ভাবে অঙ্গরাগ ও সাজ-সজ্জা করিয়া, প্রায় সন্ধ্যার সময় চা-পান করিয়া শরৎচন্দ্র ছড়ি ঘুরাইতে, ঘুরাইতে সবান্ধবে বেড়াইতে বাহির হইল। ভৈরবপ্রসাদের উদ্যান-বাটীর ঠিক

মধ্যস্থলে অট্টালিকা অবস্থিত এবং অট্টালিকার চারিপার্শ্বে উদ্যান। অট্টালিকার সম্মুখভাগের উদ্যান "বাহিরের বাগান" এবং পশ্চাদ্ভাগের উদ্যান পিছনকার বাগান "বলিয়া পুরবাসীদের দ্বারা অভিহিত হইত এ কথা বোধ হয় আপনাদের মনে আছে। এই "পিছনকার বাগানে" ফুলের বাগান, মর্ম্মর বেদী মর্ম্মর-পুত্তলিকা প্রভৃতি সজ্জিত আছে এবং ইহার বাম দিকে একটী ছোট দ্বিতল বাটী ও তাহার সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করণী আছে। লছমীর মাতা যখন জীবিতা ছিলেন সেই সময় তিনি এই ছোট বাড়ীটিতে আপনার পূজার্চ্চনা প্রভৃতি করিতেন। শরৎচন্দ্রের থাকিবার জন্য ভৈরব-প্রসাদ এই বাটিটী পরিস্কার করাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই বাটীতে থাক্লে—শরৎচন্দ্রের বিধবা মাতা ও মাসীমাতাদের কোনও রকম অসুবিধা হইবে না বলিয়া, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্র প্রতিদিন দুই বেলা বেড়াইতে যাইত। অদ্য বেড়াইতে বাহির হইয়া "সামনের বাগানের" দক্ষিণ প্রান্তস্থিত রাস্তার উপর দিয়া, সদর রাস্তার উদ্দেশে যাইবার সময় দেখিল যে, লছমী ও তাহার সঙ্গিণীগণ টেনিস খেলা শেষ করিয়া, তাহাদের হস্তস্থিত র‍্যাকেটগুলি একখানি লৌহ নির্ম্মিত বেঞ্চির উপর রাখিয়া দিয়া—বাগানের বাম-প্রান্তস্থিত রাস্তার উপর দিয়া, অট্টালিকার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। যাইবার সময়—অপর প্রান্তস্থিত রাস্তার উপর শরৎকে দেখিয়া লছমী ঈষৎ হাস্য-সহকারে, কোমর হইতে রুমালখানি টানিয়া লইয়া উর্দ্ধে আন্দোলিত করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া শরৎচন্দ্র 'আনন্দে আটখানা' হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া প্রথমটায় ঐরূপ ভাবে আন্দোলিত করিয়া অবশেষে তাহার ছড়ির ডগায় রুমালখানি বাঁধিল এবং তাহা উর্দ্ধে তুলিয়া

ঘন, ঘন নাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রুমালখানি পকেটে পুরিয়া সে হস্ত দ্বারা ঘন, ঘন ইঙ্গিত করিয়া, লছমীকে দাঁড়াইতে বলিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার ঈঙ্গিতে কোনও ফল হইল না। কারণ, তাহাকে ঐ ভাবে চড়িতে বাঁধিয়া রুমাল ঘুরাইতে দেখিয়া লছমী ও তাহার সঙ্গিণীগণ হাসিয়া আকুল হইয়া, একরূপ ছুটিতে ছুটিতে অট্টালিকার ভিতরে চলিয়া গেল।

লছমী তাহার ঈঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া দ্রুতপদে বাটীর ভিতর চলিয়া যায় দেখিয়া—তাহার কাছে উপস্থিত হইবার জন্য শরৎচন্দ্র দৌড়িয়া আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে যখন, ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, মাত্র মাঠের কাছে উপস্থিত হইল, লছমীরা তখন বাটীর কাছে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, সে আর অগ্রসর হইল না বটে কিন্তু ঐ মাঠের উপর গিয়া লছমীরা যে স্থানটিতে দাঁড়াইয়া টেনিস খেলিতেছিল— সেই স্থানে শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল এবং ঘাসের উপর চুম্বন করিতে লাগিল।

শরতকে ঐ ভাবে দৌড় মারিতে দেখিয়া হরিচরণ ও মাধব বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল এবং তাহারাও দৌড়াইয়া মাঠের উপর আসিয়া, শরতকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া বলিল—"ও কি বাবু, ও কি ব্যাপার? উঠুন, উঠুন।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, উঠচি, উঠচি।" এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র আবার ঘাসের উপর গোটাকয়েক চুমু খাইল এবং তথাকার খানিকটা মাটি তুলিয়া লইয়া, জামা খুলিয়া বুকের উপর রগড়াইয়া মাখিতে লাগিল। তৎপরে সোৎসাহে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আর কি কেল্লা মেরে দিয়েছি। আমার ওপর লছমীর ভালবাসা সম্বন্ধে যে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল, সেটা আজ দূর হয়ে গেল।"

হরিচরণ বলিল—"কিসে বুঝলেন বাবু-মশাই, লছমী কি আপনার চেহারার সুখ্যাতি ক'রেছে নাকি ?"

শরৎচন্দ্র একটু বিরক্তভাবে বলিল—"তুমি কি কাণা নাকি ? আমি যখন ওই ধারের রাস্তা দিয়ে আসছিলুম সে সময় লছমী ওর friendদের আমার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল মনে আছে ? দেখ, লছমী যে আমায় ভালবাসে, সেটা আমার কাছে নাহয় লজ্জার খাতিরে আগে বলতে পারছেনা। কিন্তু ওর সঙ্গিণীদের কাছে কেন লজ্জা করবে ? সঙ্গিণীদেরই, মনের কথা সকলে বলে। 'আমি যে ওর মনোচোর' সেইটা আমায় দেখিয়ে দিয়ে, ওদের বল্লে তারপর ওরা, 'ঐ যে লজ্জায় মুখ লাল ক'রে হেসে ছুটে পালাল,' ওটি প্রেমের লক্ষণ ; মহা প্রেমের লক্ষণ—বুঝলে এবার বোকচন্দর।"

হরিচরণ একটু ঢোক গিলিয়া বলিল—"তা আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন তো—তা'হলেই হোল।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"আরে শুধু কি আজকের এই ব্যাপার—আজ এই ক'দিন ধরে আমি, প্রতি দিন লক্ষ্য ক'রে যাচ্চি যে, লছমী আমার সঙ্গে যখনই কথা কয় তখনই মুচকে হেসে তবে কথা কয়। আর ঘন,ঘন আমার দিকে চুরি ক'রে চেয়ে দেখে। যেই আমি তার দিকে চাইলে তার চুরি ধরা পড়ে যায়-অমনই টপ্ ক'রে চোখ নামিয়ে নেয়।"

হরিচরণ বলিল—"তা বাবু, যদি আপনাকে, লছমী ভালবেসে ফেলে থাকে তাহলে আপনাকে, তার প্রেমটা জানায় না কেন ?"

শরৎ বলিল—"আরে মুর্খ, হাজার আমার চেহারা ভাল হোক আর হাজার আমার প্রেমে পড়ে থাক তবুও লছমীতো মেয়ে মানুষ—

নারী-সুলভ একটা লজ্জাওতো ওর আছে। তা' দেখ, লছমী আমার প্রেমে যে রকম পড়েছে তাতে আমার বোধ হয়, লছমী লজ্জা-ফজ্জার ধার ধারতো না, আমার গলা ধরে স্পষ্টই আমায়, উপযাচিকা হ'য়ে বলতো যে, 'ওগো আমি তোমায় বড় ভালবাসি'। কিন্তু কেন তা করেনা জান? ওরকম ক'রলে—এরপরে বিয়ে হ'য়ে গেলে সে সময় পাছে আমি—নির্লজ্জা, বেহায়া—ব'লে ওকে ভৎর্সনা করি, এই ভয়ে ও তা করে না। নইলে ভৈরবপ্রসাদ, অযোধ্যা এরা সব সামনে থাকতেও, লছমী যে রকম ভাবে আমার দিকে চেয়ে দেখে তাতে আমারত্তে ভয় হয় যে, ও বুঝি বা ফঠ্ করে এসে, ওদের সামনেই আমার গলা জড়িয়ে ধরে প্রেম জানায়। দেখ আরও এক কারণে লছমীর—শুধু লছমীর কেন, আমারও বড় অসুবিধে হয়। এই অযোধ্যা ব্যাটা, আমাদের ভালবাসা সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রে লছমীকে সদা-সর্ব্বদা চোখে, চোখে রেখেছে। আর তা ছাড়া এই ব্যাটা বুড়ো, বেরসিক ভৈরবপ্রসাদও লছমীকে কাছ-ছাড়া করেনা। যখনই যাও, দেখবে যে এদের একজন, সময় সময় এরা দুজনেই, লছমীর কাছে রয়েছে। একবার যদি ওকে নির্জ্জনে পাই তাহলে সব গোলমাল মিটে যায়। দেখ হাজার হোক আমি বিদেশী বঁধু; আমার মুখ থেকে কিছু না শুনলে লছমী ব্যাচারা তো ভরসা পাচ্চেনা কিনা? আমার মুখ থেকে যেই একবার শুনবে যে—'আমি তাকে ভালবাসি'—অমনই দেখ' সে ছুটে এসে, ক'সে চেপে গলা জড়িয়ে বলবে—'ওগো আমি তোমায় বড় ভালবাসি গো বড় ভালবাসি; ওগো আমি তোমার দাসী গো তোমার জোড়া চরণের দাসী।" এই কথা বলিতে বলিতে শরৎ আনন্দে লাফাইয়া উঠিল।

হরিচরণ বলিল—"তা'-বাবু মশাই শুনতে পাই যে, অযোধ্যার সঙ্গে লছ্‌মীর বিয়ের সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে। তা অযোধ্যাকে কি লছমী ছাড়বে?"

শরৎ তাচ্ছিল্যভাবে বলিল—"আমার এমন সুন্দর চেহারা আর অযোধ্যা ব্যাটা ওই রকম বিশ্রী দেখতে—ও কখনও আর অযোধ্যাকে ভালবাসতে পারবে। আগে আমায় দেখেনি তাই অযোধ্যাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল। এখন যখন আমায় দেখেছে, তখন দেখে নিও—আমার মুখে একবার আশার কথা পেলে—ও তখনই ওই অযোধ্যা ব্যাটাকে Hoot out ক'রে দেবে। লছমী আমায়, প্রাণের চেয়ে ভালবাসে।"

হরিচরণ বলিল—"তা' ভাল না বাসবেই বা কেন? আপনার মতন এমন সুন্দর চেহারা কোথায় পাবে।"

মাধব তাড়াতাড়ি বলিল—"তা যা বলেছ, বাবুকে দেখলে আমাদেরই যখন ভালবাসতে ইচ্ছে করে তখন লছমীতো মেয়েমানুষ।"

হরিচরণ গম্ভীর ভাবে বলিল—"একটু সাবধানে চলবেন বাবু—"দেখবেন শেষে ঐ অযোধ্যা ব্যাটা আপনার প্রেমে না পড়ে যায়।"

মাধব আরও গম্ভীর ভাবে বলিল—"হ্যাঁ একটু সাবধানে চলা দরকার। আমারতো বাবু বড় ভয় হয় যে, এই বিটের-কনষ্টেবলটা বুঝি আপনার প্রেমে পড়ে যায়। আপনি রাস্তায় বেরোলে, কনষ্টেবলটা যে রকম ঘন, ঘন আপনার দিকে কটাক্ষপাত করে, তাতে তো আমার মনে হয় যে, কনষ্টেবলটা আপনাকে খপ্‌ ক'রে আলিঙ্গন ক'রে, ডাকে বুঝি প্রাণনাথ বোলে।"

শরৎচন্দ্র মহা গম্ভীর ভাবে বলিল—"না হে না, সে সব কোনও ভয় নেই—আমি খুব সাবধানে আছি।"

এইরূপ ধরণের নানা গল্পগুজব করিতে, করিতে অনেকগুলি সিগারেট পোড়াইয়া, শরৎচন্দ্র বলিল—"ছাখ, আজ আমি এক মতলব করেছি—সেই মতলবেই আমার কার্য্য-সিদ্ধি হবে। আজ আমি একখানি চিঠি লিখে, লছমীকে আমার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা ক'রতে বলেছি। আমি আর একটু পরে লছমীর শোবার-ঘরের জানালা গলিয়ে চিঠি খানা ফেলে দোব। সেই চিঠি পেয়ে, লছমী নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসবে। তার পরে ওর সঙ্গে সব ব্যবস্থা ঠিক করে নোব। আগে ঐ অযোধ্যা ব্যাটাকে তাড়াবার ব্যবস্থা ক'রব। তার পর বিয়ের দিন ঠিকঠাক ক'র শুভকর্ম্ম লাগিয়ে দোব। তোমরা এখন বাড়ীর দিকে যাও। বাড়ী গিয়ে একেবারে ঘরের ভেতর বসে থাকগে; দেখো খবরদার আমায় যেন খুঁজতে এস না। আমি এই চিঠিতে—পুকুরধারে এসে দেখা করবার জন্যে—লছমীকে লিখেছি।"

হরিচরণ বলিল—"আমরা যাচ্চি; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রে যাই। আচ্ছা লছমী না হয় আপনার অলোকসামান্য-রূপ দেখে মোহিত হয়ে আপনাকে ভালবেসেছে, কিন্তু ভৈরবপ্রসাদ তো আর আপনার রূপে মোহিত হ'য়ে আপনার প্রেমে পড়েনি—সে কেন আপনাদের এই বিয়েতে সম্মতি দেবে?"

শরৎচন্দ্র বলিল—"সম্মতি দেবে না? না, না, নিশ্চয়ই দেবে ভৈরবপ্রসাদ নব্য সভ্যতার পক্ষপাতী; তার মনে কোনও রকম কুসংস্কার নেই, সে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তার মেয়ে যাকে বিয়ে ক'রতে

চাইবে, সে তাতেই সম্মতি দেবে। ভৈরবপ্রসাদ যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ব্বর নয়, সে যে সভ্য ও নব্যচালে দক্ষ, এ সব দেখাবার এই একটা মহা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এ সুযোগ ভৈরবপ্রসাদ কখনই ত্যাগ ক'রবে না।"

হরিচরণ বলিল—"তা যাই বলুন বাবু, আমার বোধহয় যে, ভৈরব প্রসাদ খোঁট্টা হয়ে বাঙ্গালীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না। ও সব কুসংস্কার বা সভ্যতার কথা পরের বেলায়—নিজের বেলায় নয়। আর যখন এ বিয়েতে অনেক বাধা, তখন কাজ নেই বাবু ও হাঙ্গামায় গিয়ে।"

এই কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্র একটু দমিয়া গেল। সে কিছুক্ষণ যাবৎ মনে মনে এই সব কথা তোলা-পাড়া করিয়া, হঠাৎ জোড়-হস্তে ও উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—"দোহাই বাবা বিশ্বনাথ, লছমীকে পাবার পথে যে সব বাধা রয়েছে সে সব দূর ক'রে দাও বাবা।"

হরিচরণ ও মাধব সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"ওকি বাবু, আপনি বাবা বিশ্বনাথকে ডাকছেন যে। এ কি ব্যাপার! যাঁ্যা!!"

শরৎচন্দ্র বলিল—"মা টা সব তোমরাইতো বল যে, বাবা বিশ্বনাথকে ডাকলে মনের কমনা পূর্ণ হয়।"

হরিচরণ বলিল—"আমরা তো বলি আর এখনও বলছি; কিন্তু আপনি যে এই কথার জন্যে আমাদের কত গাল-মন্দ করেছেন। আপনার Nature আজ কোথায় গেল। এই Nature এর কথা নিয়ে আমাদের বাপ তুলে গালাগাল অবধি দিয়েছেন। এখন Nature কে না ডেকে বাবা বিশ্বনাথকে ডাকছেন কেন? আজ হঠাৎ ভূতের মুখে রাম-নাম শুনছি কেন?"

সভ্য, কুসংস্কার-মুক্ত বিজ্ঞান-জানিত শরৎচন্দ্র এখন আর এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। সে এসকল কথা কানে না তুলিয়া, বাবা বিশ্বনাথকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু সে নিজে যেমন পাষণ্ড, তার শিক্ষা যেমন, তাহার মন যেমন, ঠিক তেমনি ভাবে ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া, পরীক্ষা করিবার ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল—"দোহাই বাবা বিশ্বনাথ, লছমীকে পাইয়ে দাও বাবা; তোমায় খুব ভাল ক'রে পূজো দোব। তুমি যদি তিন দিনের মধ্যে লছমীকে পাইয়ে দাও তাহ'লে আমি একশো—দুশো—আচ্ছা তা কেন, একেবারে পাঁচশ টাকার পূজো দোব। তুমি তো বাবা পাঁটা খাও না। নইলে বাবা তোমায়, খুব ভাল মিটুলীওলা পাঁটা পূজো দিতুম বাবা। অন্য লোকদের মতন শুধু কাঁচা মাংস পূজো দিয়ে, তোমার ঘাড়ে ঘি মশলার খরচা চাপাতুম না আর তোমার কাজও বাড়াতুম না বাবা। বেশ ভাল ক'রে কারী, কোরমা রাঁধিয়ে, চপ কাটলেট তৈরী করিয়ে তবে তোমায় নিবেদন করাতুম, তোমার পূজো দিতুম। দোহাই বাবা লছমীকে পাইয়ে দাও বাবা। পুতুল ব'লে পাথর ব'লে কখনও তোমায় ডাকিনি বাবা। তা ছাড়া কখনও কোনও দরকার পড়েনি তাই তোমায় ডাকি নি। আমাদের মতন বড় লোকেরা এক মামলা মোকর্দ্দমার সময়, তাতে জিত হবে ব'লে; আর সাহেব-সুবোর সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবার সময়, বে সামাল না হয়ে নির্ব্বিঘ্নে ফিরতে পারবে ব'লে, তোমাকে ডাকে। আমি কিন্তু দেখ বাবা ঐ সব দরকারের সময়ও তোমায় ডাকিনি। আজ কিন্তু তোমায় যখন আমি ডাকছি তখন এটা তোমার পক্ষে খুব শুভ অবসর বলতে হবে। "Nature-এর (স্বভাবের) দ্বারা পৃথিবী ইত্যাদি সব সৃষ্টি হয়েছে" এ কথা বরাবর

মেনে আসছি। আজ কিন্তু দেখছি যে, Nature-এর দ্বারা ঠিক সময়-মত সব প্রয়োজন পূর্ণ হয় না। তুমি যদি বাবা আমার এই প্রয়োজনটি পূর্ণ কর তা'হলে স্বীকার ক'রব যে, তুমি ঈশ্বর, আর ঈশ্বরের দ্বারা পৃথিবী ইত্যাদি সব সৃষ্টি হয়েছে—বুঝলে বাবা? এমন সুযোগ ছেড় না বাবা; যদি এ সুযোগ ছাড় তা'হলে এর পরে তোমায় পস্তাতে হবে। তখন কিন্তু আমায় হাজার বল্লেও আমি সেই Nature কেই মানব—তোমায় মানব না।" এই কথাগুলি উর্দ্ধমুখে ও উর্দ্ধ দিকে দুইটী হস্ত জোড় করিয়া তুলিয়া বলিয়া শরৎচন্দ্র, বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে ভূমিতে মাথা ঠুকিয়া, স্বকার্য্য সাধনের জন্য নানারূপ প্রলোভন দেখাইল। তারপর, হরিচরণ ও মাধবকে সেস্থান হইতে বিদায় করিয়া দিয়া সে, সেই মঠের উপর একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে চাঁদ উঠিয়াছিল। শরৎচন্দ্র একদৃষ্টে সেই চাঁদের পানে চাহিয়া, কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর সেস্থান ত্যাগ করিয়া স্বকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইল।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

লছমীর শয়ন-কক্ষ। গৃহের মধ্যস্থলে একখানি সুন্দর খাট, তাহার উপর সুপরিষ্কৃত বিছানা। বিছানার উপর মাথার বালিসের কাছে দুই-খানি বাঙ্গলা উপন্যাস রহিয়াছে। সেই ঘরের একটী প্রবেশ-দ্বার, প্রবেশ-দ্বারটী বাটীর ভিতর দিকে অবস্থিত। ঘরের অন্য প্রান্তে দুইটি জানালা খোলা রহিয়াছে, সেই জানালার নিচেই বাগান। ঘরের ভিতরে জানালার কাছে একটী ছোট সেক্রেটারিয়েট-টেবল রহিয়াছে। টেবিল-টির মধ্যস্থলে একটী বড়, কেরোসিনের টেবিল-আলো জলিতেছে এবং তাহার চারিদিকে কতকগুলি বই, খাতা, দোয়াত, কলম প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই টেবিলের দুই পার্শ্বের দুইখানি চেয়ারে অযোধ্যা ও লছমী বসিয়া আছে। লছমী একখানি খাতায় একমনে কি লিখিতেছে; অযোধ্যা নিবিষ্টচিত্তে, জগদ্বিখ্যাত ফরাসী কবি আনাতোল ফ্রাঁসের সুবি-খ্যাত ও সুন্দর উপন্যাস "লা-রতিসারি-দ-লা রেন পেডক" নামক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ "য়্যাট দি সাইন অব্ দি রেন পেডক" একমনে পড়িতেছে। এই ঘরের ভিতরে—খাটখানির নিকটে একটী বৃহৎ ও সুন্দর আলনা-বাক্স রহিয়াছে—তাহার উপর দিকে লছমীর নিত্য ব্যবহার্য্য কয়েকখানি সাড়ী, ওড়না ও তিন, চারিটী জামা ঝোলান রহিয়াছে এবং নীচের দিকে কয়েক জোড়া বিলাতী জুতা সাজান রহিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে, পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া অযোধ্যা বলিল—"লছমী একটু তাড়াতাড়ি লিখে নাও, রাত্রি সাড়ে নয়টা বেজে গেল।"

লছমী কোনও উত্তর না দিয়া, আপন মনে লিখিয়া যাইতে লাগিল। এই ঘরটী লছমীর শুইবার ঘর, এটী দ্বিতলে অবস্থিত। লছমীর পড়িবার-ঘর বাটীর একতলায়। আজ কিন্তু লছমী পড়িবার ঘরে, পড়িতে না গিয়া এই ঘরে অযোধ্যাকে ডাকাইয়া আনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ করিবার কারণ এই যে, আজ সন্ধ্যার সময়, টেনিস খেলিবার পর, শরতের রুমাল-ঘোরান ব্যাপারে হাসিতে, হাসিতে লছমী যখন দ্রুতপদে বাটীর দিকে আসিতেছিল; সেই সময় একটা মাটীর টবে ঠোক্কর লাগিয়া সে, পায়ে বড় আঘাত পায়। তারপর বাটীতে আসিয়া একেবারে নিজের শয়ন-কক্ষে গিয়া, কাপড়-চোপড় ছাড়িবার পর: পায়ের ব্যাথাটা, একটু বেশী বলিয়া মনে হওয়াতে, সে—সেদিন আর নীচের তলায় না নামিয়া ঐ শয়ন-কক্ষে বসিয়া পড়িবার মানস করিয়া অযোধ্যাকে ডাকিয়া পাঠায়। অযোধ্যা এই সংবাদ শুনিয়া উপরে আসে এবং লছমীর আঘাত-প্রাপ্ত স্থানে হোমিওপ্যাথিক "আরনিকা-লোসন" লাগাইয়া দিয়া তারপর পড়াইতে বসে।

ইহাদের দুই জনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ জানালায় খট্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল। দুই জনেই একবার জানলার দিকে চাহিয়া—কিছুই দেখিতে না পাইয়া—আবার নীরবে যে-যার কাজে মন দিল।

লছমীর শয়ন-কক্ষের নিচেই বাগান, সেই বাগানের উপর অনেকগুলি নগ্ন মর্ম্মর-মূর্ত্তী, মৃত্তিকা নির্ম্মিত বেদীর উপর শোভা পাইতেছে। লছমীর শয়ন-কক্ষের জানালার ঠিক নিচেই যে মর্ম্মর-মূর্ত্তীটি রহিয়াছে, শরৎচন্দ্র তাহার পাদদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। সেস্থান হইতে উপর দিকে চাহিয়া—লছমীর শয়ন-কক্ষে আলো দেখিতে পাইয়া সে মনে, মনে বলিল—"ঠিক

হয়েছে, ঠিক সময়ে এসে পড়েচি। সাড়ে নটা বেজে গেছে—এই সময়ে লছমী পড়াশুনো শেষ ক'রে শোবার ঘরে এসে কাপড়-চোপড় বদলে তারপর ওর বাপের বন্ধুদের কাছে বসে। ঐ যে ঘরে আলো জ্বলছে, লছমী তা হ'লে নিশ্চয়ই কাপড় বদলাবার জন্তে—পড়বার ঘর থেকে এই ঘরে এসেছে। দি এইবার চিঠিখানা ফেলে। এই সময় লছমী একলা রয়েছে, এই ঠিক সুযোগ।" এইরূপ চিন্তা করিয়া শরৎচন্দ্র, ভূমি হইতে একটি ছোট ঢিল্ তুলিয়া লইয়া, তাহার পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সেই ঢিলটাতে মোড়ক করিল এবং লছমীর ঘরের উদ্দেশ্তে সেই মোড়কটা ছুঁড়িয়া দিল। মোড়কটা ঘরের ভিতর গেল না; জানালায় লাগিয়া একটি শব্দ করিয়া পুনরায় বাগানে আসিয়া পড়িল।

শরৎচন্দ্র তখন সেটা কুড়াইয়া লইয়া, সেই বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এক হস্তে মর্ম্মর মূর্ত্তীটিকে চাপিয়া ধরিয়া, অন্য হস্ত দ্বারা সজোরে সেই মোড়কটি ছুঁড়িয়া দিল। এবার সেই মোড়কটী লছমীর শয়ন-কক্ষের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং টেবিলের উপরিস্থিত আলোর চিমনির গায়ে ঠং করিয়া পড়িয়া, টেবিলের উপর গড়াইয়া পড়িল। শরৎচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে ধীরে, ধীরে বেদীর উপর হইতে নামিয়া, বরাবর বাটীর পিছন দিকে উপস্থিত হইয়া, 'পিছনকার বাগানের' কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া—তথায় যে পুকুরটী আছে, সেই পুকুরের ঘাটের উপর সান্ বাঁধান চাদনীতে যাইয়া বসিল এবং মনের আনন্দে শিস্ দিয়া গাহিতে লাগিল।

ঠং করিয়া শব্দ হওয়াতে লছমী ও অযোধ্যা উভয়েই চমকিত হইয়া চাহিয়া সেই কাগজের মোড়কটী দেখিতে পাইল। লছমী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অযোধ্যা ক্ষিপ্র-হস্তে সেই মোড়কটী তুলিয়া লইয়া, তাহা খুলিয়া

ফেলিল; এবং দেখিল যে, সেটি একখানি বাঙ্গলায় লেখা চিঠি। বিস্মিত হইয়া অযোধ্যা পত্রখানি পড়িতে লাগিল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :—

বহু-বহু-বিদূষী, মহা-মহা-মহিয়সী শ্রীমতী লছমী-সুন্দরী
শ্রীপদ-পঙ্কজেষু।

হে প্রাণ-পিয়ারী, বড়-বড়-নরনিন্দিতা-নারী, লছমী প্রাণেশ্বরী,

তুমি আমার অতুলনীয় রূপে মোহিত হইয়া আমায় ভালবাসিয়াছ এবং নারী-সুলভ লজ্জায় তাহা আমাকে জানাইতে না পারিয়া মহা কষ্ট পাইতেছ, এ কথা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার এই অতুলনীয় রূপের মহিমাই এই যে—আমায় যে দেখে সেই মজে, কিন্তু আমায় পায়না—কারণ আমি নিজে মজিনা। আমার দেশে, এ পর্য্যন্ত কত শত স্ত্রীলোক আমায় দেখিবামাত্রই আমার প্রেমে লট্-পট্ খাইয়াছে, তাহার আর সীমা-সংখ্যা নাই। আমি কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও দিকে ফিরিয়া চাই নাই।

আমার এই অতুলনীয় রূপের আরও মাহাত্ম এই যে—স্ত্রীলোক তো দূরের কথা, পুরুষে অবধি আমার রূপে মোহিত হইয়া আমার প্রেমে পড়িয়া যায়। এই কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে তোমাদের এই ঘাঁটির কনেষ্টবলকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আজ মাত্র কয়দিন আমি তার সামনে দিয়ে চলা ফেরা করেছি তাতেই—ওহো Pity—তাতেই সেই Poor কনেষ্টবলটি, আমার প্রেমে প'ড়ে লাঠিমের মত বন্ বন্ ঘুরচে। আমি যখনই তার সামনে দিয়ে যাই সে তখনই—সব লোক ছেড়ে, কেবল আমার দিকে আড়ে-আড়ে অর্থাৎ সলজ্জ-ভাবে চেয়ে দেখে—এটা প্রেমে পড়ার লক্ষণ কি না, তুমিই বল।

এই ব্যাপারেই বোধ হয় আমার রূপ সম্বন্ধে তোমার খুব উচ্চ ধারণা হয়েছে? আর বেশী কিছু প্রমাণ তোমায় দেখাতে হবে না বোধ হয়?

এত লোকে আমার প্রেমে পড়ে শুনে, তোমার বোধ হয় খুব ভয় আর 'জেলাসি' হচ্ছে? কিন্তু প্রাণেশ্বরী—এতে তোমার কোনও ভয় নাই, কোনও চিন্তা নাই জানিবে। কারণ এপর্য্যন্ত অনেকে আমার প্রেমে পড়েছে বটে, আমি কিন্তু কাহারও দিকে ফিরিয়া চাই নাই। আমি শফং, মহা-শফং করিয়া, অতি উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমি এ পর্য্যন্ত অসূর্য্যম্পশ্য আছি। তার ওপর আমি তোমায় ভালবাসিয়াছি এবং আমি তোমায় চাই। তোমার বাহাদুরী আছে, কারণ হাজার, হাজার লোক যাহা পারে নাই তুমি তাহা পারিয়াছ—আমাকে তোমার প্রেমের ফাঁদে বন্দী করিয়াছ। আর এ কথাও নিশ্চয় যে, তুমি পূর্ব্ব জন্মে মাথা কাটিয়া আহুতি দিয়া মহা তপস্যা করিয়াছিলে তাই আমার মতন জ্ঞানবান, গুণবান, চরিত্রবান, প্রেমবান, রূপবান, সুন্দর দেহবান, লম্বাবান, চওড়াবান, ধনবান, সদা-প্রেমে-আনচান পুরুষ-সতী পতি লাভ করিতেছ।

আমি পুকুর ঘাটে অপেক্ষা করিতেছি—তুমি এখনই একবার আইস—আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া যাও; আর আজিকার এই বেশ পরিষ্কার, ধোয়া-মাজা-সাদা-শিশির-মতন জোৎস্নাময়ী নিশিতে, চাঁদকে সাক্ষী রাখিয়া আমাদের প্রথম 'কোর্টসিপ' হউক।

ভাগ্যবতী, তোমার প্রতি অতি সুপ্রসন্ন

মহামতি শরৎচন্দ্রবাবু।

অযোধ্যা পত্রখানি উপর্য্যুপরি দুই, তিনবার পাঠ করিল এবং বিস্ময়

ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া, সেই নিরীহ ও নিরপরাধ টেবিলটির উপর দুই তিনটি ঘুসী মারিল।

অযোধ্যার রকম-সকম দেখিয়া লছমীর বিস্ময় ভাবটা কিছুক্ষণের জন্য দূরে পলাইল। সে তো হাসিয়াই আকুল। হাসিতে হাসিতে বলিল—"ব্যাপার কি অযোধ্যা, হঠাৎ অমন চোটলে কেন?"

অযোধ্যা দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিল—"রাতদিনই কি যে দাঁত বের ক'রে হাস। সব সময় ওরকম হাসি ভাল লাগে না; তোমার ঐ রকম হাসি দেখলে আমার হাড় পিত্তি জ্ব'লে যায়। এই নাও, এই চিঠি খানা প'ড়ে দেখ।"

অযোধ্যার হাত হইতে পত্রখানি লইয়া লছমী পড়িতে লাগিল। অযোধ্যা চেয়ারের উপর একটি পা তুলিয়া দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া লছমী গম্ভীর ভাবে বলিল—"কি ক'রবে ঠিক ক'রলে। বাবাকে চিঠি খানা দিইগে—কি বল?"

অযোধ্যা বলিল—"না, না; তাতে ঠিক ফল হবেনা। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখনই ঘুরে আসচি। তোমার একখানা সাড়ী আর একখানা ওড়না টপ্ করে দাও দেখি।

লছমী 'আলনা হইতে সাড়ী, ওড়না নামাইয়া দিল। অযোধ্যা সেগুলি কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

---

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সান্-বাঁধান পুকুর ঘাটের চাঁদনীর উপর শরৎচন্দ্র বসিয়া আছে এবং পা নাচাইতে নাচাইতে শিশ দিতেছে। কিছুক্ষণ পরে শিশ দেওয়া বন্ধ করিয়া শরৎচন্দ্র আপন মনে বলিল—"খুব জবর চিঠি দিয়েছি। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে চিঠি খানা বেশ কবিত্বময় ক'রে দিয়েছি। এখন এইবার লছমী এলে, ওর সামনে বেশ গুচিয়ে-গাচিয়ে কবিত্ব-মাখা কথা ব'লতে পারি, তাহলেই মুখ রক্ষা হয়। বেশ কবিত্বময় কথা না হলে প্রেম জ্ঞাপন করা চলেনা। অমনই নেহাৎ ঘরোয়া কথায় প্রেম জানালে লছমী, আমায় বেরসিক ভাববে। হাঁ-হাঁব্-বাবা ঐ যে, ঐ যে আসছে—ঠমকে ঠমকে, হেলতে, দুলতে লছমী আসচে। না এসে ক'রবে কি? আমার রূপ দেখে মোহিত না হয়ে যাবে কোথায়? আহা আমিরে, তুই বেঁচে থাক্; কি রূপ নিয়েই জন্মেছিলিরে বাবা আমি।" এই সকল কথার পর রুমাল লইয়া জামা, কাপড়, চাদর প্রভৃতি ঝাড়িতে লাগিল। তারপর পা দুটি উচু করিয়া, সেই রুমাল দিয়া বেশ ভাল করিয়া জুতা জোড়াটি মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহাতে মন সন্তুষ্ট হইল না বলিয়া, থুতু দিয়া রুমাল ভিজাইয়া ফের জুতা মুছিল। জুতা মোছার পর্ব্ব শেষ করিয়া, শরৎচন্দ্র হস্তস্থিত রূপা বাঁধান ছড়িটির মাথাটি রুমাল দিয়া মুছিল। ইহাতেও কিন্তু তাহার তৃপ্তি হইল না। সে রাস্তার উপর হইতে এক মুঠা লাল-কাঁকরের গুড়া তুলিয়া লইয়া ছড়িটির রূপা-বাঁধান

মাথাটার উপর খুব জোরে একবার ঘসিয়া দিল। এই সময় একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী—ঐ ঘাটের অতি নিকটবর্ত্তী একটি লতাকুঞ্জের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সে, যেখানটীতে দাঁড়াইল—ঐ লতা-কুঞ্জের গাছের ছায়া পড়িয়া—সে স্থানটী অপেক্ষাকৃত একটু অন্ধকার। শরৎচন্দ্র বলিল—"ঐখানে, ঐখানে থাকো প্রাণেশ্বরী—চারদিকে চাঁদের আলো, ঐখানটায় একটু কম আলো: ঐখানে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না। আমি যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি, কোনও চিন্তা নেই।" সে এই সকল কথার পর মনে, মনে বলিল—"এইবার একটু কবিত্বমাখা প্রেমোচ্ছ্বাসের অভিনয় দেখাতে হবে।"

এখন শরতের পরিধানে একখানি শান্তিপুরের কাপড়, একটি সিল্কের জরিদার জামা ও একখানি বেনারসী জরিদার চাদর রহিয়াছে। শরৎচন্দ্র কাপড়ের কোঁচা খুলিয়া তাহা মালকোচা মারিয়া পরিল, গলা হইতে চাদর খানি খুলিয়া মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া ফেলিল এবং ছড়িটী বাম হস্ত নিচু করিয়া ধরিয়া—খাপ্ শুদ্ধ তরোয়াল যেমন ভাবে ঝুলান থাকে ঠিক সেইরূপ ভাবে ধরিয়া লইল। তারপর মস্তকটী সম্মুখ দিকে হেলাইতে হেলাইতে এবং লম্বা, লম্বা পা ফেলিতে ফেলিতে সেই অবগুণ্ঠনবতীর নিকট গমন করিল। তাহার সম্মুখে গিয়াই—খাপ হইতে যেরূপ ভাবে তরোয়াল খোলে সেইরূপ ভাবে—তাহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া বাম হস্তের মুঠার মধ্য হইতে ছড়িটি টানিয়া বাহির করিয়া সেই অবগুণ্ঠনবতীর চরণতলে রাখিল। তৎপরে দুই হস্ত দিয়া মাথার উপর হইতে সেই চাদরে বাঁধা পাগড়িটী নামাইয়া অবগুণ্ঠনবতীর পায়ের উপরে রাখিয়া, অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত মুখ নাড়িতে, নাড়িতে বলিল—"হে সেঁইয়ানী, তোমার কটাক্ষরূপ

বন্দুকের গুলিতে আমার হৃদয়-দুর্গ বিধ্বস্ত। তোমার নিতম্ব-স্পন্দিত গমন-রূপ গোলার আঘাতে আমার প্রাণ-রূপ বাষ্পপোত ক্ষত-বিক্ষত। তোমার পীনপয়োধর-রূপ বর্শার খোঁচায় আমার মন-রূপ-রণকুশল-সেনাপতি পটলোৎপাটন-প্রয়াসী। এতদিন পরে আজ আমি তোমার নিকট পরাজিত। হে অপরূপ রূপসী, হে হৃদি-সরোবর-বিহারী সারসী, হে মনকুঞ্জ-বিহারী বায়সী, হে নিমন্ত্রণ-বাড়ীর রসগোল্লা আর পায়সী আমার এই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অসি আর এই রত্ন-বিহীন-উষ্ণীশ, তোমার পদতলে—আমার পরাজয়ের চিহ্নস্বরূপ অর্পণ করলুম। হে রূপশালিনী সৌন্দর্য্য-বেটিনী, মাধুর্য্যময়ী-মুখপুড়িনী আমি তোমার, তুমি আমার হও।"

শরতের কথা শেষ হইলে সেই অবগুণ্ঠনবতী ধীরে ধীরে ললিত পদক্ষেপে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া ভূমি হইতে পাগড়িটী তুলিয়া শরতের মাথায় পরাইয়া দিল এবং ছড়িটী তাহার হাতে তুলিয়া দিল।

শরৎচন্দ্র, পাগড়ি পরিবার সময় দুই হাত বুকে রাখিয়া ও গ্রীবা বক্র করিয়া মস্তক অবনত করিল এবং ছড়িটি হাতে পাইয়াই, অবগুণ্ঠনবতীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তা'হলে তুমি আমার? বল, বল; চুপ ক'রে রইলে কেন?" এই বলিয়া সে, অবগুণ্ঠনবতীর হস্ত ধারণ করিল। হাত ধরাতে, সে কোনও রকম আপত্তি প্রকাশ করিল না দেখিয়া, শরৎ তাহার হাত খানি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"আহা-হারে কি সুন্দর, কি কোমল হাত, স্পর্শে ধাত ছাড়ে; দাঁত কড়মড় ক'রে চর্ব্বন ক'রতে চায়—আহা-হা যেন গোলাপী গাণ্ডেরী। হে সেঁইয়ানী বল তুমি আমার।

বল, বল লজ্জা কি। হে শিক্ষিতা-মহিলা, আমি শুধু রূপবান-মহল নই আমিও খুব শিক্ষিত-মহল। বল তুমি আমার হবে।"

সেই অবগুণ্ঠনবতী, লজ্জাশীলার মতন আঁকিয়া বাঁকিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। শরতও তাহার সহিত সরিয়া গিয়া বলিল—"হবেনা, আমায় না বলে পালাল হবেনা। আমার কাছে তোমার লজ্জা কি? ছিঃ অমন করতে নেই। লোকে, শুনলে কি বলবে? বল, বল তুমি আমার হবে?"

অবগুণ্ঠনবতী খুব লম্বা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, "সে শরতের হইবে।" এখন আর শরতের আনন্দ ধরে না। সে আনন্দে গদগদ হইয়া বলিল—"তবে দাও কর্ত্তিত-পক্ষ-পরী, তবে দাও প্রাণেশ্বরী একবার আলিঙ্গন আর তোমার চাঁদমুখের গুটী তিন চার চুম্বন। আকাশের ঐ চাঁদ সাক্ষী থাকুক, পুকুরের ঐ জল সাক্ষী থাকুক, বাড়ীর গায়ের ঐ নর্দ্দমার নল সাক্ষী থাকুক, প্রেমিক-প্যাচারদল সাক্ষী থাকুক— আমাদের প্রথম কোর্টসিপ হোক।" এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র সবেগে দুই হস্ত বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইয়া সেই অবগুণ্ঠনবতীকে সজোরে আলিঙ্গন করিল। অবগুণ্ঠনবতীও, শরতের অপেক্ষা অধিক বেগে দুই হস্ত বিস্তার করিয়া মহা জোরের সহিত শরৎকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া চাপিতে লাগিল। শরৎও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোরের সহিত অবগুণ্ঠনবতীকে জড়াইয়া ধরিল। অবগুণ্ঠনবতী এইবার প্রাণপণ জোরে শরৎকে জাপটাইয়া ধরিয়া, দুই দিকে দোলাইতে লাগিল। শরতের মাথার ভিতরটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। তাহার দমবন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে তখন আলিঙ্গন-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনমতে সক্ষম হইল না। অবগুণ্ঠনবতী আরও

অধিক জোরে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। শরৎচন্দ্র দমবন্ধ হইয়া যায় যায় আর কি। সে হাঁপাইতে, হাঁপাইতে বলিল—"এ তোমায় কি রকম দমবন্ধকারী আর পঞ্জর-চূর্ণকারী আলিঙ্গন! ও কাটু-খোট্টা-প্রেয়সী ছাড়, ছাড়; আমি হাঁপিয়ে মলুম। কি মুস্কিল, তুমি যে দেখছি বিয়ের আগেই হাঁপানীর ব্যায়ারাম করিয়ে দিচ্ছ প্রিয়ে। ও হো—হো গেলুম। ছাড় প্রাণেশ্বরী ছাড়—নইলে আমার দোষ নেই, তুমি বিধবা হ'লে ব'লে। ও হো—ছাড়ো, ছা—ড়ো—ও—ও—ও—ও—।"

উভয়ে খুব ধস্তাধস্তি চলিতে লাগিল। শরৎ আলিঙ্গন-মুক্ত হইবার নিমিত্ত যত চেষ্টা করিতে লাগিল, অবগুণ্ঠনবতী তাহাকে তত জোরে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। শরতের দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল সে চক্ষে ধুঁয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপ সময়ে সেই অবগুণ্ঠনবতী তাহাকে খুব জোরে একটি ল্যাং মারিল, ওঁক্ করিয়া একটি আওয়াজ করিয়া সে সটান্ লম্বা হইয়া মাটীতে শুইয়া পড়িল। অবগুণ্ঠনবতী, তাহার উদরের উপর—যেমন করিয়া ঘোড়ায় চাপে সেইরূপ করিয়া—চাপিয়া বসিল এবং পাঁচ সাতবার দমক্ দিয়া নাচিয়া অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইল। শরৎচন্দ্র "উঃ—আঃ—বাবারে" বলিতে বলিতে উঠিয়া পড়িল এবং দুই, তিনবার ঢোঁক গিলিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় ঈষৎ চিৎকার করিয়া বলিল—"কে তুই, সত্যি ক'রে বল কে তুই?"

অবগুণ্ঠনবতী টপ্ করিয়া অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিয়া দুইহাতে গোঁফে চাড়া দিতে, দিতে বলিল—"আমি তোমার গোঁফওলা প্রাণেশ্বরী, তোমার বড় সাধের গোলাপী-গাণ্ডেরী—এস, এস প্রাণেশ্বর, চর্ব্বণ ক'রবে এস।"

শরৎ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল যে, সেই অবগুণ্ঠনবতী লছমী নয়—তাহার দুই চক্ষের বালাই স্বয়ং অযোধ্যা। সে মহা হতাশ হইয়া, অতীব আপশোষের সহিত বলিল—"তোমার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কোনও ব্যাটা গোলাপী-গাণ্ডেরী নয়। তুমি বাবা শুক্‌নো ছাতু, একদম কাট্‌। চর্ব্বণ ক'রলে হবে কি—গলায় আটকাবে।"

অযোধ্যা, লছমীর সাড়ী ও ওড়না পরিয়া, এইরূপ ভাবে অবগুণ্ঠন দিয়া আসিয়াছিল—তাহা বোধ হয় আপনাদের আর বলিয়া দিতে হইবে না। এইবার সাড়ী ও ওড়না খুলিয়া ফেলিয়া নিজের কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া লইয়া সে, শরৎকে শাসাইয়া বলিল—"সাবধান, এই বাঙ্গালী সাবধান। আজ এই সামান্য রকম শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলুম, ভবিষ্যতে আর যদি কখনও এ রকম দুঃসাহসের কাজ কর, বামন হয়ে যদি চাঁদের দিকে হাত বাড়াও তাহলে এর চেয়ে এমন বেশী শাস্তি দোব যে, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন কিছুতেই ভুলতে পারবে না। এই কথা বলিয়া, অযোধ্যা সদর্পে চলিয়া গেল।

শরৎচন্দ্র খানিক্ষণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তৎপরে অযোধ্যা যে দিকে চলিয়া গেল সেই দিকে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল—"তুই আমার কলা ক'রবি। আমিই বরং তোকে এমন জব্দ ক'রব যে তুই সারাজীবনটা কেঁদে কেঁদে বেড়াবি। ওরে অযোধ্যা, তুই আজকের রাতটা মাত্র সুখ-স্বপ্নে বিভোর থাক্; কাল দুপুরের মধ্যেই আমি তোর সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিচ্ছি। আমি স্বয়ং—এতে আর লজ্জা কি? এতো খুব সুখের বিষয়—আমি স্বয়ং, ভৈরবপ্রসাদকে—লছমীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার প্রস্তাব ক'রব। ভৈরবপ্রসাদ নিশ্চয়ই তাতে রাজী হবে—

সে যে রকম নব্য-তন্ত্র-প্রিয় লোক তাতে সে কখনই গররাজী হবে না। তার ওপর লছমী যখন আমার হাতে, লছমী যখন আমার রূপমুগ্ধা তখন আমার জয় নিশ্চিত। আমারই, চিঠিখানা ওরকম ভাবে ফেলে দেওয়া অন্যায় হয়েছে; কোনও লোকের হাত দিয়ে পাঠালেই ঠিক হোত। লছমী হয়ত সে সময় তার ঘরে ছেল না; অযোধ্যা ব্যাটা হয়ত কোনও দরকারে ঐ সময় লছমীর ঘরে গেছল; তার পর চিঠিখানা দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে পোড়ে, লছমীর কাপড় আর ওড়না পোরে ঘোমটা দিয়ে এসে আমায় ঠকিয়ে জব্দ ক'রে গেল। ওরে ও অযোধ্যা এর চেয়ে শতগুণে জব্দ তোমায় ক'রছি দাঁড়াও। তুমি Oudhই হও আর Rohilkhandaই হও, আমার হাতে তোমার কিছুতেই নিস্তার নেই।"

---

## চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

অযোধ্যার নিকট প্রচণ্ড কোঁৎকানি খাইয়া, জামা, কাপড়, চাদর প্রভৃতি ছিঁড়িয়া, সর্ব্বাঙ্গে ও বিশেষ করিয়া মুখে লাল কাঁকরের গুঁড়া মাখিয়া, লাল-বাঁদরের মতন মূর্ত্তী করিয়া শরৎচন্দ্র—তাহার বাসের জন্ম নির্দ্দিষ্ট—সেই দ্বিতল বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শরতের পুরাতন চাকর দীনু এবং তাহার প্রিয় সহচরদ্বয় তাহার আগমন প্রতীক্ষায়, নীচের তলার একটি ঘরে বসিয়াছিল। শরৎচন্দ্রকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দীনু একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল এবং তাহার এরূপ কিম্ভুৎ-কিমাকার অবস্থা দেখিয়া, অতীব বিস্মিত হইয়া বলিল—"এ কি বাবু এরকম মূর্ত্তী করে কোথা থেকে এলেন?"

শরৎচন্দ্র অতীব বিরক্ত হইয়া বলিল—"যেথা থেকেই আসি না, সে খোঁজে তোর কি দরকার। তোকে কি সব কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? ব্যাটা পাজী, ড্যাম সোয়াইন।"

দীনু বলিল—"বাবু কোলে পিটে ক'রে মানুষ করেছি সেইজন্যে আপনার একটু কিছু হলেই আমার মনটা কেঁদে ওঠে। এই রকম ধুলো মেখে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে কোথা থেকে এলেন? কি হয়েছিল?"

শরৎচন্দ্র, জামা কাপড় বদলাইতে, বদলাইতে বলিল—"ওরে আজ বড় কুস্তী লড়বার সাধ হয়েছিল তাই খোট্টাদের আখ্‌ড়ায় কুস্তী ল'ড়তে গেছলুম। সেখানে খুব কুস্তী লড়েছিলুম কিনা, তাই এই সব ধুলো-ফুলো লেগে গেছে।"

মাধব সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"কোথায়—কুস্তীর আখ্‌ড়াটা কোথায়? আমায় সেখানে নিয়ে যাবেন আমিও কুস্তী ল'ড়ব। কে, কে সেখানে লড়ে ?"

শরৎ অম্লানবদনে বলিল—"সেখানে অযোধ্যা লড়ে, ভৈরবপ্রসাদ লড়ে আরও অনেকে লড়ে তোমরা সেখানে যেতে চাওতো আমি নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমি সেখানে আর যাব না। কারণ আজ ওদের সকলকেই আমি মহা কুস্তী লড়ে হারিয়ে দিয়েছি সেইজন্যে ওরা-কেউই আমার সঙ্গে আর লড়বে না ব'লেছে।

মাধব বলিল—"আপনি যদি না যান, তাহলে আমরা যাব না। কিন্তু ওরা কি ভীরু—আপনি হারিয়ে দিয়েছেন ব'লে ওরা আর আপনার সঙ্গে ল'ড়বে না -ছিঃ, ছিঃ। আচ্ছা, আপনি কি সকলকেই হারিয়ে দিলেন ?"

শরৎচন্দ্র, দুই তিনটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল—"নাঃ সকলের সঙ্গে আমি ল'ড়িনি। আমি প্রথমে ভৈরবপ্রসাদের সঙ্গে ল'ড়লুম। ভৈরব-প্রসাদের সঙ্গে কুস্তী আরম্ভ হ'তে প্রথমেই আমি তাকে এমন এক ল্যাং মেরে দিলুম যে, সে অমনই দড়াম ক'রে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে ছটফট্‌ করতে লাগল। তারপর অযোধ্যা এল অযোধ্যা নেমেই 'আমায় আচমকা জাপটে ধরলে। মনে ক'রলে সে ওই রকম আচমকা জাপটে ধরলেই আমায় কাবু ক'রতে পারবে। আমি কিন্তু ওর চেয়ে হুসিয়ার আমিও ওকে ঠেসে জাপটে ধ'রে কোসে যুযুৎস্যুর এক প্যাঁচ মেরে দিলুম; আর অযোধ্যা অমনি বাপ ব'লে একটি চিৎকার ক'রে চিৎ হয়ে মাটিতে প'ড়ল। তারপর কিন্তু যে লোমহর্ষণ ব্যাপার হ'ল সে আর ব'লে কাজ নেই।"

হরিচরণ ও মাধব বলিল—"বলুন, বলুন, সে লোমহর্ষণ ব্যাপারটা কি রকম হ'ল বলুন।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"তারপর, ওদের ভেতর সব চেয়ে বেশী পালোয়ান আর ওদের কুস্তী-লড়ানর-ওস্তাদ যে, সেই লোকটা এল ল'ড়তে। এই ওস্তাদটার সঙ্গে ল'ড়তে আমায় বিশেষ বেগ পেতে হ'য়েছিল। ব্যাটা যেমন সণ্ডা তেমনি প্যাঁচ-জাননেওয়ালা। এই ওস্তাদটা ল'ড়তে ল'ড়তে আমায় কাবু করে আর কি—ঠিক এমনি সময় আমি আর অন্য কোনও উপায় না দেখে, তার গালে ঠেসে মারলুম এক চড়—বল্লে না পিত্যয় হবে—আমার সেই বিরাশিক্কা ওজনের চড়টি খেয়ে, সে "হায়-হায়" ক'রতে ক'রতে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। উপুড় হয়ে পড়লে তো আর আমার জিৎ হবে না—সে যতক্ষণ না চিৎ হবে ততক্ষণ আমার জিৎ হবে না। এইজন্যে আমি আবার একটি প্রচণ্ড থাপ্পড় ব্যাটার গালে মারলুম। আমার এই দ্বিতীয় চড়্টি খেয়ে, ব্যাটা শূন্যের ওপর উঠে চার পাঁচবার ওলট পালট খেতে খেতে একেবারে ধপাস করে মাটিতে চিৎ হ'য়ে পড়ল আর কাটা ছাগলের মতন ছট্‌ফট্ ক'রতে লাগল। এই ব্যাপার না দেখে সেখানে যত লোক ছিল সকলেই 'চড়্-চড়্ ক'রে ক্ল্যাপ দিতে লাগল আর শত মুখে আমার প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু সকলে মিলে এক জোট্ হয়ে বললে যে—"আর আমার সঙ্গে কোনও দিন লড়বে না—এটা ওদের বড় unsportsman like কাজ হল।

হরিচরণ ও মাধব সমস্বরে ও মুক্তকণ্ঠে শরতের বাহাদুরীর প্রশংসা করিতে লাগিল। দীনু কিন্তু কোনও রকম প্রশংসা না করিয়া বলিল—"তা বাবু আপনি, যখন কুস্তী লড়েছেলেন তখন খালি গায়ে তো লড়েছিলেন।"

শরৎচন্দ্র—বিশেষজ্ঞের মতন ভাব দেখাইয়া বলিল—"নিশ্চয়ই। খালি গায়ে নয়ত কি জামা গায়ে দিয়ে কুস্তী লড়া যায়রে ব্যাটা মুর্খ।"

দীনু বলিল—"তবে আপনার জামা কাপড়ের ওপর ধুলো কাদা লাগল কি ক'রে ?"

শরৎ দেখিল যে, দীনুর জেরার চোটে তাহার সমস্ত মিথ্যাকথা ধরা পড়িয়া যায়। তাই সে মহা বিরক্ত হইয়া বলিল—"তোর গুষ্টির শ্রাদ্ধ ক'রে আমার জামা কাপড়ে ধুলো লেগেছেরে ব্যাটা পাজী।"

দীনু বলিল—"তাই বলুন যে, কুস্তী ক'রে আপনার এ দশা হয়নি ; আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করে হয়েছে।"

শরৎ প্রকাশ্যে আর কিছু না বলিয়া আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া দীনুকে গালি দিতে, দিতে আপনার শয়নকক্ষে যাইয়া শুইয়া পড়িল। মনের দুঃখে সে, রাত্রে আর কিছু খাইল না।

মোক্ষদাসুন্দরী শরতের আগমন ও ভোজন প্রতীক্ষায় এত রাত্রি অবধি অতি কষ্টে বসিয়াছিলেন। পুত্র কিছু খাইবে না শুনিয়া—খাইবার নিমিত্ত পুত্রকে অনেক অনুরোধ করিয়াও সফলকাম না হইয়া নিজেও উপবাসী রহিলেন। সেদিন্ দশমী তিথি, পরদিন একাদশীর নির্জলা উপবাস। সেইজন্য তাঁহাকে অন্ততঃপক্ষে সামান্য কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া শরতের মাসীমাতাদ্বয় অনেক পিড়াপিড়ী করিলেন। কিন্তু পুত্র যখন উপবাসী থাকিবে তখন তাঁহার পেটটাই কি বড় হইল —এই কথা বলিয়া মোক্ষদাসুন্দরী ভগ্নীদ্বয়কে নিরস্ত করিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার ভগ্নীদ্বয়ও কিছু খাইলনা। তিনটি বিধবা রমণী—

দেবদর্শনাভিলাষে সারাদিন ধরিয়া নানা দেবতার মন্দির পরিভ্রমণ করিয়া শ্রম কাতর ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত ব্যাকুলা ছিলেন—কিন্তু এমনই তাঁহাদের শিক্ষিত পুত্রের মহিমা যে, সেই অবস্থায় তাঁহারা উপবাসী রহিলেন। তাহার উপর পরদিন একাদশীর জন্য তাঁহাদিগকে নির্জ্জলা উপবাস করিতে হইবে। শিক্ষিত ও সভ্য পুত্র এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই শরৎচন্দ্র নীচে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে—একগণ্ডা মুগীর ডিমের পোঁচ, ছয় খানি টোষ্ট্ করা রুটী চারখানি কাশীর বিখ্যাত চম্‌চম্ ও আড়াই কাপ চা খাইয়া তবে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপন করিল। মোক্ষদাসুন্দরী ভগ্নীদ্বয়ের সহিত বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণার দর্শনে বাহির হইয়া গেলেন।

শরৎচন্দ্র সংবাদপত্র পাঠ করিতে, করিতে সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে আর কাগজ পড়ায় মন বসাইতে পারিল না। "কতক্ষণে দুপুর হইবে এবং সে, দুপুরবেলায় ভৈরবপ্রসাদের নিকটে যাইয়া কি কি কথা বলিয়া লছমীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে ও ভৈরব প্রসাদ সম্মতি দিলে, সে কি ভাবে লছমীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া অযোধ্যার সামনে দিয়া -বাগানে বেড়াইবে এবং তাহার এ প্রস্তাবে ভৈরবপ্রসাদ তো সম্মত হইবেই কিন্তু যদি তিনি প্রথমটায় একটু কিন্তু-মিন্তু করেন তাহা হইলে লছমী নিশ্চয়ই স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিবে এবং "সে" শরৎকে বড় ভালবাসে ও শরৎ ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না—এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার কণ্ঠলগ্না হইবে"ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ চিন্তা শরৎচন্দ্রের

মনে উদিত হইতে লাগিল। সে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে বেলা নয়টা অবধি কাটাইয়া, তাহার সুসজ্জিত বাথরুমে স্নান করিতে গেল। সাত আট ছোপ্‌ সাবান্‌ মাখিয়া দেড়ঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া সে অতি ব্যস্ত ভাবে আহার করিতে গেল। কোনও রকমে কিছু নাকে মুখে গুঁজিয়া আহার সমাপন করিয়া শরতচন্দ্র পুনরায় স্নানের ঘরে গিয়া তাহার মুখে ও হাত দুইটির কনুই অবধি দুই ছোপ সাবান মাখিল। তৎপরে সুসজ্জিত ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করিয়া প্রায় দেড়ঘণ্টা—পাউডার মাখা হেজলিন-স্নো মাখা কসমেটিক মাখাইয়া পাতা কাটিয়া টেরী কাটা প্রভৃতি অঙ্গরাগ ব্যাপারে কাটাইয়া সে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জরিদার পাঞ্জাবী, চাদর, কাপড় প্রভৃতি আলমারী হইতে বাহির করিয়া পরিল। তৎপরে দুই শিশি এসেন্স বাহির করিয়া তাহার দেড় শিশি আন্দাজ এসেন্স রুমাল, জামা ও চাদরে মাখিল এবং আধ শিশি এসেন্স কাপড়ে মাখিল। এই ভাবে সমস্ত নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া তাহার বড় প্রিয় "সিল্কটিপ্‌টড্‌ আবদাল্লা সিগারেটের" টিনের ভিতর হইতে কুড়িটি সিগারেট বাহির করিয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত সুদৃশ্য সিগারেট-কেসে ভরিল এবং একটি সিগারেট—মরক্কো চর্ম্মনির্ম্মিত-আধারস্থ দিয়াশলাই দ্বারা ধরাইয়া লইয়া গুণ গুণ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে ভৈরবপ্রসাদের অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল।

মধ্যাহ্নে ভৈরবপ্রসাদ ড্রয়িংরুমে তাকিয়া ঠ্যাসান দিয়া অর্দ্ধ-শায়িতভাবে বসিয়া তাঁহার বিশাল উদরে হাত বুলাইতেছেন এবং একটি নূতন গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অযোধ্যা সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া শুনাইতেছে। লছমী নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বন করিতে, করিতে উল বুনিতেছে।

এমন সময় মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে, শরৎচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইল এবং আজ আর প্রতিদিনের মতন পাশ্চাত্য কায়দায় অভিবাদন না করিয়া ভৈরবপ্রসাদের নিকটে যাইয়া তাঁহার পদধূলী গ্রহণ করিয়া মুখে ও মাথায় ঠেকাইল এবং তৎপরে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। তারপর লছমীর পার্শ্বে একখানি চেয়ার টানিয়া আনিয়া, তাহার গা ঘেসিয়া বসিয়া পড়িল।

শরৎচন্দ্র ঐরূপ ভাবে পার্শ্বে বসাতে লছমী ও অযোধ্যার চোখে-চোখে কি বেতার-টেলিগ্রাম হইয়া গেল। লছমী সেই চেয়ার হইতে উঠিয়া অন্যস্থানে বসিতে যাইবার উপক্রম করাতে শরৎ, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—"পালাচ্চ কেন, পালাচ্চ কেন? আমায় দেখে আবার লজ্জা কি? দুদিন বাদে যে আমায় না দেখে একদণ্ডও থাকতে পারবে না তখন লজ্জা কোথায় থাকবে।

সহাস্য মুখে ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"আরে বেটি শরতের কাছে তোর আবার হঠাৎ লজ্জা কেনরে? ওতো আমার, ছেলের মতন, তোর ভাই যে শরৎ"

শরৎচন্দ্র লম্বা জিভ বাহির করিয়া বলিল—"ছিঃ, ছিঃ ওকথা ব'লবেন না, ওকথা ব'লবেন না—আমাকে লছমীর ভাই ব'লবেন না, বরঞ্চ ওর ভাসুরের ভাই বলুন।"

অযোধ্যা বিরক্তভাবে বলিল—"এডিটোরিয়াল কলমটা প'ড়েনি—আমার একবার সহরের দিকে যেতে হবে, একটু তাড়া রয়েছে।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—পড়' পড়'।"

শরৎ বলিল—"কাগজ-পড়া পরে শুনবেন। আগে আমার একটা বড় দরকারী কথা আছে শুনুন।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"বল, বল—কি কথা বল।"

দুই, তিনটি ঢোক গিলিয়া শরৎ বলিল—"এই কথাটা হচ্ছে কেয়া, এই, এই হ্যাঁ—হামি আপকো পাস্ একঠো শুভ ও আনন্দজনক প্রস্তাব ক'রতে আয়া হায়।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"কি প্রস্তাব করতে চাও কর।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"অতি শুভ, অতি মঙ্গলময়, অতি আনন্দজনক প্রস্তাব। আপকো তো লেকড়া-টেড়কা হ'ল না—এ প্রস্তাবে তবু যাহোক আপনার বংশরক্ষার একটা ব্যবস্থা হবে। আমি, আপকো লেড়কীকে সাদী ক'রতে চাই। আপ হামকো সাথ লছমীকো বিয়ে দিজিয়ে।"

ভৈরবপ্রসাদ বিস্ময়ের আবেগে প্রথমটায় কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি শরতের মুখের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আরে শোরোৎবাবু তুম্ কেয়া পাগলা হুয়া? এয়সা বাৎ কভি হোনে সেকতা? বাঙ্গালীকা সাথ হামারা লেড়কীকা সাদী হোগা!"

শরৎচন্দ্র বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, ভৈরবপ্রসাদের মুখের কাছে, দুই হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"আরে হাম বাঙ্গালী আউর আপ্ খোট্টা হোনেসে ক্ষতি কিগো জী? আপকা লেড়কী—হামারা অপরূপ রূপে মোহিত হোয়ে হামারা প্রেমে পড় গিয়া। প্রেমকা পাশ কুছ আটকাতা কি? আর, তদুপরি আরো দেখো জী ভৈরবপ্রসাদ—হামলোককো এই সাদীসে যো বর্ণশঙ্কর সন্তান উৎপাদিত হোগা, তার মতন বলিষ্ঠ, সুস্থ, সবল সন্তান আর কভি কোথাও হুয়া নেই। সে সন্তান পৃথিবী জয়

করতে পারেগা। আপ তখন পৃথিবীপতিকা-মাতামহ বোল্‌কে জগৎময় প্রসিদ্ধি লাভ ক'রতে সক্ষম হোয়েগা।"

ভৈরবপ্রসাদ আর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া সক্রোধে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"খবরদার, এয়সা বাৎ অউর মৎ বোল্‌না। নেহিতো আভি খারাবী হো যাগা।"

শরৎচন্দ্রও একটু চীৎকার করিয়া বলিল—"তাহলে লছমীর সঙ্গে হামারা বিয়ে নেহি দেগাতো? আচ্ছা বেশ। কিন্তু লছমী আমার প্রেমে প'ড়ে গিয়া, হামাকে ছেড়ে অন্য লোককা সাথ লছমীর বিয়ে দেনেসে, জগৎশুদ্ধ লোকে যখন লছমীকে দ্বিচারিণী-ফিচারিণী বোলকে নিন্দে করেগা—তখন কিন্তু আমার কোনও দোষ নেই।

ভৈরবপ্রসাদ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"নিকালো, নিকালো, হামারা কোঠিসে আভি নিকালো।"

শরৎচন্দ্র লছমীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"লছমী প্রাণেশ্বরী তোমার বাপ ব্যাটাচ্ছেলের আক্কেল দেখ। তোমার স্বার্থপর বাপ, তোমার সুখের দিকে চেয়ে দেখলে না আর তোমার যে প্রাণেশ্বর, তাকে ঐ সব কটু কথা ব'ললে। তুমি অমন পাপী, তাপী, বদ-আলাপী, কথায়-খেলাপী, বাপের কাছে আর এক মিনিটও থেক না। আমি তোমায় নিয়ে উধাও হ'য়ে যাই চল। এস, আমার হাত ধর।" এই কথা বলিয়া লছমীর দিকে সে অগ্রসর হইতেই ভৈরবপ্রসাদ সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিলেন। শরৎ ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে সরাইয়া অগ্রগমনে উদ্যত হইলে তিনি শরতের দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন। তখন উভয়ে একটা ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল এবং একটা অর্দ্ধ-মারামারি-গোছের ব্যাপার হইতে লাগিল।

অযোধ্যা এতক্ষণ নীরব ছিল, সে এই সময় সবেগে আসিয়া শরতের গলা টিপিয়া ধরিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ভৈরবপ্রসাদ বাধা দিয়া বলিলেন—"মেরনা, মেরনা, যা হবার যথেষ্ট হয়েছে—আর ছোটলোকমীতে অগ্রসর হবার দরকার নেই। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী যতদূর হ'ল তাই যথেষ্ট। এরকম ব্যাপার ডাল্‌কামুণ্ডীতে হওয়া স্বাভাবিক ও শোভনীয়। শরৎ তুমি ভদ্রলোকের ছেলে—আমরাও তাই; আমাদের ভেতর এ রকম ব্যাপার একেবারে বাঞ্ছনীয় ও শোভনীয় নয়। নাও ঠাণ্ডা হয়ে ব'সে কথা কও।"

শরৎ বলিল—"লছমীকে আমায় দিন। ওকে না পেলে আমি কিছুতেই বাঁচব' না। ওকে দেখে যত না মুগ্ধ হ'য়েছি—ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে, ওর চাল-চলনে আমি তার চেয়ে লক্ষ গুণে মুগ্ধ হ'য়েছি, ওর পায়ে প্রাণ স'পেছি।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"এ কিছুতেই হোতে পারে না। তুমি এ রকম দুরাশাকে মনে স্থান দিলে কেন?"

শরৎ বলিল—"আমার পক্ষে এটা কিছুতেই দুরাশা নয়। আমি ভদ্রসন্তান, শিক্ষিত, ধনী। এক ব'লতে পারেন যে, আমি অন্য জাত। তা আপনার মতন কুসংস্কারবর্জ্জিত, সভ্যতালোক-প্রাপ্ত, নব শিক্ষায় শিক্ষিত, নব্যচালে জীবনযাপনকারী লোকের মুখে এ কথা শোভা পায় না।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"ওসব আমি কিছু জানি না। তোমার সঙ্গে লছমীর বিয়ে দোব না। যার-তার সঙ্গে লছমীর বিয়ে দিতে হবে—কেন?"

শরৎ বলিল—"আপনি যদি যার-তার সঙ্গে লছমীর বিয়ে না দেবেন তাহলে যার-তার সঙ্গে তাকে অবাধে মিশতে দিয়েছিলেন কেন? যার তার প্রাণ কি প্রাণ নয়? সে প্রাণে কি প্রেম, ভালবাসা, সৌন্দর্য্য প্রীতি নেই? সে প্রাণটা কি অসাড়, নিস্পন্দ, সুখ-দুঃখ-জ্ঞান-রহিত জড়? নারী আর পুরুষ—বিধাতার বিধানে উভয়ের যা সম্বন্ধ, তাতে এ রকম বয়সে উভয়কে এক সঙ্গে মিশতে দিলে যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। দুজনেই দুজনকে ভালবেসেছি।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"ভুল, ভুল, তোমার মহাভুল হয়েছে। কে তোমাকে বল্লে যে, লছমী তোমায় ভালবেসেছে?"

শরৎ বলিল—"নিশ্চয়ই ভালবেসেছে। লছমীর প্রতি ভাবে, ভঙ্গীতে, কথাবার্ত্তায়, মৃদুহাসিতে—আমায় যে, সে ভালবেসেছে—একথা প্রকাশ পেয়েছে। কি লছমী বল না।"

লছমী দৃঢ়স্বরে বলিল—"আমি কোনও দিন এমন কিছু ভাব দেখাইনি বা এমন কোনও কথা বলিনি যাতে আমি—শরৎবাবুকে ভালবাসি—একথা প্রকাশ পায়। আমি ভদ্রতা ও সভ্যতার চাল রক্ষার জন্যে যতটুকু করা উচিত ততটুকু ক'রেছি।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"কেন মিছে কথা ব'লছ? ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে সত্য কথা বল, তুমি আমার রূপে মোহিত হওনি।"

লছমী বলিল—"এ প্রশ্ন ভদ্রতার-সীমা অতিক্রম ক'রলেও, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উচিৎ ব'লে ব'লছি যে, আপনার রূপ দেখে মোহিত হওয়া দূরে থাক—আমার প্রাণে ঘৃণা হয়েছে। আমি শুধু শুধু আপনাকে ভাল-

বাসতে যাব কেন? আপনাকে শিক্ষিত জেনে, ভদ্রলোক জেনে আলাপ ক'রেছিলুম। আলাপ ক'রে বুঝলুম যে একটা বানরে আর আপনাতে বিশেষ প্রভেদ নেই।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"ভুল, ভুল, ভুল বুঝেছিলে শরৎচন্দ্র। লছমী শিক্ষার খাতিরে, নব-সভ্যতার চালের খাতিরে তোমার সঙ্গে অসঙ্কোচে আলাপ ক'রেছিল। তুমি সেটাকে ভালবাসা মনে ক'রে নিয়ে বড়ই নির্ব্বোধের মতন কাজ ক'রেছ।"

শরৎ বলিল—"বাঃ বাঃ বড় সুন্দর কথা। ব্যাঙের ওপর ঢ্যালা মেরে মানুষ খেলা করে আর তার সেই খেলায় কিন্তু ব্যাঙের প্রাণ যায়। আপনার মেয়ে নব-সভ্যতার-চালের খাতির রাখে আর তাতে কিন্তু অন্য লোকের প্রাণ যায়। লছমীর না হয় ঐ একজন প্রেমপাত্র র'য়েছে আর তার সঙ্গে লছমী না হয় অনেক মজা লুটেছে—তাই আপনারা সবাই খুব বড়াই ক'রছেন। কিন্তু আপনার মেয়ের সঙ্গে যারা অবাধে মেশে তারা সবাই কিছু বৃদ্ধ নয় বা তাদের সকলেরই কিছু প্রেমপাত্রী জুটেনি বা তারা সবাই কিছু প্রেমের মজা লোটেনি; এই যে আমি—আমি বৃদ্ধ নই, বিবাহিত নই, জড় নই; আমার এখন নতুন জীবন, প্রথম যৌবন—এ রকম ক্ষেত্রে, জীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় সময়ে, একজন নব যুবতী—ঠিক আমার মনের মতন, আমার কল্পনার-জীবন্তমূর্ত্তির মতন একজন নব-যুবতী যদি আমার জীবনের পথে এসে দাঁড়ায়, আর পারি-পার্শ্বিক চাল-চলন দেখে মনে হয় যে, তাকে লাভ করা যাবে, সে রকম ক্ষেত্রে তাকে পাবার আশা করা কিছু অন্যায় নয়।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"তাইত, তাইত—"

শরৎ বলিল—"আমি লছমীকে চাই-ই চাই। এর জন্তে যা হয় হবে। লছমী, লছমী তোমার ঐ সোনার অঙ্গের আলিঙ্গন একবার দাও, তোমার ঐ মধুর মুখের একটি চুম্বন দাও—তোমার বাপের এই অসঙ্গত-জাত্যাভিমান ঘুচে যাক, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিক।" এই বলিয়া সে সবেগে লছমীর দিকে ধাবিত হইল। ভৈরবপ্রসাদ বাধা দিতে গেলেন কিন্তু শরৎ সজোরে এক ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া লছমীর পানে ছুটিল। কিন্তু অযোধ্যা তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল। ধস্তাধস্তি করিতে, করিতে শরৎ বলিল—"আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি ঐ নারী-রত্নকে চাই। আমি ওকে অন্ততঃ একবার আলিঙ্গন করব, ওর মধুর মুখে অন্ততঃ একটি চুম্বন দোব। এর জন্তে আমার যা হয় হবে।" দুজনে খুব ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। শরৎ মরিয়া হইয়া অযোধ্যাকে, প্রাণপণ বলে একটি ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া লছমীকে ধরিতে ছুটিল। লছমী ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। শরৎ দুই হস্ত বিস্তার করিয়া যেই লছমীকে আলিঙ্গন করিতে যাইবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অযোধ্যা আসিয়া, বজ্রমুষ্টিতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল এবং উভয়ে মিলিয়া আবার ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অযোধ্যা তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে লাগিল।

ভৈরবপ্রসাদ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, আর এখনই ও রকম ভয়ানক লোককে আমার বাড়ী থেকে বের ক'রে দাও। ওদের যেখানে ইচ্ছে হয় থাকুগগে।"

সজোরে শরৎকে টানিতে, টানিতে বাহিরে লইয়া গিয়া অযোধ্যা তাহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল এবং দরোয়ানকে গাড়ী আনিতে আদেশ

করিল। কিছুক্ষণ পরে আটখানি গরুর গাড়ী ও দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিলে—সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাতে শরতের সমস্ত মালপত্র বোঝাই করিয়া দিল। এতগুলি গরুর গাড়ী অ

এই যে, বিদেশে গিয়া পাছে বাবুয়ানীর কিছু কমী হয় এইজন্য শরৎচন্দ্র কলিকাতা হইতে আসিবার সময়—অনেক কাপড়-চোপড়, পোষাক প্রভৃতি ও গাদা, গাদা এসেন্স, লোসান, ব্রিলেণ্টাইন, পাউডার, ক্রিম, স্নো, বিউটিস্-চারম্, নানারূপ কাটগ্লাস-নির্ম্মিত-আধার ড্রেসিং টেবিল, বড় আয়না, আয়নাযুক্ত আলমারী, হ্যাট ষ্ট্যাণ্ড, আমব্রেলা ষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতি বহু-বহুবিধ আড়ম্বরময় বিলাসদ্রব্য সঙ্গে আনিয়াছিল। ভৈরব প্রসাদের নিকট হইতে শরৎচন্দ্র, থাকিবার জন্য যে স্বতন্ত্র বাড়ীটি পাইয়াছিল সেই বাড়ীটির তিনটি ঘর সে, নিজের মনের মতন করিয়া ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা—পৃথক ভাবে ড্রেসিং রুম, বাথ্-রুম, বেড্-রুম প্রভৃতি সাজাইয়া ছিল। এই সমস্ত দ্রব্য গুছাইয়া ইহারা যখন ভৈরবপ্রসাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল তখন অপরাহ্নকাল উত্তীর্ণপ্রায়। এই সমস্ত ব্যাপারে মোক্ষদাসুন্দরী মরমে মরিয়া গেলেন। "এই দণ্ডে কাশী ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য" মোক্ষদাসুন্দরী অনেক করিয়া পুত্রকে অনুরোধ করিলেন। পুত্র বলিল যে—"না, আর দিন কতক থেকে এ ব্যাটাদের জব্দ ক'রে দিয়ে তবে কাশী ছাড়ব।"

"কিছু দূরে একটি ভাল বাগান-বাড়ী, ভাড়ার জন্য খালি আছে" এই সংবাদ গাড়োয়ানদের মুখে শুনিয়া, শরৎচন্দ্র সদলবলে সেখানে যাইয়া, সেই বাগান-বাড়ীটি ভাড়া লইল এবং সমস্ত মালপত্র তথায় উঠাইয়া নবোৎসাহে ঘর সাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

শরৎচন্দ্রদের বিদায় করিয়া দিবার পর, ভৈরবপ্রসাদের নিকটে আসিয়া অযোধ্যা বলিল—"তাদের সব তাড়িয়ে দিয়ে এলুম।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"যাক বাঁচলুম। আমি এতক্ষণ অতি ভয়ে, ভয়ে সময় কাটাচ্ছিলুম আর যে বিশ্বনাথকে বহুদিন ভুলে গেছলুম সেই বাবা বিশ্বনাথকে প্রাণপণে ডেকে বলছিলুম যে, এই কেলেঙ্কারীর ব্যাপারটা যেন বাজারে না বেরোয়। ওঃ ব্যাপারটা মনে হ'লে এখনও আমার বুকের ভেতর সেই রকম 'এইসি-তেইসি' ক'রে ওঠে আর প্রাণটায় "আরে মায়ীরে" ব'লে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। যা হবার হ'য়ে গেছে; আর নয়, আর নয়। আমি এই সামনের লগ্নেই তোমাদের দুজনের বিয়ে দোব কিন্তু আজই তোমাদের দুজনের মিলন করিয়ে দোব আর এই সভ্যতার চালে দুশো সেলাম ঠুকে, আগে যেমন ছিলুম ঠিক তেমনি হব'। তোমরা প্রস্তুত হ'য়ে এগিয়ে এস; আমি এখনই তোমাদের দুজনকে হাতে, হাতে সঁপে দোব। তবে আর খিচুড়ী চালে নয়। অগ্নি, নারায়ণ আর ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে দুজনের মিলন করিয়ে দোব। পাছে অসভ্য ব'লে বদনাম বেরিয়ে যায় সেইজন্যে আমার বাড়ীতে ওসব পাঠ রাখিনি। অথচ আজ বিশেষ দরকার ব'লে আমি এতক্ষণ অনেক চেষ্টা আর খোশামোদ ক'রে, এই দেখ, ও-পাড়া থেকে শালগ্রামশীলা, গঙ্গাজল, ফুলের মালা আনিয়ে ঐ টেবিলের ওপর রাখিয়েছি আর ঐ যে চৈতন-চুট্‌কীওলা লোকটি ব'সে রয়েছেন, উনি একজন বামুন-পণ্ডিত।" এই কথা বলিয়া নিকটে উপবিষ্টা লছমীর হাত ধরিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"কই আগুন কই? সব জিনিষ এল আর আগুন কই?" "কই আপনিত'

আগুন আনতে বলেননি"—এই কথা ঐ বামুন-পণ্ডিতটি বলাতে, ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"না, না তা হবেনা; অগ্নি চাই। আমি আর কাঁচা কাজ করব না। খিচুড়ী চালে আর চলবনা বলেই না আমি আজই অগ্নি-নারায়ণ-ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে লছমীকে যথাশাস্ত্র সঁপে দিতে চাই।" এইরূপ অসময়ে এবং এত তাড়াতাড়ি এখন কোথা হইতে খানিকটা আগুন পাওয়া যায়? এই লইয়া দুই একটা তর্কাতর্কি হইবার পর, ভৈরব প্রসাদ একখানি চেয়ার লইয়া, কাঠের টেবিলের উপর তুলিয়া খুব জোরে চেয়ারের পায়া ধরিয়া তাহা টেবিলের উপর ঘসিতে, ঘসিতে বলিলেন—"একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আগুণ জেলে দিচ্ছি। এই চেয়ারটা আর একটু ক্ষণ টেবিলের ওপর ঘস্‌লেই এখনই আগুণ জ্বলে উঠে এই চেয়ার টেবিল দুইই ধোরে যাবে আর তাতে যে আগুণ হবে সে আগুণ অনেকক্ষণ থাকবে—ততক্ষণে আমার সম্প্রদান করা হয়ে যাবে ন্যাকড়া কি কাগজ জ্বাললে যেমন টপ্‌ করে আগুণ নিভে যাবে, এতে আর তেমন হবেনা।" এই বলিয়া তিনি আরও জোরে, জোরে চেয়ারটি টেবিলের উপর ঘসিতে লাগিলেন। বামুন-পণ্ডিতটি অবাক হইয়া কিছুক্ষণ যাবৎ এই অদ্ভুত ব্যাপার নীরিক্ষণ করিয়া তৎপরে বলিল—"আরে বাবুসাহেব এ কি ছেলে মানুষী ক'রছেন। অন্য উপায়ে বরং আগুণ জ্বালবার ব্যবস্থা করুন। এ রকম ক'রলে কি আগুণ জ্বলবে?"

ভৈরব প্রসাদ বলিলেন—"ওর বাপ যে, সে জ্বলবে; ওতো ছেলে-মানুষ। তুমি বাপু কেবল টিকি নাড়তে আর আলোচাল কলার পুঁটলী বাঁধতে জান। তুমি এসব সায়েন্সের ব্যাপার কি বুঝবে। আমি সভ্য-

মানুষ, আমি ওসব মিস্ত্রী জানি। দেখনা এখনই এই দুটো ঘ'সে আগুন জ্বালিয়ে ফেলব। ও দুটোতো কাঠ—তুমি আমায় এক বালতী জল এনে দাও, আমি দুহাতে ক'রে সেই জলটা খানিকক্ষণ ঘ'সব আর অমনি আগুন জ্বলে উঠে সেই জলটা ধু, ধু ক'রে জলতে থাকবে, খানিক বাদে দেখবে যে বালতীটা শুদ্ধ জলছে।" এই কথা বলিয়া ভৈরবপ্রসাদ, নবীন উদ্যমে চেয়ার-টেবিলে আরও খানিকক্ষণ ঘসাঘসি করিয়া অবশেষে হাঁপাইতে, হাঁপাইতে বলিলেন—"নাঃ, এটা জলবেনা দেখছি। হেসনা, হেসনা, কারণটা শোন। এই চেয়ারটায় যত লোক বসে আর এই গরমে ঘামতে থাকে—তাদের সেই ঘামের চোটে চেয়ারটার সমস্ত কাঠ ভিজে আছে, তাই জ্ব'লল না।"

বামুন-পণ্ডিতটি বলিল—"সেকি বাবুসাহেব, আপনি এই বল্লেন যে, ঘ'সে ঘ'সে জলে শুদ্ধ আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারেন।"

ভৈরব প্রসাদ বলিলেন—"তাতো বলেইছি। কিন্তু ভিজে-কাঠে আর জলে কত তফাৎ তা কি জানহে অসভ্য? আগে সভ্য হও তবে এ সব বুঝতে পারবে। ভিজে-কাঠ কিছুতেই জ্বলেনা কিন্তু জল টপ ক'রে জ্বলে যার কারণ জলের ভেতর স্বভাবতঃই আগুন আছে। প্রমাণ স্বরূপ এক টুক্‌রো বরফ এনে দেখ—দেখবে যে তাতে ধোঁয়া বেরুচ্চে। ধোঁয়া দেখলেই বুঝবে যে তাতে আগুন আছে কারণ ধুমই অগ্নির আবির্ভাব ঘোষণা করে।" এইরূপ বহুবিধ তর্কের পর অবশেষে এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পরামর্শে জনৈক মুহুরী একটি চর্ব্বীর বাতী জ্বালিয়া আনিল। তখন ভৈরবপ্রসাদ গঙ্গা জলের ঘটি হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া নিজের ও অনান্য সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন—

"লছমী, অযোধ্যা তোমরা এই অগ্নি, নারায়ণ, আর ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে দুজনে দুজনের গলায় মালা দাও।"

লছমী ও অযোধ্যা দুইগাছি মালা লইয়া পরস্পরের গলায় পরাইয়া দিল। তখন ভৈরব প্রসাদ দুই হস্তে লছমী ও অযোধ্যার হাত ধরিয়া বলিলেন—"দ্যাখ,আমার আদেশে এতদিন ধোরে তোমরা দুজনে দুজনকে যে ভাই-ভগ্নীর মতন দেখতে, আমার এখনকার এই Further-আদেশে তোমরা এখন থেকে সেই ভাই ভগ্নীর সম্বন্ধচ্যুত হ'লে, আজথেকে তোমরা পরস্পরে স্বামী-স্ত্রীর মতন ব্যবহার ক'রবে। শোন লছমী, শোন অযোধ্যা শোন মুহুরী, ওহে ও ব্রাহ্মণ তুমিও শোন—বিদেশী-চালের কুহকে প'ড়ে কন্যার শরীর নষ্টের ভয়ে উপযুক্ত সময়ে তার বিয়ে না দিয়ে তাকে অধিক বয়স অবধি আইবুড়ো রেখে আর যার-তার সঙ্গে তাকে মিশতে দিয়ে আমি ভুল-ভুল-মহাভুল ক'রেছিলুম; আমার জাত, কুল, মান, বংশের-পবিত্রতা সব নষ্ট ক'রতে ব'সেছিলুম। সামনে যে লগ্ন পাব সেই লগ্নেই যথাশাস্ত্র এদের বিয়ে দোব। এখন এস অযোধ্যা—এই নারায়ণ, অগ্নি আর ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে তোমার হাতে লছমীকে সঁপে দিলুম। দেখো অযোধ্যা তোমার যত্নকে যেন অযত্ন কোর না।

অযোধ্যা ও লছমী ভুমীষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল; তিনি দুই হস্ত তাহাদের মাথায় ঠেকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঠিক এই সময়ে—উলু—উলু—লু—লু—বলিয়া দুই চারিবার হুলুধ্বনি করিয়া সেই বামুন—পণ্ডিতটি বলিল—"সবতো এক রকম হ'ল,কিন্তু একটি জিনিসের অভাব রয়ে গেল। অগ্নির অভাব হচ্ছিল—তাতো চর্ব্বী বাতী জেলে সে অভাব

পূর্ণ করে নেোয়া গেল, আমি নিজে হুলুধ্বনিও করে দিলুম কিন্তু শঙ্খধ্বনি তো করা হ'ল না।

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"তাইত বড়ই ভুল হয়ে গেছেতো। একটা শাঁকের ব্যবস্থাতো করা হয়নি অথচ শাঁক না হ'লে যে একটা মহা খুঁৎ থেকে যাবে।"

বামুন-পণ্ডিতটি বলিল—"হ্যাঁ শঙ্খধ্বনি না হ'লে বড়ই খুঁৎ থেকে যাবে। আপনি যখন পাকা কাজ চান তখন এই সম্প্রদান-কার্য্যে শঙ্খধ্বনি করা চাই-ই চাই। বাড়ীর ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি একটা শাঁক আনতে ব'লে দিননা—আমি এখনই বাজিয়ে দিচ্ছি।"

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—"আমার বাড়ীতে ওসব পাঠ অনেক দিন উঠে গেছে। আমি যখন প্রথম সভ্য হই তখন, ও শাঁক-ফাঁক সব পূজোর জিনিস, একটা মন্দিরের পূজারীর কাছে ঝেড়ে দিয়েছিলুম। আমার বাড়ীতে ওসব কিছুই নেই। কিন্তু এদিকে যখন আবার শঙ্খধ্বনি না হ'লে মহা খুঁৎ থেকে যাবে তখন আমি এর একটা উপায় করে দিচ্ছি এই কথা বলিয়া ভৈরবপ্রসাদ, তাঁহার বিশাল গাল দুটি ফুলাইয়া পুঁ—পুঁ—পুঁ—উ—উ—উ করিয়া শঙ্খের অনুরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন। বামুন-পণ্ডিতটি কিছুক্ষণ পরে বলিল—"হয়েছে, আর শাঁক বাজাতে হবেনা—থামুন থামুন।" আর থামুন—কাহারও কোনও কথায় কান না দিয়া, ভৈরবপ্রসাদ মুখের কাছে দুই হাত তুলিয়া, বড় বড় গাল ফুলাইয়া পুঁ—পুঁ—পুঁ—উ—উ শব্দ করিয়া আপনার খেয়ালে শাঁক বাজাইতে লাগিলেন।

———

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভৈরব প্রসাদের বাটি হইতে বিতাড়িত হইবার পাঁচ দিন পরে এক দিন অপরাহ্নকালে, শরৎচন্দ্র অতি ব্যস্তভাবে ড্রেসিং-রুমে ঢুকিল। এত অপমান হইয়াও শরতের মানসিক বা বাহ্যিক কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই নূতন বাটিতে আসিয়া সেইরূপ ভাবে ড্রয়িং-রুম, বাথ্-রুম ড্রেসিং-রুম প্রভৃতি সাজান হইয়াছে; ড্রেসিং-রুমে সেইরূপ চারিদিকে নানা রকমের সুদৃশ্য আসবাব এবং তাহার উপরে রাশি রাশি, এসেন্স, লোসন, ক্রিম প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্য থরে, থরে সজ্জিত শরৎচন্দ্রের সেই উৎকট বিলাসিতা, কৃত্রিম-রূপের জন্য একাগ্র সাধনা সবই পূর্ব্ববৎ বজায় আছে।

আগেকার মতন সেই রকম ভাবে অঙ্গরাগ ও প্রসাধন কার্য্য শেষ করিয়া শরৎচন্দ্র ছড়ি ঘুরাইতে, ঘুরাইতে বাটি হইতে বাহির হইয়া গেল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটি দ্বিতল-বাটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই বাটির দ্বিতলস্থ জানালার ধারে একটি সুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়াছিল এবং একমনে একখানি উপন্যাস পড়িতেছিল। শরৎচন্দ্র উপর দিকে চাহিয়া খুব জোরে গলা খ্যাক্‌রানী দিয়া বার দুই কাসিল। তাহার কাসির শব্দে আকৃষ্টা হইয়া যুবতীটি মুখ তুলিয়া চাহিয়া শরতকে দেখিতে পাইয়া—"ওমাঃ সেই লোকটা"—এই কথা অস্ফুটস্বরে বলিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। শরৎচন্দ্র আহ্লাদে আটখানা হইয়া এরূপ ভাবে মুখ-

ভঙ্গী ও দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিল যে, তাহা দেখিয়া যুবতীটি মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে, হাসিতে বসিয়া পড়িল।

আগেকার ব্যাপারটা এই যে:—এই সুন্দরী যুবতীটি প্রতিদিন বৈকালে এই জানালাটির ধারে দাঁড়াইয়া হাওয়া খাইতে, খাইতে উপন্যাস পড়ে। যুবতীটি এই সময় জানালায় দাঁড়াইয়া কেবল যে হাওয়া খায় তা নয়, সঙ্গে, সঙ্গে পান-জরদা খায় এবং উপন্যাস পড়িতে, পড়তে রহস্য সাগরে ভাসমান হইয়া অন্যমনস্ক ভাবে মধ্যে, মধ্যে যখন পথচারী পথিকের মাথায় পানের পিক্ ফ্যালে তখন গালাগালি খায়। "স্ত্রীলোকের ক্ষুধা অধিক"—এই প্রবাদ বাক্যটি বোধ হয় বড় ঠিক। কারণ এত খাইয়াও এই যুবতীটির পেট ভরেনা তাই উপন্যাস পড়িতে, পড়িতে মধ্যে; মধ্যে মাথা তুলিয়া আড়নয়নে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নিরীহ পথিক ব্যাচারীর মাথাও খায়।

শরৎচন্দ্র নূতন বাটিতে উঠিয়া আসিয়া প্রথম যেদিন রাস্তায় বাহির হয় সেদিন এই যুবতীটিকে এই জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার পানে চাহিতে, চাহিতে পথ চলিতে থাকে। শরৎচন্দ্রকে এই রূপ ভাবে চাহিতে দেখিয়া, স্বাভাবিক কৌতূহল বশে যুবতীটিও শরতের দিকে চাহিয়া দেখে। তৎপরে শরৎচন্দ্র যখন যুবতীটির জানালার নীচে আসিয়া পড়ে তখন তাহার সেই 'ঘনভাবে পাউডার মাখা মুখ' ও রমণী সুলভ সিঁতাকাটা ও অঙ্গরাগাদির ব্যাপার দেখিয়া যুবতীটির বড়ই হাসি পায়। তাহার চক্ষে এই সম্পূর্ণ নূতন ও বিপরীত ব্যাপারের দৃশ্য দেখিয়া যুবতীটি মুখ মুচকাইয়া হাসিতে থাকে। তারপর শরৎচন্দ্র প্রতিদিন যখনই এইস্থান দিয়া যাইত, তাহার রকম-সকম দেখিয়া যুবতীটি তখনই

হাসিত। যুবতীটির স্বাভাবিক চঞ্চল নয়ন ও এইরূপ ভাবের হাস্য দেখিয়া শরৎচন্দ্র মনে করিত যে, তাহার রূপ দেখিয়া যুবতীটি মজিয়াছে তাই ঐরূপ ভাবে নজরা মারিয়া ও হাসিয়া প্রেম জ্ঞাপন করিতেছে। শরৎচন্দ্র এইরূপ মনে করিলেও কিন্তু প্রথমটায় একেবারে চুপ করিয়া গেল। শরৎচন্দ্র মনে, মনে ভাবিল যে—"এ মেয়েমানুষটার ভাব-ভঙ্গী দেখে বোধ হয় যে, আমার রূপে মোহিত হয়েছে। কিন্তু একে ফট্ করে আমোল দেওয়া হবেনা। আগে তিনদিন ওকে পরীক্ষা ক'রব তারপর আমোল দোব। এই তিন দিন ধরে আমি, ওকে উপেক্ষা করে যাব তবুও যদি ওর এই ভাব বজায় থাকে তাহলে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হবে। আচ্ছা এত পরীক্ষারই বা দরকার কি। ওর ভাব দেখেত' স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আমার চেহারা দেখে মোহিত হ'য়ে প্রেমে পড়ে গেছে। কাজেই পরীক্ষার আর দরকার নেই। তার ওপর আরও এক কথা এই যে, মেয়েমানুষটা যদি আমার প্রেমে পড়ে থাকে তাহলে পরীক্ষার হিসেবে এই তিনদিন আমি যখন ওকে উপেক্ষা ক'রে যাব তখন ব্যাচারা মনে বড়ই কষ্ট পাবে। তা থাকগে, পরীক্ষা না ক'রে কোনও কাজ করা হবেনা। হৃদয় পাষাণে বেঁধে এ তিনদিন ওকে পরীক্ষা ক'রতেই হবে। যদিই এজন্যে ব্যাচারীর মনে কষ্ট হয় তাবলে মাত্র তিনদিনের মধ্যে কিছু মারা যাবে না।"

এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল বলিয়াই শরৎচন্দ্র তখনকার মতন নীরব ছিল। তারপর তিনদিন যাবৎ এই যুবতীটির সম্মুখ দিয়া শরৎচন্দ্র আনাগোনা করিতে লাগিল। "যুবতীটি তাহাকে চায় অথচ সে যুবতীটাকে চায়না,"—এইরূপ ভাব দেখাইয়া, গর্ব্বভরে হেঁটোতে

দুলিতে শরৎচন্দ্র রাস্তা দিয়া যায় আর তাহার ঐ ভাব দেখিয়া যুবতীটী হাসিতে থাকে। তিনদিনের দিন যুবতীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া শরৎ নিজের বাটি ফিরিতেছিল এবং মনে, মনে বলিতেছিল যে—"হ্যাঁ যথার্থই প্রেম বটে। এই তিনদিন বেশ কঠোর ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, দেখে বুঝেছি যে, মেয়েমানুষটা যথার্থই আমার প্রেমে পড়েচে। এ তিনদিনে প্রেম কমে যাওয়া দূরে যাক উত্তরোত্তর বেড়েছে। আর ওকে নিরাশ করা উচিত নয়। কালই ওর প্রেম তৃষ্ণা মেটাবো। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে আমায় বিশেষ করে সাবধান হ'তে হবে। আর এ রকম ক'রে যখন-তখন রাস্তায় বেরোবনা। যে-ই আমাকে দেখবে সে-ই যদি আমার ওপর মজে যায় তা হ'লেত আমার সামাল দেওয়া দায় হবে। হয়ত পটু ক'রে মরেই যাব। নাঃ, এ রকম ক'রে আর দিনের আলোতে রাস্তায় বেরোবনা। যদিই বেরোই তাহলে ক'লকাতায় যেমন সদা-সর্ব্বদা গাড়ী করে বেরুতুম তেমনি বেরোবো।"

এইত গেল পূর্ব্বকথা। তার পর চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে শরৎচন্দ্র খুব সাজ-গোজ করিয়া যুবতীর জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়া গলা খ্যাঁকরানী দিল এবং যুবতীর হাস্যের পর সে এরূপ ভাবে মুখ ও অঙ্গভঙ্গী করিল যে তাহাতে যুবতীটি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে, হাসিতে জানালার ভিতর দিকে বসিয়া পড়িল—এই কথা অবধি মনে আছেত ?

যুবতীকে ঐভাবে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া ঘরের ভিতর যে লোকদুইটী বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি—ঐরূপ উচ্চ-হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, যুবতী বলিল—"দ্যাখ সেই যে একটা লোকের কথা

তোমায় বলেছিলুম সেই লোকেটা আজ জানালার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে আর আমার দিকে চেয়ে হাসছে আর চোখ-মারছে।"

এই লোক দুইটির মধ্যে প্রথম লোকটি এই বাটির মালিক। লোকটি মাড়োয়ারের অধিবাসী। কোনও অজ্ঞাত কারণে দেশ ছাড়িয়া এই কাশীতে কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করিতেছে। এই যুবতীটিকে কোনও স্থান হইতে কুসংস্কারের অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছে এবং উভয়ে স্বামী স্ত্রীর মতন বেশ ভদ্রভাবে বাস করিতেছে। ইহাদের কেতা দুরস্ত চাল-চলন সকলের মনে একটা নিঃসন্দেহের ভাব আনিয়া দিয়াছে সেইজন্য ইহাদের পূর্ব্ব-পরিচয়ের জন্য কেহ ব্যস্ত নয়। লোকটা বেশ ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা জানে, এবং নানা প্রকার কার্য্যের দালালী করে ও সময় অসময়ে জাল-জুয়াচুরী করিয়া বেশ দু'পয়সার সংস্থান করিয়াছে। দ্বিতীয় লোকটি তাহার বন্ধু কাশীতে অধিবাসী এবং তাহার অনেক কর্ম্মের সহায়ক। প্রথম লোকটিকে আমরা অতঃপর 'গৃহস্বামী' বলিয়া অভিহিত করিব।

এই ঘরের মধ্যস্থলে একখানি সুসজ্জিত পালঙ্ক আছে। সেই পালঙ্কের উপর বসিয়া গৃহস্বামী বন্ধুর সহিত জুয়া খেলিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতেছে। যুবতীর কথায় দ্বিতীয় লোকটি বলিল—"যেতে দাও, যেতে দাও, গোলমাল ক'রনা।

গৃহস্বামী বাধা দিয়া বলিল—"না: না: দাঁড়াও, দেখি লোকটা কে? এই কথা বলিয়া গুড়ি মারিয়া জানালার নীচের দিকে যাইয়া, একটি খড়খড়ি একটু মাত্র তুলিয়া শরৎকে দেখিল। তৎপরে সরিয়া আসিয়া যুবতীকে বলিল—"দ্যাখ, তুমি ঐ লোকটাকে ডাক—তারপর ওকে বেশ ক'রে প্রেম জানাও। আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

যুবতী বলিল—"না, না ওসব হবেনা। আমায় কি সেই রকম পেলে নাকি? এতদিনেও কি আমায় বিশ্বাস হ'লনা? আর তুমিও কি শেষে ভেড়ুয়া হবে নাকি?

গৃহস্বামী বলিল—"ওরে রেখে দে তোর ওসব কথা। যা বলি শোন্।" এই বলিয়া যুবতীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া কি কথা বলিয়া তৎপরে প্রকাশ্যে বলিল—"বুঝলি? এতে বেশ মোটা টাকা রোজগার হবে। লোকটাকে দেখে খুব বড়লোকের ছেলে ব'লে বোধ হচ্ছে। আর বাবু তুইতো কিছু সতীলক্ষ্মী নোসরে। এ বয়সে অনেক কাণ্ড তো করেচিস। এ পাড়ার লোকেরা না হয় তোকে, আমার শিক্ষিতা-মাগ বলে জানে। কিন্তু তুই যা তাতো আমি জানি আর তুইও জানিস।" এই কথা বলিয়া সে মদের বোতল, গেলাস, তাস, খুচরা টাকা-কড়ি প্রভৃতি লইয়া সবন্ধু পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল।

যুবতীটি তখন পালঙ্কের উপরিস্থিত বিছানাটি হাত দিয়া একটু ঝাড়িয়া ফেলিল এবং অঙ্গ হইতে জামাটি খুলিয়া ফেলিয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

শরৎচন্দ্র এতক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারী করিয়া দুই একবার কাসিল তারপর খুব জোরে একবার শিস্ দিয়া ক্ষণপরে আবার যেই শিস্ দিতে যাইবে সেই সময়ে যুবতীটি জানালায় আসিল দেখিয়া—আনন্দে বত্রিশ পাটি দন্ত বাহির করিয়া ফেলিল। যুবতীটি চঞ্চল নয়নে, বিদ্যুৎ চমকের মতন একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া একটু মুচকি-হাসি হাসিল। তারপর হাত নাড়িয়া, শরৎকে ডাকিল।

শরৎ বলিল—"আমায়, আমায় ডাকছ নাকি? কি দরকার তোমার।"

আবার, আবার সেই মধুর হাসিয়া যুবতী বলিল—"কেন? কেন তাকি বুঝতে পারছনা নিষ্ঠুর। কদিন ধ'রে আমার মন কেড়ে নিয়ে নিষ্ঠুরের মতন পালিয়ে, পালিয়ে বেড়াচ্ছ। আজ যদিও বা দয়া করে দেখা দিলে তবুও ছলনা ক'রে আমার মতন অবলা ললনাকে কষ্ট দিচ্ছ প্রাণনাথ।"

শরৎচন্দ্র মনে মনে বলিল—"ওরে কোথায় গাড়ী, ঘোড়া, মটরকার, দমকল আফিস, শাগ্‌গির এসে আমায় চাপা দেরে—আমি এই সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে মরি। ওহো বলে কি? "প্রাণনাথ" "প্রাণনাথ"। ওহো একি শুনিরে।"

যুবতী বলিল—"কি ভাবছেন? আমার ওপর কি আপনার ঘৃণা হচ্ছে নাকি?"

চির পিপাসিত, জীবনের মহাকাম্য মধুময় কথাগুলি আজ জীবনে এই প্রথম শুনিয়া শরৎচন্দ্র সুখ-সাগরের প্রবল তরঙ্গে নাকানী-চোবানী খাইয়া প্রায় আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। এক্ষণে যুবতীর কথায় তাহার সাড় হইল, সে বলিল—"কি, কি বলছ সুন্দরী?"

যুবতী আবার একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"বলছি যে আমায় লজ্জাহীনা ব'লে, আপনার ঘৃণা হচ্ছে নাকি?"

শরৎচন্দ্র বলিল—"ঘৃণা? তোমাকে ঘৃণা? তুমি কি আমার প্রাচীন সেকেলে, অসভ্য বাপ মা-না-গুরুঠাকুর যে তোমায় ঘৃণা ক'রব। তুমি আমার নয়নের মণি, সোণার খনি, আঁধার রাতের চাঁদ, দুস্তর নদীর বাঁধ, প্রেম-পাখীর ফাঁদ; আমার ঘরের লক্ষ্মী, দাঁড়ের পক্ষী, পাহারায় রক্ষী, খাবারে সোনার থালা, খরচে টাকার ছালা, তেষ্টায় জলের

জালা, আত্মীয়, বড়-কুটুম-শালা, আর—আর যুগল মিলনে বন্দনের মালা।"

যুবতী বলিল—"আমি অবলা, সরলা, কুলবালা—আপনার অত বড় নোলার কবিত্বের ঠ্যালা আমি সহ্য ক'রতে পারব না। এর চেয়ে আপনার বিরহ আমি আর সহ্য ক'রতে পারছি না। আসুন প্রেমিকবর আসুন।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"ভাই সুন্দরী, বাড়ীর ভেতর গিয়ে কাজ নেই। আমি বরং একখানা গাড়ী ডেকে আনি; চল বেশ স্ফূর্ত্তী ক'রতে ক'রতে বেড়িয়ে আসা যাক।"

যুবতী বলিল—"আবার সেই নিষ্ঠুরতা? না আপনি বাড়ীতে আসুন। এখানে কেউ নেই; দুঃখিনী, চির-দুঃখিনী আমি একলাই রয়েছি। আমার এক বৃদ্ধ স্বামী আছে—সহরের ভেতর তার দোকান। সে সেই রাত দশটারপর এখানে আসবে।"

শরৎচন্দ্র মনের আনন্দে তাহার সেই কোদালে-দন্ত বিকাশ করিয়া বলিল—"বৃদ্ধস্বামী? য়্যাঁ বৃদ্ধস্বামী? তা এতক্ষণ বলনি কেন? এস. এস প্রিয়ে তুমি নেমে এস, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

যুবতীটি নীচে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, শরৎ ভিতরে ঢুকিল। যুবতীটির পিছু পিছু শরৎচন্দ্র উপরের সেই ঘরে যাইল। ঘরে ঢুকিয়াই, ঘরের মধ্যস্থলস্থিত পালঙ্কের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যুবতী, শরৎকে বলিল—"আপনি এই পালঙ্কের ওপর উপবেশন করুন।"

শরৎচন্দ্রের প্রাণে আজ স্ফূর্ত্তির সপ্ত-সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে, ভাবের লহর খেলিতেছে। যুবতীটি যেই তাহাকে বলিল যে—"আপনি

এই পালঙ্কের ওপর উপবেশন করুন"—শরৎচন্দ্র অমনি ভাবে গদগদ হইয়া, আহ্লাদে ডগমগ হইয়া, ফিলিংয়ের চোটে কড়্‌কড়্‌ করিয়া বলিল—"না আমি তোমায় দেখব, এইখান থেকে দেখব—

ভেবে দ্যাখ মন কত তোরে নাচায় নয়ন।
ছিলি উপেক্ষিত সামান্য এক নাবালিকা পাশে
এবে হ'ল দাসী সাবালিকা এ সুন্দরী রূপসী।
গত সেই দিনে অধৈর্য্য প্রাণে কার পরিণয় প্রস্তাব
পেয়েছিলি যেই অত্যাচার,
তার পুরস্কার—এ সুন্দরী আজ দাসী হে তোমার।
ভাব মন কত বন্ধু তোমার নয়ন।
তোষহে ইহারে—মাথায়ে যতনে
নারী চক্ষু হ'তে শীঘ্র লইয়া অঞ্জন।"

যুবতী ব'লল—"খুব হয়েছে, খুব হয়েছে। এখন আসুন, এসে বসুন।"

শরৎচন্দ্র ব'লল—"দাঁড়াও, আরও একটু কাজ আছে শোন, এইদিকে শোন—দ্যাখ আমি তোমার অলঙ্কার থেকে জুটো কাঁটা চাইনা বটে কিন্তু তোমার ঐ পদ্মপলাশ, রতিবিলাস, মদনের পাশ তুল্য নয়ন হতে একটু কাজল আমায় দাও। দাও, দাও।" যুবতী চক্ষু হইতে একটু কাজল বাহির ক'রিয়া শরতের হাতে দিলে পর শরৎ, তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িতে, নাড়িতে বলিল—"যাও প্রিয়ে, তোমার স্বামীকে বলগে যাও যে, তাঁর একটি উপযুক্ত জুড়ীদার জুটেছে।" এই কথা বলিয়া যুবতীর চক্ষু হইতে গৃহীত কাজল মাখা অঙ্গুলি দুইটি উর্দ্ধে তুলিয়া, ভাবাবেগে বলিল—

মন এখনও আঁখিরে অনাদর কর ?
বন্ধু তোর—শীঘ্র কর মাথায়ে রঞ্জন
নারী চক্ষু হ'তে তুই পেলি যে অঞ্জন।
নহে খঞ্জন-গঞ্জন তোর এ দুটি নয়ন
পক্ষ বিস্তারি কবে করিবেরে পলায়ন।
( অঙ্গুলীস্থ কাজল চক্ষে লাগাইয়া )
অঞ্জন ( ওহোঃ ) অঞ্জন পর যুগল নয়ন
চল ঠোঁট অধর সুধা করিতে গ্রহণ।

এই সকল বলিবার পরই শরৎচন্দ্র দুই চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া, ঘন ঘন ওষ্ঠাধর নাড়িতে লাগিল এবং চুমকুড়ী দিতে লাগিল।

শরৎচন্দ্রের এই রকম ব্যাপারে যুবতীটি মনে মনে বড়ই আমোদ পাইল। সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। তৎপরে শরতের হাত ধরিয়া টানিয়া পালঙ্কের উপর বসাইল এবং নিজেও তাহার পার্শ্বে বসিল। যুবতীটি গা ঘেঁসিয়া বসাতে; শরৎচন্দ্র আনন্দের চোটে বসিয়া-বসিয়াই নৃত্য করিয়া উঠিল। দুইজনে পাশপাশি বসিয়া অল্পক্ষণ নীরব রহিল। 'প্রথমে কি কথা বলা উচিত'—শরৎচন্দ্র তাহাই ভাবিতেছে এমন সময়ে যুবতীটি শরতের বুকের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। যুবতীটি হঠাৎ তাহার বুকের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়াতে শরৎচন্দ্র ওঁক্ করিয়া উঠিল এবং "ওরে বাবা বড্ড লেগেছেরে" এই কথা বলিতে না বলিতেই, যুবতীটি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল— "প্রাণেশ্বর আমায় চিরদিন মনে থাকবেত, না এই একদিনের দেখাতেই শেষ।"

যুবতীর উষ্ণ নিশ্বাসে শরতের মুখমণ্ডল ঝলসাইয়া যাইবার মতন হইল। শরতের সমস্ত অঙ্গ ঘামিয়া উঠিল, তাহার কাণের ভিতর ভোঁ, ভোঁ করিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র এখন যে কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না কিন্তু তাহার হাত দুইটি আপনা হইতেই যুবতীর অঙ্গে জড়াইয়া গেল এবং লোহা যেমন সজোরে চুম্বকের উপর যাইয়া পড়ে—তাহার ওষ্ঠাধর তেমনি ভাবে যুবতীর ওষ্ঠাধরে যাইয়া সংলগ্ন হইল। ইহার পর উজ্জ্বলে মধুরে মিশন—অর্থাৎ শরতের চুম্বনের বিনিময়ে যুবতীটি, শরতকে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিয়া দুই তিনটি চুম্বন দিল। শরৎ স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিল; তাহার বোধ হইতে লাগিল যে, সে যেন স্বর্গে যাইতেছে। তাই সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ওরে কে আছিস? আমি তো স্বর্গে চললুম—তোরা কেউ হরিচরণ আর মাধবকে বলিস যে, আমার চামড়ার-বাক্সর ভেতর সাত হাজার টাকা আছে, তার ভেতর ছ'হাজার টাকা যেন তারা নেয় আর—।" বাকীটুকু আর বলা হইল না। কারণ যুবতীটি তাহাকে এই সময় আবার দুই, চারিটি চুম্বন দিল। ইহাতে শরতের মুখের কথা বন্ধ হইয়াত গেলই, উপরন্তু সে আর চোখে দেখিতে পাইল না এবং তাহার নিশ্বাস খুব জোরে ও ঘন ঘন পড়িতে লাগিল; দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহার নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে। তারপর—যুবতীটির চুম্বনের বিনিময়ে খুব গাঢ় দুই, তিনটি চুম্বন দিয়া শরৎচন্দ্র পুনরায় যেই তাহাকে চুম্বন করিতে যাইবে অমনি পশ্চাৎ হইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে কে হাঁকিল—"সামাল ব্যাটা, সামাল।"

এই বজ্রগম্ভীর স্বরে শরৎচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখে যে—একটি বলিষ্ঠ লোক একখানি উন্মুক্ত ছোরা হাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই দৃশ্যে মহাভীত হইয়া শরৎচন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পিছন দিকে সাত হাত সরিয়া গেল। এই আগন্তুক যে গৃহস্বামী তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। শরৎকে পিছাইয়া যাইতে দেখিয়া গৃহস্বামী ছোরাখানি কোমরে গুঁজিয়া রাখিয়া, দুই হাত বুকের ওপর তুলিয়া, কটমট চক্ষে শরতের দিকে চাহিয়া রহিল। শরৎচন্দ্র প্রাণপণে ভীত ভাবকে চাপিয়া কৃত্রিম রোষ দেখাইয়া বলিল—"এই কে তুই, এখানে এসে গোলমাল করচিস? বেরো ব্যাটা এখুনি—"

গৃহস্বামী কর্কশ স্বরে বলিল—"চুপ ক'রে ওইখানে দাঁড়িয়ে থাক্। যদি এক পা এগোবি তো মজা দেখতে পাবি।"

শরৎচন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রোষ দেখাইয়া বলিল—"না দাঁড়াব না, তুই কি করবি?"

কোমর হইতে ছোরাখানি চকিতে বাহির করিয়া গৃহস্বামী বলিল—"যদি ভাল চাসতো সরে গিয়ে দাঁড়া; নইলে এই ছোরা তোর বুকে মারব।"

শরৎচন্দ্র পাঁচ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিল—"তাইতঃ এত' বড় মুস্কিলে পড়া-গেল দেখি।"

গৃহস্বামী বলিল—"এই তুই আমার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছিস আর আমার স্ত্রীর ইজ্জৎ নষ্ট ক'রেচিস্, তোকে সহজে ছাড়ব?"

শরৎ বলিল—"এই মেয়েমানুষটি তোমার স্ত্রী? য়্যাঁ? তা ভাই ওসমান

আমার কোন দোষ নেই—আমার রূপে মোহিত হ'য়ে আমাকে ডেকে এনেছে? বিশ্বাস না হয়, ওই আয়েষা বেটিকেই জিজ্ঞেস ক'রে দেখ।"

গৃহস্বামী বলিল—"চোপরাও ব্যাটা মিথ্যেবাদী। তোর এই কদাকার চেহারা, তোর এই বাঁদরের মতন মুখ, তাই দেখে আমার বী মোহিত হয়েছেরে ব্যাটা?

শরৎ বিশেষ রকম দমিয়া গেল। তবুও আত্ম-সাহস অবলম্বন করিয়া বলিল—"আমার কথা বিশ্বাস না করবি তো আমার ব'য়ে গেল। আমার পাড়ার লোকেরা সবাই জানে যে, আমি জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলিনা—বুঝলি? এ কথাও যদি বিশ্বাস না হয় ত' কলকাতায় কখনও যদি যাসত', আমার পাড়ায় গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করিস—তাহলে তখন আমার কথা বুঝতে পারবি। এখন সর্—স'রে দাঁড়া—আমি চ'লে যাই।"

গৃহস্বামী রোষভরে বলিল—"তোকে চলে যেতে দোব কিরে ব্যাটা—তুই এখন আমার বন্দী।"

শরৎচন্দ্র বিরক্তিভরে যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও মেয়েমানুষ, ও 'ডেকে-আনা-প্রিয়ে' টপ্ ক'রে বলে ফেল যে, 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'—এই কাটখোট্টা, বেরসিক ওসমান ব্যাটা ঠাণ্ডা হোক; আমায় ছেড়ে দিক।"

গৃহস্বামী টপ্ করিয়া শরতের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ওসব বক্‌বকানি থামা। মরবার জন্যে তৈরী হয়ে নে।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"কেন মরবার জন্যে তৈরী হব আমার অপরাধটা কি?"

গৃহস্বামী বলিল—'তুই, আমার স্ত্রীকে বেইজ্জৎ করেছিস, তোকে আমি খুন ক'রব।

শরৎচন্দ্র বিরক্তিভরে বলিল—"আবার সেই কথা? তুমিত' বড় চাষা আর মূর্খ লোক হে। এই না বললুম যে, আমার কোনও দোষ নেই—তোমার স্ত্রী, আমার রূপে মোহিত হ'য়ে ভালবাসা জানিয়ে, কত সোহাগ দেখিয়ে আমাকে ডেকে এনেছে।"

শরতের কথা শেষ হইতে না হইতে যুবতীটি চিৎকার করিয়া বলিল —"নাগো না, ওর সব মিথ্যে কথা। আমি ঘরে চুপ ক'রে বসেছিলুম; এমন সময় ও লোকটা হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমায় জোর ক'রে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত চুমু খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমি প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু ওর জোরে পারছিলুম না। তারপর তোমরা এসে পড়লে, আমার প্রাণটা বাঁচল। তোমাদের আসতে যদি আর একটু দেরী হ'ত তাহলে আমি নারী-সুলভ লজ্জায় নিশ্চয়ই মারা যেতুম!"

শরৎচন্দ্র চিৎকার করিয়া বলিল—"খবরদার মেয়েমানুষ খবরদার; ও রকম ভাবে মিথ্যা কথা ব'লনা! মহাপাপ হবে, নরকে যেতে হবে, যমদূতরা সব জলন্ত শাঁড়াসী দিয়ে তোমার জিভ টেনে বার ক'রবে—বুঝলে? যদি ভাল চাও ত সত্যি কথা এখনও বল। তাহলে যমদূতরা অনেকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। বল, তুমি আমার রূপে মোহিত হওনি, আমার প্রেমে পড়নি? এখন স্বামীকে দেখে কথা ঘুরিয়ে নিলে চ'লবেনা।"

এইবার স্বরূপ-মূর্ত্তী ধরিয়া যুবতী বলিল—"ওরে ও বোকা-মিনসে তুই বলিস কিরে? তোর এই কুৎসিৎ চেহারা দেখে কখনও কোনও অতি-

কুৎসিত মেয়েমানুষ মোহিত হয়না—আর আমি হব?' কালো রঙের ওপর পাউডার মাখলে কি মেয়েমানুষ মোহিত হয়? ঐ রকম ভাবে পাতা কেটে টেরী কাটলে কি মেয়েমানুষ প্রেমে পড়ে? ওই রকম ভাবে লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে, একগাদা পোষাক প'রে আড়ষ্টকাট, জড়ভরত, নড়ন-চড়ন-রহিত হ'য়ে বেড়ালে কি মেয়েমানুষের মন কেড়ে নেওয়া যায়? তুই কি তাই মনে করিস নাকি? মেয়েমানুষের মন কি এতই সস্তা? তোর ঐ পাউডার মাখা মুখ দেখলে আমার মনে হয় যে, যেন তোর কুষ্ঠ হয়েছে তাই তোর কালো মুখের ওপর ওই রকম সাদা ফুটে বেরিয়েছে। তোকে দেখলেই আমার এই জন্যে হাসি পেত' আর তুই মিন্‌সে মনে করতিস যে, তোর ঐ অপরূপ কিম্ভুতকিমাকার রূপে আমি মোহিত হয়েছি।"

শরৎচন্দ্র অবাক হইয়া বলিল—"য়াঁ!"

যুবতী বলিল—"হ্যাঁ, হাঁ, আমি যা বললুম তাই ঠিক জানবি। যদি কখনও কোনও মেয়েমানুষ তোকে জানায় যে—'তোর প্রেমে পড়েচে বা তোর রূপে মোহিত হয়েছে'—তাহলে জানবি যে, হয় সে তোকে ঠাট্টা ক'রচে না হয় তার কোনও মতলব আছে। এটা ঠিক মনে জানবি যে, তোর এই চেহারায় তার ঘরের মাগ্ ছাড়া আর কেউ তোকে ভাল-বাসবেনা।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"খুব হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। এইবার আমায় যেতে দাও।"

গৃহস্বামী বলি—"তুই আমার স্ত্রীকে বেইজ্জৎ করেচিস; আমার প্রাণে আগুণ জ্বলছে, অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়েছে—তোকে কখন

ছাড়বনা। তোর স্ত্রীর ওপর যদি কেউ ঐ রকম ভাবে অত্যাচার আর অপমান ক'রত তাহলে তোর বুকের ভেতরটা কি রকম জ্বলত? তুই তাহলে তাকে কি ক'রতিস?

শরৎ বলিল—"আমার স্ত্রী নেই। যদি আমার স্ত্রী থাকতো তাহলে তোমায়, তাকে চুমু খেতে দিতুম। আমার স্ত্রীকে যত ইচ্ছে চুমু খেয়ে তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু কি ক'রব বল, তোমার কপালে নেই; আমি বিয়ে করিনি।"

গৃহস্বামী ক্রোধভরে বলিল—"এই রকম ক'রে পরস্ত্রীর ইজ্জৎ নষ্ট ক'রে বেড়াবি ব'লে বুঝি তুই বিয়ে করিসনি। ওঃ তুই ব্যাটা মহা পাজী তোকে কখনও ছাড়ব না। নে ব্যাটা ভগবানকে ডেকে নে, আজ তোর শেষ দিন।" এই বলিয়া সে সবলে শরতের গলা টিপিয়া ভূমিতে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসিল। তৎপরে পার্শ্ববর্ত্তী ঘর হইতে—তাহার আহ্বানে—তাহার সেই বন্ধুটি, একটি থলিয়া ও এক গাছি দড়ি লইয়া আসিল। উভয়ে মিলিয়া শরৎকে, সেই মোটা দড়ি দিয়া পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। গৃহস্বামী ছোরাখানি উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"যারা পরের সুখ, দুঃখ বোঝেনা, যারা পরস্ত্রীর ওপর অন্যায় লোভ করে, যারা পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম ক'রে লোকের বুকের ভিতর আগুন জ্বালে, তাদের বুকে এই রকম জোরে ছোরা মারতে হয়।" এই বলিয়া শরতের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ছোরা মারিতে গেল। শরৎ ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং অতীব কাতরস্বরে বলিল—"দোহাই বাবা আমায় ছেড়ে দাও। এ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ ক'রনা। আমায় মেরে তোমার কোনও লাভ হবে না।

তোমার পায়ে পড়ি আমায় বাঁচাও, আমি তোমায় অনেক টাকা দোব।" শরৎচন্দ্র কাঁদিতে লাগিল।

গৃহস্বামীর বন্ধু বলিল—"কর্ত্তা-মশাই লোকটাকে না হয় এবারকার মতন ছেড়ে দিন আর আপনার অপমানের খেসারত হিসেবে কিছু টাকা না হয় নিন। লোকটা যখন অত অনুনয়-বিনয় ক'রছে আর টাকা দিতে চাচ্ছে তখন ওর ওপর দয়া করুন। আর দেখুন অনর্থক কেন নরহত্যার পাপ করবেন? আপনি পুণ্যাত্মা লোক।"

শরৎচন্দ্র পূর্ব্ববৎ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দোহাই বাবা, তোমার পায়ে ধরি, আমায় ছেড়ে দাও। আমি এমন কাজ আর কখনও ক'রব না। আর তোমায় নগদ এক হাজার টাকা দোব।"

গৃহস্বামীর বন্ধু কৃত্রিম মহা-রোষভরে বলিল—"ওরে ব্যাটা ড্যাম, রাসকেল, বাগার, ফুল, কুৎসিৎ, কদাকার, চক্ষুশূল—ওরে ব্যাটা ইঁদুর, ছুঁচো, বদমাস, মুরগী, মটন, পাতিহাঁস—ওরে ব্যাটা গাধার ক্ষুর, ছাগলের নুর, মাছের আঁশ, ধুলো, ময়লা, মরামাস—ওরে ব্যাটা উনুনের পাশ, ঘুনধরা-বাঁশ, দাসানুদাস এখনই ঠাস্ ক'রে এমন একটি চড় মারব যে ভুবার এপাশ-ওপাশ ক'রে, শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে হাঁস-ফাঁস ক'রতে ক'রতে মারা যাবি। তোর এত বড় বুকের পাটা যে, আমাদের মহামান্যবর কর্ত্তামশায়ের মানের দাম মোটে হাজার টাকা দিতে চাইচিস। কাশী সহরে কর্ত্তামশায়ের মান কত জানিস। কর্ত্তামশাই তোকে যদি প্রকাশ্য পথের ওপর দাঁড়িয়ে কেটে ফেলে তবুও তাঁর কিছু হবেনা জানিস্।"

শরৎচন্দ্র অনেক অনুনয়, বিনয়, কান্নাকাটি করার পর গৃহস্বামীর

সহিত এই বন্দবস্ত করিল যে, তাহার সঙ্গে যে বহুমূল্য হীরক-অঙ্গুরী ও ঘড়ি চেন আছে তাহা দিবে এবং দশ হাজার টাকার একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিবে।

এইরূপ বন্দবস্ত ঠিক হইবার পর গৃহস্বামীর বন্ধু বাটি হইতে বাহির হইয়া গেল এবং একঘণ্টা পরে ষ্ট্যাম্প লইয়া ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ শরৎচন্দ্র সেইরূপ বন্ধনাবস্থাতেই পড়িয়াছিল। এইবার তাহার বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিয়া গৃহস্বামী তাহাকে বলিল—"ওঠ এই পালঙ্কের ওপর বস।"

পালঙ্কের উপর বসিতে বলাতে এবার যে আর পূর্ব্বের মতন, শরৎচন্দ্র ষ্ট্যাকটিং করিল না, সেকথা বোধ হয় খুলিয়া বলিতে হইবে না।

সর্ব্বাঙ্গ দড়ি দিয়া সজোরে বাঁধাতে শরতের সমস্ত অঙ্গের বন্ধনপ্রাপ্ত স্থানগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছিল ও ভয়ানক দাগযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। শরৎচন্দ্র পালঙ্কের উপর বসিয়া দুইখানি কাগজে লেখাপড়া করিয়া দিল। একখানি কাগজে লেখা হইল যে, শরৎচন্দ্র তাহার ঘড়ি, চেন প্রভৃতি নগদ তিন হাজার টাকা পাইয়া, গৃহস্বামীকে বিক্রয় করিল। দ্বিতীয় কাগজখানিতে লেখা হইল যে, শরৎচন্দ্র নিজেকে একজন ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া এবং বিশেষ প্রয়োজনের দোহাই দিয়া —তিন মাসের কড়ারে, ফৌজদারী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নগদ দশ হাজার টাকা গৃহস্বামীর নিকট হইতে ধার লইল।

লেখাপড়া শেষ করিয়া শরৎচন্দ্র চলিয়া যাইতে চাহিল। গৃহস্বামী বাধা দিয়া বলিল,—"দাঁড়াও, আগে নাক, কাণ মলা দিয়ে বল যে, আর কখনও পরস্ত্রীর ওপর কুনজর দোবনা।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"সেকথা তোমায় আর কষ্ট ক'রে বলতে হবে কেন? আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি যে, আজ থেকে পরস্ত্রীর ওপর কুনজর দেওয়া দূরে থাক, সমস্ত পরস্ত্রীকে আমি আমার গর্ভধারিণীর মতন দেখব। আর যে পাপ ক'রেছি তার জন্য এই নাক কাণ ম'লে, নাকখৎ দিচ্ছি।" এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র খুব জোরে নিজের নাক, কাণ মলিল এবং ভূমির উপর পড়িয়া এত জোরে নাক ঘসিয়া নাকখৎ দিল যে, তাহার নাকের উপরটা খুব ছড়িয়া গিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

গৃহস্বামী বলিল,—"যাও, যা ব'ললে যেন মনে থাকে। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোকের মতন হওগে।"

সকলের নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও সকলকে নমস্কার করিয়া শরৎচন্দ্র বাহির হইয়া গেল। উহারা তিনজনে একবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

---

## ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

'ডেকে-আনা-প্রিয়ের' বাটি হইতে বাহির হইয়া রাজপথে পড়িয়া শরৎচন্দ্র অতি দ্রুতবেগে চলিয়া নিজের বাটিতে আসিল। নীচের ঘরে হরিচরণ ও মাধব বসিয়াছিল। তাহারা, শরৎচন্দ্রের অস্বাভাবিক মুখভাব ও আকৃতি দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। ইহারা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই শরৎচন্দ্র মহা গম্ভীরস্বরে বলিল—"আমার সঙ্গে এখনই ওপরে এস।" এই কথা বলিয়া শরৎ উপরে গিয়া বরাবর তাহার সুসজ্জিত ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করিল। হরিচরণ ও মাধব, তাহার পিছু পিছু যাইয়া দাঁড়াইল।

শরৎচন্দ্র বলিল,—"আমি তোমাদের দু'জনকে এখন যে কথা জিজ্ঞেস ক'রছি—যদি তোমরা ভদ্রলোকের ছেলে হওত, তার সত্যি উত্তর দাও। বল, আমার চেহারা কি খুব সুন্দর?"

সেই পুরাতন প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উত্তর, ইহারা আরও কতবার অতি সোজাভাবে দিয়াছে। আজ কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার চক্ষের চাহনি ও জিজ্ঞাসার ভঙ্গী দেখিয়া ইহাদের প্রাণ চমকিয়া উঠিল। দুই তিনটা ঢোঁক গিলিয়া দুইজনে সমস্বরে বলিল—"আপনার চেহারা সুন্দর, অতি সুন্দর। কোন্ শালা ব'লতে পারে যে, আপনার চেহারা কুৎসিৎ।"

দৃঢ়স্বরে ও ক্রোধভরে শরৎ বলিল—"আমি শাণী ব'লতে পারি যে, আমার চেহারা কুৎসিৎ, অতি কুৎসিৎ। আর আমার মনটা, তার চেয়ে শতগুণে বেশী কুৎসিৎ। কিন্তু আমার এই কুৎসিৎ মনের জন্যে আমি যতটা দায়ী তার চেয়ে শতগুণ দায়ী তোমরা। 'কোনও সময় একলা থাকতে পারি না সর্ব্বদাই গল্প করবার আর মন-যোগান কথা বলবার জন্যে লোক চাই'—এই যে একটা বদ অভ্যাস আমার আছে, সেই অভ্যাসের জন্যে আমি তোমাদের যে রকম বাধ্য হয়েছিলুম তাতে, তোমরা যদি মনে ক'রতে তাহলে আমায় যথার্থ মানুষ ক'রতে পারতে। প্রিয়-সঙ্গী যারা—তারা যদি দিবারাত্র ভাল আলোচনা করে তাহলে মন ভালর দিকে যায়ই যায়। তোমরা যদি মনে ক'রতে তাহলে আমি এতটা প্রবৃত্তির দাস হতুম না। আমার মনে যে পাপের আগুণ গুমিয়ে, গুমিয়ে জলছিল, তোমরা সেটা নেবাবার চেষ্টা না ক'রে উলটে তা'তে ইন্ধন যুগিয়ে এসেছ। আজ আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলেছে। উঃ ভাবতে আজ আমার মাথা হেঁট হ'য়ে আসছে, মনটা এতটুকু হ'য়ে যাচ্ছে—সামান্য এই দেহের জন্যে, আমি কত টাকাই না খরচ ক'রেছি, কি অমূল্য-সময়ই না নষ্ট ক'রেছি। নকলরূপের সাধনায় আর হীন বিলাসিতায় মত্ত হ'য়ে আমি যে টাকা অপব্যয় ক'রেছি সেই টাকায়—আর কিছু না হোক, সমাজের এই দুর্দিনে—অন্ততঃ তিন, চারশো কন্যাদায়গ্রস্থ লোককে দায়-মুক্ত ক'রে তাদের ভিটে-মাটি রক্ষা ক'রতে পারতুম, আত্মহত্যার হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারতুম, সমাজকে সবল রাখতে পারতুম।"

হরিচরণ ও মাধব দেখিল যে অবস্থা বড়ই গুরুতর। তাই তাহারা

মরিয়া হইয়া—জীবনে কখনও যে 'স্পষ্ট-কথা' বলে নাই আজ সেই স্পষ্ট-কথা বলিল—"বাবু কি কেবল আমাদেরই দোষ দেখলেন ?"

শরৎচন্দ্র বলিল—"শুধু তোমরাই দোষী নও, আমিও দোষী—মহা দোষী। কিন্তু এ কথা বড়-গলা ক'রে ব'লব যে, মোসাহেবদের হাতে না পড়লে বড়লোকের ছেলেরা কখনও, কোনও মতেই যথার্থ অধঃ-পতিত হয় না। কোনও ভাল লোককে খারাপ করবার সঙ্কল্প নিয়ে এসে মোসাহেবরা যখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাকে খারাপ পথের চরমে নিয়ে যেতে পারে তখন মোসাহেবরা যদি মনে করেত' কেন তাকে ভাল পথে নিয়ে যেতে পারবে না ? মোসাহেবরা যখন, মানুষকে পশু করবার শক্তি ধারণ করে তখন সেই শক্তি প্রয়োগ ক'রে নিশ্চয়ই তারা মানুষকে দেবতা ক'রতে পারে।"

হরিচরণ বলিল—"যাক, যাক বাবু, ও সব দুঃখের কথা যেতে দিন। এই সংসারে দুদিনের জন্মে আসা, আমোদ ক'রে দিন কাটিয়ে দিন। এ সংসার তো চির দিনের নয়, একদিন জন্মের মতন যেতেই হবে, সুতরাং দুঃখের কথা ক'য়ে মিছে কি হবে। আসুন আনন্দ করা যাক !"

শরৎচন্দ্র উত্তেজিত ভাবে বলিল—"হ্যাঁ আনন্দ ক'রব, আনন্দ ক'রব। দেখ যাতে আমার দুঃখ, তোমার দুঃখ, আমাদের বহু দেশ-বাসীর দুঃখ সেই দুঃখের মূলকে আজ শেষ ক'রব। এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র, গৃহকোণস্থিত আমব্রেলা-ষ্ট্যাণ্ড হইতে একটি মোটা বেতের লাঠি তুলিয়া লইয়া, তাহার বড় সাধের, অতি যত্নের, অনেক সখের সৌখীন বিলাস দ্রব্য সকল ভাঙ্গিতে লাগিল। ঝন্-ঝন্-ঝনাৎ-ঝনাৎ

শব্দে সেই থরে, থরে, সজ্জিত রাশি, রাশি এসেন্স, লোসান ও নানারূপ কাচ-নির্ম্মিত সুদৃশ্য আধার প্রভৃতি বহু সৌখীন দ্রব্য চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। "এই গুলোত হল—এইবার আর্শী আর পোষাকের পালা' —এই কথা বলিয়া হস্তস্থিত লাঠির দ্বারা দুই চারিটি আঘাত দেওয়াতে আর্শী ভাঙ্গিলনা দেখিয়া শরৎচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া, সজোরে দুই তিনটী হ্যাঁচকা দিয়া দরজার হুড়কাটি ভাঙ্গিয়া লইয়া, তাহার আঘাতে সমস্ত আর্শীগুলি চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তারপর হাঁপাইতে, হাঁপাইতে—সমস্ত আড়ম্বরপূর্ণ পোষাক এবং সমস্ত সৌখীন ও মূল্যবান জামা, কাপড়, চাদর, রুমাল প্রভৃতি এবং দেড়শত টিন সিগারেট জানালা গলাইয়া নীচে বাগানের ভিতর ফেলিয়া দিয়া শরৎচন্দ্র গম্ভীরস্বরে দরোয়ানকে ডাকিয়া আদেশ দিল যে—"ঐ সমস্ত জিনিষ বাগানের ভেতর থেকে তুলে নিয়ে তোমার ঘরে রেখে দাও আর কাল সকালেই গরীব ভিখারীদের ডেকে ঐ সব জিনিস ভাগ করে বিলিয়ে দিও।"

"যোহকুম হুজুর" বলিয়া বিস্মিত দরোয়ান চলিয়া গেল। মহা স্বস্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শরৎচন্দ্র বলিল—"ও গুলোর পালা শেষ হল, এইবার তোমাদের পালা।"

হরিচরণ সভয়ে বলিল—"আমাদেরও কি ঐ রকম হুড়কোর বাড়ী দিয়ে শেষ করবেন না কি?"

শরৎচন্দ্র বলিল—"সেটা করা যদিও খুব উচিত—কিন্তু যখন একদিনও তোমাদের বন্ধু ব'লেছি, একদিনও তোমাদের সঙ্গে খেয়েছি—তখন আমি আর সেটা ক'রতে চাইনা। তোমাদের যে ভাঙবার সে

ভাঙ্গবেই। আমি মানে, মানে তোমাদের 'বিদায় দিচ্ছি। তোমরা যাও, চলে যাও। জীবনে আর আমার কাছে কখনও এসনা।"

হরিচরণ ও মাধব আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এতটা যে হইবে তাহা তাহারা ভাবে নাই। হরিচরণ অতি ব্যাকুলভাবে বলিল—"সেকি বাবু আমাদের তাড়িয়ে দেবেন কি? আপনার কাছ থেকে গেলে আমরা নিশ্চয়ই মারা যাব। আপনার কাছে থেকে আমাদের ভাল খাওয়া, ভাল পরার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমরা ভয়ানক আয়েসী আর বাবু হয়ে গেছি। আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানেন—আপনি তাড়িয়ে দিলে আমাদের বড় কষ্ট, মহা কষ্ট হবে। আমরা নিশ্চয়ই মারা যাব। দোহাই বাবু, আমাদের তাড়াবেন না।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"কি ক'রব উপায় নেই, আমি তোমাদের আর রাখতে পারব না। তোমরাও এখানে থেকে আর সুখ পাবে না। দেখ, বন্ধুতে আর মোসাহেবেতে এইখানে তফাৎ। আমি প্রথমে বন্ধুভাবে' তোমাদের গ্রহণ করেছিলুম, 'ভাই' বলে তোমাদের সম্বোধন করতুম, তোমরাও আমায় 'ভাই' বলতে—তারপরে তোমরা কিন্তু বন্ধুত্বের মর্য্যাদা বুঝলে না, আমায় 'বাবু' বলে সম্বোধন ক'রতে লাগলে আর সর্ব্ব রকমে আমার মোসাহেব হ'লে। আমার এখন আর মোসাহেবে প্রয়োজন নেই তাই তোমাদের বিদেয় দিচ্ছি। 'বন্ধুত্ব' যে কি জিনিস তা তোমরা বুঝতে পারলেনা, সামান্য মোসাহেবীতে সন্তুষ্ট হ'লে। কিন্তু মোসাহেব না হয়ে যদি তোমরা আমার বন্ধু হ'তে, তোমাদের সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব জন্মাত' তাহলে আজ সে বন্ধুত্ব ভঙ্গ করে তোমাদের ফট্ ক'রে তাড়াবার ক্ষমতা আমার

হ'তনা। যাই হোক যখন একদিনও তোমাদের বন্ধু বলে মনে স্থান দিয়েছি তখন একেবারে নিঃসহায় অবস্থায় তোমাদের ছেড়ে দোবনা। তোমাদের প্রত্যেককে দু হাজার টাকা আমি দিচ্ছি। দেশে গিয়ে সৎপথে থেকে কোনও ব্যবসা করে সৎভাবে গেরস্তর চালে থাকগে ভবিষ্যতে আর কখন অর্থকষ্টে পড়তে হবে না; সামান্ত অর্থের জন্তে, ভদ্রসন্তান হ'য়ে হীনবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে না। যাও, যা বললুম করগে। যদি ভাল চাওত বাবুগিরি ক'রতে যেওনা। আর দোহাই তোমাদের, আর কখনও মোসাহেবী ক'রে কোনও সংসারে কান্নার রোল তুলোনা।" এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র কলিকাতার কোনও ব্যাঙ্কের উপর, ইহাদের দুইজনের নামে, চার হাজার টাকার একখানি চেক লিখিয়া দিল এবং গাড়ী ভাড়া প্রভৃতি খরচের জন্ত নগদ একশত টাকা প্রদান করিল। দুই ভ্রাতায় প্রস্থান করিল।

ইহারা চলিয়া যাইতেই মোক্ষদাসুন্দরী সেই ঘরে আসিলেন। এসেন্স, আর্শী প্রভৃতি ভাঙ্গার শব্দে বিস্মিতা হইয়া—ব্যাপার কি জানিবার জন্ত—মোক্ষদাসুন্দরী সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইহারা চলিয়া যাইতেই এই ঘরে ঢুকিয়া, সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আরও বিস্মিতা হইয়া বলিলেন—"একি বাবা শরৎ, এ কি ব্যাপার, একি করেছ?"

শরৎচন্দ্র বলিল—"খুব ভাল কাজ করেছি মা, আমার পাপের সব সহচরদের আজ ধ্বংস ক'রে দিয়েছি। মা কুশিক্ষার দোষে বাবু-গিরিতে মেতে আর বেচালে চলে তোমার দিকে ফিরে না চেয়ে আমি মহাপাপ ক'রেছি। আজ আমার জ্ঞান চক্ষু ফুটেছে তাই

তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইচি। তোমার মনে কষ্ট দিয়ে—অগাধ অর্থ থাকতেও আমি মহাকষ্ট পেয়েছি; যখনই যে কাজ ক'রতে গেছি তাতেই বিফল মনোরথ হয়েছি। সনাতন বিধান না মেনে আর প্রত্যক্ষা দেবী তুমি, তোমার আদেশ না শুনে আমি মহা দুঃখ পেয়েছি, মহা অপমানিত হ'য়েছি—আমার অনেক, অনেক টাকা অসার্থকে খরচ হয়েত' গেছেই তার ওপর আমার প্রাণ অবধি যেতে বসেছিল। মা! তোমার সফৎ ক'রে বলছি, আমি এবার থেকে আর কখনও বেচালে চলব না, আর তোমার সমস্ত আদেশ অবনত মস্তকে পালন করব।"

মোক্ষদাসুন্দরী মহা বিস্মিতা এবং অতীব কৌতূহলান্বিতা হইলেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"যাক বাবা ওসব কথা যেতে দাও। তুমি ওরকম ভাবে উত্তেজিত হ'ওনা—ঠাণ্ডা হয়ে ব'স।"

শরৎচন্দ্র বলিল—"ঠাণ্ডা একটু পরে হব মা। আমার পাপের সব সহচরদের শেষ করেছি—একটা জিনিস এখনও বাকী আছে। সেইটেকে শেষ করে তবে ঠাণ্ডা হব।" এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া তাহার রাইটিং—কেসের মধ্য হইতে একখানি কাঁচি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল—"মা যে যে জিনিসের শরণ নিয়ে আমি পশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলুম, তাদের সব গেছে বাকী আছে কেবল আমার মাথার এই চুলগুলো। টেরী কাটা না গেলে খারাপ দেখতে হবে এই ভয়ে আমি পিতৃশ্রাদ্ধের সময় চুল না কামিয়ে, স্বর্গগত পিতার আত্মার অপমান করেছি। এই দুর্ভিক্ষের দেশে—আমার এই চুলের প্রসাধনের জন্যে যে

টাকা অপব্যয় করেছি তাতে বোধ হয় একটা অন্নসত্র খোলা যেত। দারিদ্রের জন্যে যে দেশে অর্দ্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায় লোক মারা যায় সে দেশের লোক হ'য়ে আমি কোন্ প্রাণে, হীন বিলাসিতার জন্যে এত টাকা অপব্যয় ক'রেছি। ওহোঃ আমি কি করেছি।"

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন—"যা হবার হয়ে গেছে বাবা তার আর চারা কি? তুমি ঠাণ্ডা হও।"

উত্তেজিত শরৎ উচ্চ কণ্ঠে বলিল—"চারা আছে বই কি—কিন্তু তাতে তোমার প্রসন্নতা চাই। দেশের দীন-দুঃখীকে মহাকষ্টে দিন কাটাতে দেখেও—নিজের হীন সুখ ও তুচ্ছ বিলাসিতায় অগাধ অর্থব্যয় ক'রে যে চৌর্য্যবৃত্তি করেছি, এবার দেশে ফিরে গিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। নানা সংবাদপত্র থেকে আজ কিছুদিন হ'ল খবর পেয়েছি যে, আমার দেশে, আমার সেই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাঙ্গলা দেশে—স্বর্গ থেকে কি এক ভাবের বন্যা ভেসে এসেছে। আমি দেশে ফিরে আমার দেশবাসীর সঙ্গে সেই পবিত্র বন্যার স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। তার আগে মা, তোমার কাছে যে পাপ করেছি—সে পাপের মার্জ্জনা না পেলে, তোমার প্রসন্নতা না পেলে আমি কোনও কাজেই সফল হব না। মা, এই—আমার এই"—এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র হস্তস্থিত কাঁচি দ্বারা তাহার বড় সাধের অতি যত্নের, মহা প্রিয় মাথার চুলগুলি কাটিতে লাগিল। মহা উত্তেজিত শরৎচন্দ্র খুব তাড়াতাড়ি চুল কাটিতে কাটিতে মধ্যে মধ্যে খুব জোরে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। কাঁচির-ডগার-খোঁচায় এবং ছিন্ন করার জন্য তাহার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল—তবুও

ভ্রূক্ষেপ নাই। এই ভাবে প্রায় সমস্ত চুলগুলি কাটিয়া ফেলিয়া, সেই রক্তাক্ত চুলগুলি হাতে করিয়া মায়ের চরণের উপর রাখিয়া শরৎ বলিল—"মা, আমার মাথার রক্তে সিক্ত এই চুল—চন্দনচর্চ্চিত ফুলের মতন তোমার পায়ে অর্পণ করে, এই শফৎ ক'রছি যে, এ জীবনে আর কখনও বিলাসিতায় মত্ত হবনা। আমার মাথার অনেক রক্ত তোমার পায়ে দিলুম—মাথা কেটে আহুতি দিলুম; বিনিময়ে কেবলমাত্র তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা দাও। প্রসন্না হও মা প্রসন্না হও—ক্ষমা কর মা ক্ষমা কর।" এই বলিয়া শরৎচন্দ্র মায়ের চরণ দুটীর উপর মাথা রাখিয়া—দুই হস্তে মায়ের চরণ দুইটি সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিল। তাহার চক্ষের জলে, যথার্থই মোক্ষদাসুন্দরীর পা দুটি ভিজিয়া গেল।

সাদরে দুই হাতে ধরিয়া পুত্রকে তুলিয়া মোক্ষদাসুন্দরী সস্নেহে বলিলেন—"আমি তোকে বাবা সর্ব্বান্তকরণে ক্ষমা করলুম। কিন্তু বাবা আজ এই শুভদিনে, যাঁর কৃপায় এই শুভদিন এল, যাঁর কৃপায় তোমার জ্ঞান চক্ষু ফুটলো, যাঁর কৃপায় তোমার আপন-হারা-অবস্থা দূরীভূত হয়ে তুমি, তোমাকে ফিরিয়ে পেলে—সেই ভগবানের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রে তাঁর চরণে নমস্কার কর।"

অনুতপ্ত হৃদয়ে, অনুতাপপূর্ণস্বরে শরৎচন্দ্র বলিল—"ভগবানের কাছে কোন মুখে ক্ষমা চাইব মা? আমি যে জীবনে কখনও তাঁকে ডাকিনি। ডাকা দূরে যাক, আমি যে বরাবর তাঁকে অবহেলা করে এসেছি। মহা অজ্ঞানতা বশে তাঁকে যে বরাবর ভুলে আছি।"

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন—"তুমি তাঁকে বরাবর ভুলে আছ বটে

তিনি কিন্তু তোমায় বরাবরই মনে রেখেছেন। তুমি তাঁকে অবহেলা করেছ বটে কিন্তু তিনি এমনই দয়াময়, এমনই করুণাসিন্ধু যে, তা সত্ত্বেও তিনি তোমায় ভালবাসেন। তুমি তাঁকে ডাকনি বটে তবু কিন্তু তিনি তোমারই আছেন।"

শরৎ গদগদ স্বরে বলিল—"তাই যদি হয়—হে দয়াময়, হে করুণাময় জগদীশ্বর তুমি যদি এতই দয়াময়, এতই করুণাময় হও, তাহলে দয়া ক'রে আমায় ক্ষমা কর, আমার মনের মলামাটি দূর ক'রে দাও, তোমার চরণে আমার ভক্তি, বিশ্বাস দাও।" শরৎচন্দ্র ভূমীতে লুটাইয়া পড়িয়া দয়ারসাগর শ্রীভগবানকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল।

---

# উপসংহার।

কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। ইহারা কলিকাতায় ফিরিয়া বাস্তবিকই এক স্বর্গীয়ভাবের বন্যা প্রবাহিত দেখিল। তখন কলিকাতায় মহা ধূমধাম হইতেছিল। তখন সবেমাত্র বঙ্গের-অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছিল। মোহনিদ্রাগ্রস্ত বাঙ্গালী, কি এক অদৃশ্য হস্তের স্পর্শে বহুদিন পরে জাগিয়া উঠিয়াছিল। অজ্ঞান-অন্ধ-বাঙ্গালার চক্ষু, কোনও এক দেবীর পদ্মহস্তের পবিত্র স্পর্শে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, জ্ঞাতি-শত্রুতা ভুলিয়া, 'ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই'রূপ কুনীতিকে পদদলিত করিয়া, আপন-পর এক হইয়া, শত্রু-মিত্রে হাত ধরাধরি করিয়া দলে দলে হলাহলি-গলাগলি করিয়া জাতীয়-সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইতেছিল। বিরাট সভা করিয়া পরস্পরে মিলিত হইয়া—বিদেশী-পণ্য-বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিতেছিল। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একতা-শক্তি অর্জ্জন করিতেছিল। শরৎ কাশীতে বসিয়া সংবাদপত্রের সাহায্যে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিল। এক্ষণে কলিকাতায় আসিয়া এই সকল মহিমাময়, বিরাট, স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া সে মনে-প্রাণে মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছুদিন চারিদিক ঘুরিয়া ও কতকগুলি সভায় যোগদান করিয়া তাহার প্রাণ, এই আন্দোলনের সঙ্গে যথার্থই মিশিয়া গেল। একদিন একটি সভায় যোগদান করিয়া

সে দেখিল যে, জাতীয়-ধন-ভাণ্ডারে দেশের ধনী ও গৃহস্থের কথা দূরে যাক—অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষুক পর্য্যন্ত—তাহাদের ভিক্ষালব্ধ অর্থ হাসিমুখে দান করিতেছে। এই সভা হইতে বাটিতে ফিরিয়া শরৎচন্দ্র গোবিন্দবাবু, মা, ও অন্যান্য সকলকে বলিল যে—"আমি আর বিলাতী কাপড়ের কারবার ক'রব না। দেশের এই উন্নতির পথে অগ্রসর হবার সময়, আমি যদি বিলাতী কাপড়ের কারবার করি তাহলে দেশকে উন্নতির পথ থেকে টেনে নিয়ে আরও পঞ্চাশ বছরের পথ পেছিয়ে দেওয়া হবে।"

শরতের এই সঙ্কল্পে সকলেই বাধা দিল। কূটবিষয়বুদ্ধিশালী গোবিন্দবাবু অনেক রকমে বাধা দিয়া বলিলেন—"দেখ বাবা তোমার অন্যান্য যা সম্পত্তি আছে তার আয় অতি সামান্য আর তোমার বিলাতী কাপড়ের কারবারের আয় মাসে প্রায় দশ হাজার টাকা। সুতরাং এই কারবার তুলে দিলে তোমাকে খুব গেরস্থ চালে চ'লতে হবে বোধ হয় বুঝতে পারছো।"

শরৎ বলিল—"আর তো আমি কোনও অনাবশ্যকীয় অভাবের বা অভ্যাসের বাধ্য নই যে এই কথা শুনে আমি ভয় পাব। গেরস্ত কি ব'লছেন, আমি এখন খুব গরীবের চালে চলতে প্রস্তুত আছি। দেখুন শুনতে পাই যে, অন্যান্য সব দেশের লোকেরা, তাদের মাতৃভূমীর জন্যে যথাসর্ব্বস্ব দেয়, স্ত্রীপুত্রকে বিসর্জ্জন দেয়, এমন কি নিজের প্রাণ অবধি বলি দেয়। তারাও তো মানুষ, তাদেরও তো সংসার, সমাজ, সুখ, আরাম সবই আছে। তারা যদি দেশের কল্যাণের জন্যে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে পারে—আর আমরা কি সামান্য আট দশ-হাজার

টাকার আয় ত্যাগ ক'রতে পারি না? আমাদের দেশ কি দেশ নয়? আমরা কি যথার্থই মানুষ নয়?"

শরৎচন্দ্র তাহার পরদিনই বিলাতী-কাপড়ের কারবার তুলিয়া দিল। তাহার বিস্তীর্ণ কারবার ও বিশাল আয়ের কথা দেশবাসীর জানা ছিল। তাহার এই ত্যাগের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সমস্ত দেশবাসী তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—সমগ্র দেশ তাহার প্রশংসায় মুখরিত হইল। শরতের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ও তাহার প্রশংসা শুনিয়া, তাহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত সকলেই খুব আনন্দিত হইল। এই সম্বন্ধে কথা হইতে, হইতে শরতের মাসীমাতাদ্বয় একদিন মোক্ষদাসুন্দরীকে বলেন যে—"দিদি তুমি খুব পূণ্যবতী তাই তোমার পুণ্যের জোরে শরতের এই ঘোর পরিবর্ত্তন হ'ল। সে অমন অসৎ থেকে এত সৎ হ'ল।"

এই কথার উত্তরে মোক্ষদাসুন্দরী বলেন—"ছিঃ, ছিঃ তোমরা জেনে শুনে অমন কথা ব'লনা। আমার আবার পুণ্যি কি কিছু আছে? সকলের সব চেষ্টা যখন বিফল হ'ল, যখন কোনও মতে শরৎকে ফেরাতে পারলুম না, সংসারের নানান ঘাত-প্রতিঘাতে যখন বুঝলুম যে, মানুষের চেষ্টায় সব কাজ সফল হয় না তখন মূর্ত্তিমান ভগবানস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় নিলুম। তাই আমার গুরুবলই আমার একমাত্র ছেলেকে বানর থেকে মানুষ ক'রে দিলে। গুরু কৃপা না হ'লে কি এত শীগগির এই ঘোর পরিবর্ত্তন হয়। সেদিন পুরাণ শুনতে, শুনতে গুরুর মাহাত্ম, গুরুবলের প্রতাপ জানতে পেরেই—যথার্থ ভক্তির আর বিশ্বাসের সঙ্গে পত্র লিখে গুরুকে আনিয়ে-

ছিলুম—তাই তাঁর পদধূলি পেয়ে আমাদের সব বিপদ্ কেটে গেল। ধন্য গুরুদেব, ধন্য গুরুকৃপা, ধন্য গুরুবল।" এই কথা বলিয়া মোক্ষদা-সুন্দরী ভক্তিভরে শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

শরতের এইরূপ ত্যাগে, গোবিন্দবাবু যথার্থই বড় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তিনি শরতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কয়েক দিন যাবৎ বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু সফলকাম হন নাই। শরৎ যে আজ কয়দিন ধরিয়া কি করিতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। প্রতিদিন খুব প্রাতঃকালে সে বাহির হইয়া যায় এবং অনেক রাত্রে বাটিতে ফিরে। আজ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া গোবিন্দবাবু এখনও নিজের বাটিতে চলিয়া যান নাই। রাত্রি যখন এগারটা বাজিল তাহার কিছু পরে শরৎ বাটিতে ফিরিল। তাহাকে দেখিয়া খুব ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বোধ হইলেও গোবিন্দবাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আজ কদিন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছি কিন্তু দেখা পাচ্ছি না ব'লে অসময়ে তোমায় বিরক্ত করতে বাধ্য হলুম। দেখ, তোমরা বয়েসের দোষে একটা কাঁচা কাজ ক'রে ফেললেও, আমাদের বুড়োদের উচিত হচ্ছে যে তাতে রাগ না ক'রে তোমাদের বুঝিয়ে বলা। তা হ্যাঁ বাপু এত টাকার এই কারবার তুলে দিয়ে কি ভাল ক'রলে। তুমি যে দেশের উন্নতির কথা ব'লছ—তা ব্যবসা-বাণিজ্য না ক'রলে কি দেশের উন্নতি হয়? এই ব্যবসাটা তুলে কি ভাল কাজ হয়েছে।"

শরৎ বলিল—"ব্যবসা-বাণিজ্যে দেশের উন্নতি হয় তা জানি। দেখুন আমি তো ব্যবসা করা ছাড়িনি। আমি কেবল—দেশের পক্ষে অনিষ্টকারী ঐ বিদেশী পণ্যের ব্যবসা ছেড়েছি। আমি শীগগীরই অন্য ব্যবসা ক'রব। সেই জন্যেই আজ কদিন ধ'রে দিবারাত্র অনবরত পরিশ্রম করছি।"

গোবিন্দবাবু বলিলেন—"এত টাকা আয়ের এমন সুন্দর ব্যবসাটা ছেড়ে আর অন্য কি এমন লাভের ব্যবসা আছে যে তা ক'রবে?"

শরৎ বলিল—"বাবা মারা যেতে ঘাট-কামানর দিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে আমার আলাপ হয়। তিনি মধ্যে, মধ্যে আমাদের বাড়ীতে আসতেন তা বোধ হয় আপনার মনে আছে। এই স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব থেকে তিনি আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থের অবনতীর জন্যে কি রকম আলোচনা ক'রতেন আর তার প্রতিকারে কি করা উচিত, সে সব বিষয়ে নানা রকম আলাপ ক'রতেন আর আমাকে এর ভার নেবার জন্যে ভয়ানক অনুরোধ ক'রতেন, সে সব কথা বোধ হয় আপনি ভুলে যাননি? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেছি এবং তাঁরই পরামর্শ মতে নতুন ব্যবসা করবার ব্যবস্থা ক'রছি।"

গোবিন্দবাবু বলিলেন—"কি ব্যবসাটা করবে শুনতে পাই না কি?"

শরৎ বলিল—"আমি বিশেষ ভেবে তবে একাজে নেমেছি। দেখুন আমাদের দেশের মধ্যে যে মৃত্যুসংখ্যা এত বেশী, নানা রকমের রোগের এত প্রাদুর্ভাব, আর অকাল-মৃত্যু এত অধিক এর কারণ আমাদের

খাদ্য-সমস্যা। আমরা রীতিমত পয়সা খরচ ক'রেও বিশুদ্ধ-খাদ্য খেতে পাইনা। জীবন ধারণের প্রধান উপাদান যে আহার্য্য দ্রব্য, আমরা সেই আহার্য্য-দ্রব্যকে বিষ ক'রে তবে খাই। এই জন্যেই আমাদের মধ্যে উদ্যম, অসমসাহস, প্রতিজ্ঞা-পালন-শক্তি, দুর্জ্জয় উন্নতির কামনা নেই। মনের সঙ্গে দেহের অতি নিকট সম্পর্ক। ভেজাল, বিষাক্ত জিনিষ খেয়ে দেহ যদি ভাল না থাকে তাহলে মনের বলও থাকে না। আজকাল হাজার, হাজার লোক বিদেশী পণ্য বর্জ্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েও সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রতে পারছে না—তাতে দেশের কি ভয়ানক ক্ষতি হচ্চে, দেশ কত পেছিয়ে যাচ্চে তা ধারণা করবার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু এর প্রতিকার কি? এই যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রছে ব'লে, সকলকে দেবদেবীর মন্দিরে প্রতিমার সম্মুখে, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে শপথ করিয়ে নেয়া হচ্চে—এতে কি এর প্রতিকার হবে? কখনেই নয়। দেবতা যদি জীবন্ত হয়ে আসেন, আর তাঁর সজীব-চরণ স্পর্শ ক'রে যদি এরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তবুও অনেকে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু এদের যদি দেহ সুস্থ ও সবল হয় তাহলে এদের প্রাণ সজীব হবে, মন বলবান ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হবে। তখন এদের আর প্রতিজ্ঞা করাতে হবে না, বা এদের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ভয়ও করতে হবে না। তখন এরা, প্রতিজ্ঞা করবার পূর্ব্বেই কার্য্য-সাধন ক'রে আসবে। তখন আর এদের জাগাতে হবে না—এরা নিজেরাই জাগবে। যাদের প্রাণ নির্জ্জীব, দেহ দুর্ব্বল তাদের মন কি ক'রে জাগ্রত থাকবে? একটা

ভীষণ উত্তেজনায় মুমূর্ষও একবার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা যথার্থ কোনও কার্য্য সাধন হয় না। যথার্থই যদি আমরা দেশের উন্নতি চাই, যথার্থই যদি আমরা দেশবাসীকে দেশের যোগ্য ও উপযুক্ত সন্তান ক'রতে চাই তাহলে সর্ব্বাগ্রে এই রোগে কাতর, বিষ-ভোজনে মৃতপ্রায় দেশবাসীকে বিশুদ্ধ আহার দিতে হবে। একেতো দারিদ্রতার জন্যে পুষ্টিকর আহার পাওয়া যায় না, তার ওপর সারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর, জীবন ও দেহ রক্ষার জন্য যা খাব তা ভেজালে বা বিষে ভরা। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে, সঙ্গে ভেজালও বাড়ছে। ময়দায় পাথরের আর হাড়ের গুড়ো, তেলে পাকড়ার বিষ, ঘিয়ে সাপের ও অনান্য অস্পৃশ্য মাংসের চর্ব্বি মেশান। দুগ্ধ বা ছানা খেতে যাও, তাও জলে ভরা আর সার পদার্থ যে মাটা, সেই মাটা তুলে নেয়া। আমরা প্রাচীন লোকদের অসভ্য বলি আর নিজেদের সভ্য ব'লে পরিচয় দি কিন্তু অতীব অসভ্য আর বুনো-জাত যারা, তারাওতো জীবন ধারণের প্রধান উপাদান, আহার্য্য-দ্রব্যকে আমাদের মতন বিষ ক'রে খায়না। একে এই ভেজাল তার ওপর এই সব ভেজাল জিনিষে তৈরী যে সব খাদ্যদ্রব্য দোকানে বিক্রী হয় সেগুলো—আইন সত্বেও আর সে আইন পালিত হচ্ছে কিনা দেখবার লোক থাকা সত্বেও—যে রকম ভাব খোলা অবস্থায় বিক্রী হয় তাতে তার ওপর ধুলো, ময়লা, শুষ্ক-মল বিষাক্ত-কফ প্রভৃতির গুঁড়ো হাওয়ার সঙ্গে উড়ে পড়ে আর নানা রোগের জীবাণু বহন ক'রে হাজার হাজার মাছি তার ওপর ব'সে

সে গুলো বিষাক্ত ক'রে দেয়। তারপর এই রকম জিনিষ খেয়ে—অকালমৃত্যু কি, আমরা যে সূতীকাগারে জন্মেই মরিনা এই যথেষ্ট। এই জন্যে আমি এক মহাসঙ্কল্প নিয়ে ব্যবসায় নামছি।"

গোবিন্দবাবু বলিলেন—"কি মহা সঙ্কল্পটা শুনি।"

শরৎ বলিল—"আমার নগদ টাকা যা আছে তা, আর কিছু টাকা ধার ক'রে, মোট দুই লক্ষ টাকা খরচ ক'রে আমি যতটা সম্ভব হয় ততটা বড় একটা কারখানা খুলছি। আমার সেই কারখানায় যথার্থ বিশুদ্ধ ঘি, তেল, ময়দা, প্রস্তুত হবে। আর একটি গোশালা স্থাপন ক'রে তাতে গোপালন এবং বিশুদ্ধ দুগ্ধ, ছানা, মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করা হবে এবং ঐ সকল উপাদানে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হবে। আমি প্রথমে আমার পল্লীবাসীদের চাহিদা অতি অল্প লাভে সরবরাহ ক'রে অবশিষ্ট যা থাকবে সেগুলো আমার নিকটস্থ পল্লীবাসীদের দোব। এতে তাদেরও খুব লাভ, আর ব্যবসার দিক দিয়ে দেখলে আমারও খুব লাভ। এই কারবার আরম্ভ করে দিয়েই আমি প্রত্যেক পল্লীর ধনীদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের হাতে পায়ে ধরে—আমার মতন এই রকম কারখানা তাঁদের পাড়ায় ক'রতে এবং ঐ রকম বিশুদ্ধ মাল তাঁদের পাড়ার লোককে সরবরাহ করতে অনুরোধ করব। প্রত্যেক ধনী যদি নিজের, নিজের পাড়ায় এই রকম একটি কারখানা স্থাপন ক'রে নিজের নিজের পাড়ার লোককে অল্পলাভে বিশুদ্ধ মাল যুগিয়ে যান তাহলে অতি অল্প-

দিনের মধ্যে এ দেশের চেহারা ফিরে যায়, এ দেশবাসীর অন্য রকম মূর্ত্তী হয়ে যায়। সকলে এই রকম ভাবে কাজ ক'রে গেলে—নিজের পাড়া, ভিন্ন পাড়া, তারপর গ্রামগ্রামান্তরে বিশুদ্ধ মাল চালান্ দেওয়া ও বিনিময় করার কাজ হবে। দেশ বাঁচবে, দেশবাসী বাঁচবে, সমগ্র দেশবাসী ব্যবসা বানিজ্যে লিপ্ত হবে। এতে আমার লাভ, আপনার লাভ, সমগ্র বাঙ্গালীর লাভ, সমস্ত বাঙ্গালার লাভ।"

কিছুদিনের মধ্যে শরৎচন্দ্র এইরূপ ধরণের একটি কারখানা স্থাপন করিল এবং বিশ্বাসী ও ধর্ম্মভীরু কর্ম্মচারীর সহায়তায় স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া কারখানাটি সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র ব্যবসা করে কিন্তু অধিক লাভের আশা করেনা এবং ব্যবসার উপর জুয়াও খেলেনা এই জন্য তাহার পাড়ার ও নিকটস্থ পাড়ার লোকেরা অতি সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ খাদ্য-দ্রব্য পাইতে লাগিল। যথার্থই তাহাদের মূর্ত্তী ভিন্ন রকমের হইল, তাহাদের মানসিক বল ও জীবনী-শক্তি বাড়িয়া গেল। কিছুদিন পরে শরৎ স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় গিয়া, তথাকার ধনীদের হাতে, পায়ে ধরিয়া—ঐরূপ কারখানা খুলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। দেখা যাউক তাহার অনুরোধে কি ফল হয়।

যথার্থই এখন শরৎচন্দ্রকে দেখিলে—সেই পূর্ব্বের শরৎচন্দ্র বলিয়া বোধ হয় না। সে এখন আর সেরূপ ভাবে চুল ছাঁটেনা, পাতা কাটিয়া টেরী কাটেনা, হ্যাট-কোট পরিয়া ও সিগারেট মুখে দিয়া, গ্যাট-ম্যাট করে না। সে এখন মোটা কাপড় পরে, মোটা কাপড়ের তৈয়ারী

পিরাণ গায়ে দেয়, পায়ে নাগরা জুতা পরে আর পাতার বিড়ি খায়। আর—বাজে গল্পে ও আড্ডায় অমূল্য সময় নষ্ট না করিয়া—কারখানার কাজ দেখে, দেশের কাজ করে। (অবশ্য বাড়ীর সব কাজ দেখিয়া ও বাড়ীর লোকের শুভাশুভ খবর রাখিয়া) আর—আর সে এখন পূর্ব্বের মতন, লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে দাঁত খিঁচাইয়া ও মুখ বাঁকাইয়া—"গুড্-ডে বা গুড্ ইভনিং" বলে না। কোনও লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই শরৎচন্দ্র এখন দুইহাত তুলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, প্রশান্ত স্বরে বলে—"বন্দে-মাতরম্।"

তাহার এই অদ্ভুৎ পরিবর্ত্তন ও অপূর্ব্ব ভাব দর্শনে যো[illegible] সাক্ষাৎকারী ব্যক্তিও ভাবে বিভোর হইয়া বলে—"বন্দে-ম[illegible]

পাঠক, আপনিও একবার উচ্চকণ্ঠে ও ভক্তিভ[illegible] "বন্দে-মাতরম্।"

সমাপ্ত।